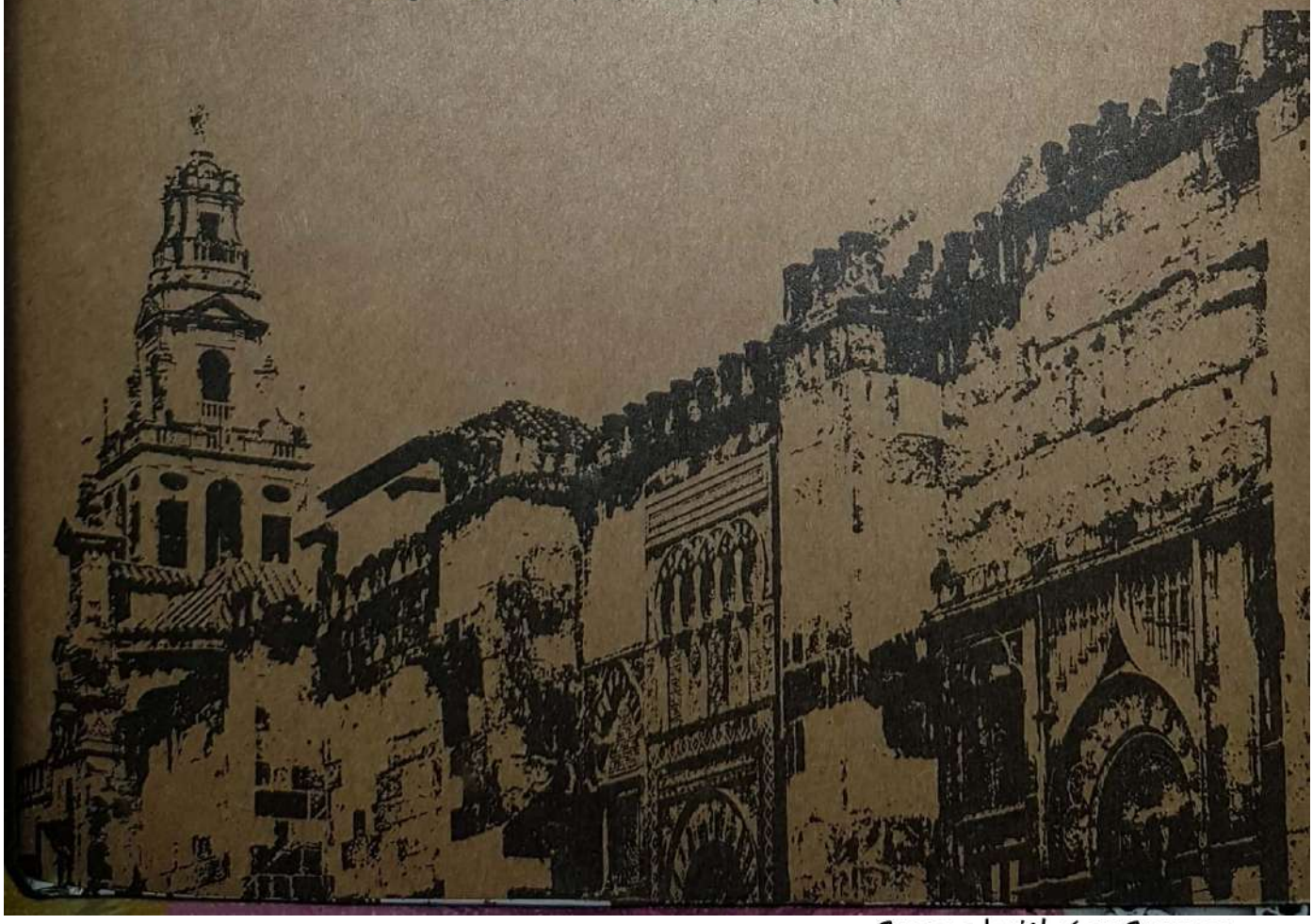
আন্দালুসের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. রাগিব সারজানী



Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানী

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক;
আরববিশ্ব যাকে চেনে বিশিষ্ট ইতিহাসগবেষক, লেখক ও লেকচারার হিসেবে।
জন্ম ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে মিশরের 'আলগারবিয়্যা' প্রশাসনিক অঞ্চলের 'আলমহল্লা আলকুবরা'তে।
ইসলামী ইতিহাস ও গবেষণানির্ভর বিভিন্ন বিষয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক পদচারণার মূল অঙ্গন।
ইসলামী ইতিহাসকেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক।
অনবদ্য লিখনীগুণে লাভ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে।
লেখক-আলোচক রাগিব সারজানীর সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য– তিনি কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না; ইতিহাসের ধারাবর্ণনা থেকেই তিনি তুলে আনেন সুপ্ত নানা শিক্ষা ও নির্দেশনা, আগামীর পথচলার পাথেয় এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিরন্তন সব সূত্র।
তার লেখালেখি, দাওয়াতি প্রোগ্রাম, লেকচার-বক্তৃতা ইত্যাদি কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য–

> জাতির জাগরণের কার্যকারণসমূহ নির্ণয় ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তার সদ্ব্যবহার করা। উম্মাহর সদস্যদের হৃদয়জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করা। তাদেরকে চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও কর্মে অগ্রবর্তী হতে পথনির্দেশ করা। ইসলামী ইতিহাসের সঠিক ও প্রকৃত রূপ উন্মোচিত করা। সভ্যতার বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অবদান সুস্পষ্ট করা

তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক, যার বেশ কয়েকটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশিয়ান, রুশ ও তুর্কি ভাষায়।
বাংলা ভাষায় অনূদিত লেখকের বেশ কিছু বই মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কিছু প্রকাশিতব্য-তালিকায় রয়েছে।

Scanned with CamScanner

©
প্রকাশক

"আন্দালুসের ইতিহাস" বইটি কপিরাইট আইন ২০০০(২৮)-এর ৫৬ ধারায়
কপিরাইট অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ও ২০০৫ (সংশোধিত) ধারা অনুযায়ী
বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার এ সংরক্ষিত আছে।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোন অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না,
কোন যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে
উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

[মুসলিম স্পেন ও পর্তুগালে সুদীর্ঘ আট শ' বছর ব্যাপ্ত
মুসলিম শাসনামলের এক প্রামাণ্য ইতিহাস]

মূল
ড. রাগিব সারজানী

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়নগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN : 978-984-93533-0-0

মূল্য : ৪৬০/= টাকা মাত্র

ANDALUSER ITIHAS (2nd part)
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
Online distributer : Rokomari.com

Scanned with CamScanner

উৎসর্জন

মুফাক্কিরে ইসলাম
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিয়া নাদাবী
রহিমাহুল্লাহ

'ইতিহাস' জাতির অস্তিত্বের শিকড়
এই চেতনায় যিনি আমাদের ঋদ্ধ করেছেন
মুসলিম উম্মাহ পুনরায় সমাসীন হবে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে
এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যিনি আপন 'যিন্দেগী' ওয়াক্বফ করেছেন

Scanned with CamScanner

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিহাসকে জাতির দর্পণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ইতিহাসের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিকথা। ইতিহাসের মাধ্যমেই মানুষ বাস্তব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে সহায়তা লাভ করতে পারে।

ইতিহাসের জ্ঞান ব্যক্তির স্মৃতি এবং চিন্তাকে প্রখর করার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণে বিচারশক্তি প্রয়োগে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এমন দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা– যারা হবে খোদাভীরু এবং দেশপ্রেম ও মানবকল্যাণের চেতনায় বলীয়ান।

প্রকৃত ইতিহাস-চেতনা ব্যতীত যেমন বর্তমানকে উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি ভবিষ্যতকেও বিনির্মাণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যাকে অতীতের প্রেক্ষাপটে বিচার করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রেই তা ফলপ্রসূ হতে পারে।

কেন এই আন্দালুসের ইতিহাস?

আল্লাহ তাআলার শাশ্বত বিধান হচ্ছে– তিনি জাতি-বর্ণ ও গোষ্ঠীভেদে তাদের কৃতকর্মের কারণে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন করে থাকেন। একসময় যে জাতি থাকে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর, ধীরে ধীরে সে জাতি হয়ে পড়ে দুর্বল; আবার পরবর্তীতে একসময় সে জাতি হয়ে ওঠে সবল ও শক্তিশালী। আর এ বিধান মুসলিম-অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ইতিহাসে বড় অদ্ভুতভাবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে; যদিও তার নাম ও ধরন ভিন্ন হয়। তাই তো দেখা যায়, আমরা যখন হাজার বছরের পুরনো কোন ইতিহাস পাঠ করি, তখন এমন অনুভূত হয় যে, এই একই ঘটনা যেন এ যুগেই ঘটতে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অতীতের ইতিহাস শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতেরও ইতিহাস!

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস আট শ' বছরের গৌরবজ্জ্বল এক ইতিহাস। ইতিহাসের এই বীরত্বগাথা অধ্যায়ে মহান আল্লাহ তাআলার এ বিধানটি এতটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যা অন্য কোন ইতিহাসের ক্ষেত্রে হয়নি। আন্দালুস ইতিহাসের প্রথম দিকটা ছিল গৌরবময় উত্থান ও জ্ঞানচর্চার উচ্চ শিখরে আরোহণের, আর শেষ দিকটা ছিল বেদনাবিধুর পতনের। অবশ্য একে পতন বলা যায় না, বলতে হবে পুনরুত্থানের প্রস্তুতি, প্রেরণা ও শিক্ষাগ্রহণ পর্ব।

আন্দালুসের এই দীর্ঘ ইতিহাস পরিক্রমায় অনেক ঘটনাই ঘটেছে; যার কিয়দাংশ তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে, কিছু অংশ দুর্ভাগ্যক্রমে আলোচনায় আসেনি। যতটুকু ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তাও আবার সত্য-বিদ্বেষী ও কুচক্রীরা তা বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে। সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে আর মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপ দিয়ে কাল্পনিক ও অবাস্তব ইতিহাস তৈরি করেছে।

আরবী ইতিহাসের বিদগ্ধ লেখক ড. রাগিব সারজানী বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে ইতিহাসের পাতা থেকে বিস্মৃতপ্রায় আন্দালুসের ইতিহাসকে যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে সত্যিকার স্বরূপে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

স্নেহভাজন অনুবাদকও তার নিখুঁত হাতে মূল গ্রন্থের লেখকের সে ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। আশা করি, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকমহল *'আন্দালুসের ইতিহাস'* নামক এ গ্রন্থ থেকে আন্দালুসের বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় ইতিহাস এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর চিত্র উদ্ধারে প্রেরণা পাবেন। আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

ফারুকুযযামান
শিক্ষক
দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা

০৬ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরী
২৪ জানুয়ারি ২০১৮ ঈসায়ী

Scanned with CamScanner

সূ চি প ত্র

সপ্তম অধ্যায় : মুরাবিতী শাসনকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ : সংক্ষেপে মাগরেবের ইতিহাস

গুদালা গোত্র ও মুরাবিতীদের আবির্ভাব ১৭

ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম আলগুদালী রহ.
জাতির সংস্কার-চিন্তায় দগ্ধ এক মহান শাসক ১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ও মুরাবিতী আন্দোলনের সূচনা

কে এই শায়খ? কী তার পরিচয়? ২৩

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন, নববী মিশন ২৩

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন, মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অঙ্কুরোদ্‌গম ২৫

মুরাবিতীদের আবির্ভাব এবং নববী আদর্শে তারবিয়াত ও দীক্ষা ২৭

'মুরাবিতীন' শব্দের অর্থ ৩০

মুরাবিতী অধ্যায়ের অনন্য নাম ইয়াহইয়া বিন ওমর লামতুনী ৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী এবং মুরাবিতী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ৩৭

ইউসুফ বিন তাশফীন রহ. ও ইস্পাতকঠিন দায়িত্বভার ৩৯

ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৪৩

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী : এক মহান দাঈ ও সুমহান সেনাপতি ... ৪৪

আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্র ৪৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুরাবিতী রাষ্ট্রের কাছে আন্দালুসের সাহায্যপ্রার্থনা

ইউসুফ বিন তাশফীন, বর্তমানে বিলুপ্ত এক আদর্শের নাম ৫৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যাল্লাকার যুদ্ধ

পত্র-বিনিময় এবং যুদ্ধের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ৫৫

মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস ও ইবনে রুমাইলার স্বপ্ন ৫৯

রণাঙ্গনের নজরদারীতে ইবনে আব্বাদের গোয়েন্দা-তৎপরতা ৬২

মুসলিম বাহিনী ও যুদ্ধ-পরিকল্পনা ৬৩

যাল্লাকা, আন্দালুসে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ ৬৫

যুদ্ধবিবরণ যাল্লাকার মহানায়ক ইউসুফ বিন তাশফীনের কলমে ৭২

Scanned with CamScanner

চাই না কোন প্রতিদান, চাই না কৃতজ্ঞতা ৭৭
মু'তামিদ বিন আব্বাদ ও আল্লাহর পথের সৈনিকের মর্যাদা ৭৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আন্দালুসে বিভক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন

ইউসুফ বিন তাশফীন ও মাগরেব-আন্দালুস একক মুসলিম রাষ্ট্র ৮৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ : মুরাবিতীদের অব্যাহত রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম

মুরাবিতী অভিযান ও অব্যাহত বিজয় ৮৭
ষষ্ঠ আলফোন্সোর পরিণতি ৮৯
আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসনামলের কয়েকজন আলিম ৮৯
১. কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. ৮৯
২. কাযী ইয়ায বিন মুসা বিন ইয়ায রহ. ৯১

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অধঃগমন ও পতন

মুরাবিতী শক্তির অবসন্নতা ও পতন, একটি প্রলম্বিত অধ্যায় ৯৫
মুরাবিতী সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতনের কয়েকটি কার্যকারণ ৯৬
১. অব্যাহত সামরিক তৎপরতা সত্ত্বেও পার্থিব মোহাচ্ছন্নতা ৯৬
২. আলিমসমাজের উপস্থিতিতে অন্যায় ও পাপাচারের আধিক্য ৯৮
দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ৯৯
মৌলিক বিষয়াদির পরিবর্তে শাখাগত বিষয়াদি নিয়ে
ওলামায়ে কেরামের নিমগ্নতার কুফল ১০১
ক. আলিমসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে অর্থহীন কলহ-বিবাদ ১০১
খ. ওলামায়ে কেরামের সমাজবিচ্ছিন্নতা ১০২
৩. কঠিন অর্থনৈতিক সংকট ১০২

অষ্টম অধ্যায় : মুওয়াহহিদী শাসনামল

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ বিন তুমারত ও মুওয়াহহিদী আন্দোলনের অভ্যুদয়

মুহাম্মাদ বিন তুমারত ও মুরাবিতী-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ১০৯
মুহাম্মাদ বিন তুমারত এবং আমর বিল মা'রূফ ও
নাহী আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে তার গৃহীত নীতি ১১২
মুহাম্মাদ বিন তুমারত ও আবদুল মুমিন বিন আলী :
দুই বিদ্রোহী চিন্তকের সম্মিলন ১১৫
মুহাম্মাদ বিন তুমারত ও তার সংস্কার-চিন্তা ১১৬
আলী বিন ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বিন তুমারত : মুখোমুখি অবস্থান ১১৮
মুহাম্মাদ বিন তুমারত ও জামাআতুল মুওয়াহহিদীন ১২০
মুহাম্মাদ বিন তুমারত ও তার মুওয়াহহিদী জামাত সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা ১৩৫

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুল মুমিন বিন আলী ও মুওয়াহহিদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মুরাবিতী-মুওয়াহহিদী দু' পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান ১৩৭
মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা ১৪০
বুহাইরা বা উদ্যানের যুদ্ধ ১৪১
ইবনে তুমার্তের অসিয়ত ও আবদুল মুমিনের বাইআত ১৪৪
মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা ১৪৭
আবদুল মুমিন বিন আলীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক ১৫০
কঠিন সংঘাত ও সশব্দ পতন! ১৫১
মুরাবিতী রাষ্ট্রের পতন ও মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী
অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহ ১৫৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগ

মাগরেবে আবদুল মুমিন বিন আলীর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ১৬১
আন্দালুসে আবদুল মুমিন বিন আলী ১৬৩
ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন ১৬৫
ইউসুফ বিন আবদুল মুমিনের আমলের কয়েকজন আন্দালুসী আলিম ১৬৭
১. ইবনুল আওয়াম আলইশবীলী রহ. ১৬৭
২. ইবনে তুফাইল রহ. ১৬৮
আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদী ও
মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ১৭০
১. ব্যক্তি আলমানসুর মুওয়াহহিদী ১৭২
২. ইবনে তুমার্তের ভ্রান্ত দাবিসমূহ হতে
আলমানসুর মুওয়াহহিদীর দায়মুক্তি ঘোষণা ১৭৫
আলমানসুর মুওয়াহহিদী ও আন্দালুস রাষ্ট্র ১৭৯
বনু গানিয়ার মোকাবেলা ১৭৯
আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুরের যুদ্ধনীতি ১৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চির স্মরণীয় আরিকের যুদ্ধ

ঐতিহাসিক আরিকের যুদ্ধ ১৮৬
যুদ্ধ সূচনা ও মুওয়াহহিদী ইতিহাসে নতুন ধারার আবির্ভাব ১৮৭
প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৮৭
প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ১৮৮
আরিক প্রান্তরে বিজয়ের প্রভাব ১৯৩
১. খৃস্টানশক্তির পাঁজরভাঙা পরাজয় ১৯৪

Scanned with CamScanner

২. বস্তুগত বিজয় ১৯৪
৩. মনস্তাত্ত্বিক বিজয় ১৯৫
৪. খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সংঘাত ১৯৫
৫. ক্যাস্টোলা ও মুসলমানদের মধ্যে নতুন চুক্তি ১৯৫
ইয়াকুব আলমানসুরের শাসনামলের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম ১৯৬
১. ইবনে রুশদ আলহাফীদ রহ. ১৯৬
২. মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন যারকূন রহ. ২০০
৩. ইমাম শাতিবী রহ. ২০১

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ইকাব যুদ্ধ ... কঠিন পরাজয়

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ও পথচলায় নানা প্রতিবন্ধকতা ২০৭
অষ্টম আলফোন্সো ও মুসলিম ভূখণ্ডে চলমান অরাজকতার সদ্ব্যবহার .. ২০৮
খৃস্টশক্তির মোকাবেলায় মুওয়াহহিদী প্রশাসনের অমার্জনীয় কিছু ভুল ২০৯
খৃস্টানশক্তির ব্যাপক প্রস্তুতি ২০৯
মুওয়াহহিদী বাহিনী ইকাব প্রান্তরের পথে ২১০
স্বেচ্ছাচারিতার পরিণতি, পরাজয়ের চোখরাঙানি ২১১
আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসের মুসলিম বাহিনীতে যোগদান ২১২
দুষ্ট সঙ্গীর পরামর্শে আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসকে হত্যা ২১৪
আননাসির লি দ্বীনিল্লাহর যুদ্ধ-কৌশল এবং ভুলের ধারাবাহিকতা ২১৬
ইকাব প্রান্তর, তিক্ত শাস্তি ২১৮
ইকাব-পরবর্তী ধারাবাহিক দুর্যোগ ও বিপদ
বাইয়াসা ট্রাজেডি ২২০
উব্বাযা ট্রাজেডি ২২১
আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-এর শাসনামলের বিখ্যাত আলিমগণ
১. ইবনে জুবাইর রহ. ২২৩
২. ইবনুল কুরতুবী রহ. ২২৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আন্দালুসের রাষ্ট্রসমূহের ধারাবাহিক পতন

ইকাব যুদ্ধ-পরবর্তী অব্যাহত ট্রাজেডি ২২৯
গভীর বেদনাদায়ক ট্রাজেডি, কর্ডোভার পতন ২৩০
একের পর এক মর্মন্তুদ ঘটনা, অব্যাহত ট্রাজেডি ২৩১

সপ্তম পরিচ্ছেদ : মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন

একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ২৩৩

Scanned with CamScanner

নবম অধ্যায় : মুসলিম আন্দালুসের পতন ও গ্রানাডা রাষ্ট্র

প্রথম পরিচ্ছেদ : গ্রানাডা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

ইবনুল আহমার ও ক্যাস্টোলা-নৃপতি :
চরম লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর এক চুক্তি ২৪৩
অবনতি ... অধঃপতন ... এবং অবশেষে সেভিলের পতন ২৪৫
ক্যাস্টোলা-নৃপতির কেন এই গ্রানাডা-প্রীতি?! ২৪৮
অবধারিত পতন-ক্ষণের অপেক্ষা ২৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বনু মারীন ২৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী

আন্দালুসে বিজয়াভিযানের পুনঃসূচনা
ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী : এক সংগ্রামী পুরুষ ২৫৯
আন্দালুস ও বহিঃরাষ্ট্রের সহায়তার অর্জিত বিজয় একটি পর্যালোচনা .. ২৬০
প্রথম মুহাম্মাদের মৃত্যু এবং মুহাম্মাদ আলফকীহের ক্ষমতাগ্রহণ ২৬১
ডনোনিয়োর যুদ্ধ ও নিরঙ্কুশ বিজয় ২৬২
মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার আলফকীহ ও চরম বিশ্বাসঘাতকতা ২৬৬
ইবনুল আহমার আলফকীহের পুনঃবিশ্বাসঘাতকতা
এবং তারীফ দ্বীপের পতন ২৭৩
আবু আবদুল্লাহ ইবনুল হাকীম ও ভয়াবহ কিছু পদক্ষেপ ২৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পতনের সঙ্গে সংগ্রাম

দীর্ঘকাল গ্রানাডার সার্বভৌমত্ব টিকে থাকার কার্যকারণসমূহ
এবং গ্রানাডার তৎকালীন পরিস্থিতির বিবরণ ২৭৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ২৮১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : গ্রানাডা-অভ্যন্তরে সংঘাত

গালিব বিল্লাহর প্রদেশে পারিবারিক সংঘাত ২৮৮
পঞ্চম ফার্ডিনান্ড ও বিভেদ-সংঘাতের সদ্ব্যবহার ২৯৫
স্পেন-নৃপতি এবং অবশিষ্ট গ্রাস কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা ২৯৭
ক্যাথলিক শাসকদ্বয়ের দাবির উত্তরে আবু আবদুল্লাহ ২৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গ্রানাডা পতনের পূর্বে প্রতিরোধ-তৎপরতা

মুসা বিন আবু গাসসান ও তার শহীদী মিশন ৩০৯

Scanned with CamScanner

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গ্রানাডার পতন

গ্রানাডার পতন, কিছু কারণ, কিছু কার্যকারণ ৩১৩

নবম পরিচ্ছেদ : গ্রানাডার পতনের পর আন্দালুসী মুসলমানদের পরিণতি

১. খৃস্টধর্মে দীক্ষিতকরণ ৩২০

২. বাস্তুচ্যুতকরণ ৩২১

৩. তদন্ত কমিশন, নির্যাতনের এক লোমহর্ষক অধ্যায় ৩২২

দশম পরিচ্ছেদ : সমকালীন গ্রানাডার যুগসচেতন কয়েকজন আলিমের কথা

১. শরীফ ইদরীসী রহ. ৩৩৩

২. লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ. ৩৩৫

৩. ইবনে বতুতা রহ. ৩৩৭

৪. ইবনুল বান্না মার্‌রাকিশী রহ. ৩৪০

দশম অধ্যায় : আন্দালুসের ইতিহাস উপলব্ধি ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক

প্রথম পরিচ্ছেদ :

রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সূত্র ৩৪৫

আমাদের যাপিত কালের শ্রেণিবিন্যাস ৩৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অতীতের যুদ্ধ ও বর্তমানের যুদ্ধ

মুসলমানদের বিজয়-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কী? ৩৫৫

১. মুসলিম উম্মাহ মৃত্যুঞ্জয়ী এক জাতি ৩৫৫

২. এ লড়াই হক-বাতিলের লড়াই ৩৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

আজকের ফিলিস্তিন অতীতের আন্দালুস ৩৫৯

শেষকথা ৩৬৩

পরিশিষ্ট

১. আন্দালুসের পতনে প্রতীচ্যের কবি
আবুল বাক্বা রুন্‌দী রহ.-রচিত শোকগাথা ৩৬৭

২. আন্দালুস নিয়ে প্রাচ্যের কবি, আল্লামা ইকবাল রহ.-রচিত কবিতা ৩৭৩

তথ্যপঞ্জি ৩৭৫

Scanned with CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

মুরাবিতী শাসনকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ
সংক্ষেপে মাগরেবের ইতিহাস
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ও মুরাবিতী আন্দোলনের সূচনা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মুরাবিতী রাষ্ট্রের কাছে আন্দালুসের সাহায্যপ্রার্থনা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
যাল্লাকার যুদ্ধ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আন্দালুসে বিভক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন
সপ্তম পরিচ্ছেদ
মুরাবিতীদের অব্যাহত রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম
অষ্টম পরিচ্ছেদ
মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অধঃগমন ও পতন

Scanned with CamScanner

দুর্বলতা ও পতন-যুগের পর আন্দালুসের ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায় ও পালাবদলের শুরুতে সেভিল-শাসক মু'তামিদ ষষ্ঠ আলফোন্সোর কাছে যে বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, তা পাঠ করামাত্র আলফোন্সোর অন্তরে ভয় ও কম্পন সৃষ্টি হল। তৎক্ষণাৎ তিনি তার সৈন্যদল-সহ ক্যাস্টোলার পথ ধরলেন। প্রকৃতপক্ষে মু'তামিদের এই পত্র-ই ছিল এই নতুন যুগ ও পালাবদলের ভিত্তি।

কারা এই মুরাবিতী গোষ্ঠী? তারা তো ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী একদল ইসলামের সৈনিক, যারা মৃত্যুর পরোয়া করতেন না। শক্তির সকল উপাদানে ভরপুর সমৃদ্ধ এক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা তৎকালীন মাগরেব রাষ্ট্রের সুবিশাল এলাকাকে শাসন করেছিল।

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
সংক্ষেপে মাগরেবের ইতিহাস

গুদালা গোত্র ও মুরাবিতীদের আবির্ভাব

মৌরিতানিয়ার সুবিশাল মরুভূমির গভীরতম এলাকা, নির্দিষ্ট করে বললে সেই শুষ্ক ও অনুর্বর অঞ্চল, যেখানে ছড়িয়ে আছে সাহারার বিস্তৃত উষর এলাকা, যেখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি, যেখানকার অধিবাসীগণ দক্ষ হাতে চাষাবাদ করতেও জানে না; বরং তারা অভ্যস্ত বেদুঈন-জীবনে, সেই অঞ্চলে 'সানহাজা' গোত্র নামে পরিচিত আফ্রিকান আমাজিগ (বার্বার) জাতিগোষ্ঠীর এক বৃহৎ শাখাগোত্র বসবাস করত। ধর্ম-বিশ্বাসে তারা ছিল অগ্নিপূজারী। মরুভূমিতে বসবাসরত এ জাতি সভ্যতার সব ধরনের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনও হয়েছে যে, সানহাজা গোত্রের কোন ব্যক্তি দীর্ঘ কয়েক যুগ জীবন লাভ করা সত্ত্বেও জীবনে কোনদিন রুটির স্বাদ পায়নি; বরং লাভ করেনি 'দর্শন-সৌভাগ্য'ও। সভ্যতার আলো বঞ্চিত এই জাতিগোষ্ঠী এভাবেই অতিবাহিত করছিল দিন, মাস, বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী। এরই মাঝে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তাদের কাছে পৌঁছয় ইসলামের সুশীতল বাণী। অন্য সব এলাকার মতো আফ্রিকার এই গহীন মরুভূমিতেও স্বভাবধর্ম ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে অতি দ্রুতগতিতে।

কিন্তু তারা যেহেতু বসবাস করত সাহারার গভীরতম অঞ্চলে মাগরেবের একেবারে শেষ প্রান্তে, তাই 'ইসলাম' নামক প্রদীপের ক্ষণিকের আলোকচ্ছটাই তাদের জীবনে এসেছিল। ইসলামের সুমহান শিক্ষা, সুসংহত আমল-পদ্ধতি ও আদর্শ জীবনাচার– কিছুই তারা লাভ করেনি; বরং তারা ডুবে ছিল নিজেদের সুপ্রাচীন অজ্ঞতা ও বেদুঈন জীবনধারাতেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে, ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা যেন তারা কখনোই লাভ করেনি; ইসলাম যেন আফ্রিকার এ গহীন মরুভূমিতে প্রবেশই করেনি।

এর কিছুদিন পর তারা এক শাসকের শাসনব্যবস্থায় একত্রিত হয়। প্রথম

Scanned with CamScanner

শাসকের মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন তার পৌত্র। কিন্তু সানহাজা গোত্র তাদের নতুন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে। শাসকবিহীন সানহাজা গোত্র এরপর পরস্পর বিভেদে জড়িয়ে ছোট ছোট দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারও অনেকদিন পর সানহাজা গোত্র পুনরায় নতুন এক শাসকের পাশে সমবেত হয় এবং একতাবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। নতুন এই শাসকের নাম ইবনে তাইফায়ূন লামতুনী। তিনি ছিলেন সানহাজা গোত্রের অন্যতম বৃহৎ শাখা 'লামতুনা' কবিলাভুক্ত।

কিন্তু সানহাজা গোত্রকে একতার বন্ধনে আবদ্ধকারী নতুন শাসক ইবনে তাইফায়ূন বেশি দিন বাঁচেননি। এক যুদ্ধে তিনি নিহত হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার জামাতা ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম আলগুদালী। তিনি ছিলেন লামতুনার মতোই সানহাজা গোত্রের আরেক বৃহৎ শাখাগোত্র 'গুদালা' বংশোদ্ভূত। ইবনে তাইফায়ূন-এর মৃত্যুর পর ইয়াহইয়া অধিষ্ঠিত হন সানহাজা গোত্রের নেতৃত্বের আসনে।

সে যুগে সানহাজা গোত্র ইসলামের শিক্ষা হতে এতটাই দূরে ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ এর বিস্ময়কর এক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আছে, সানহাজা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার পুত্র ও কন্যাকে একসঙ্গে মরুভূমিতে গবাদি পশু চড়াতে পাঠিয়েছিল। কিছুদিন পর বোন তার ভাই কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হয়ে লোকালয়ে ফিরে আসে! আরও আশ্চর্যের বিষয়, কেউ এতে কোন প্রকার আপত্তিও করেনি। হত্যা-রাহাজানি ছিল তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।[১] ব্যাভিচার, অন্যের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে তার স্বামীর জ্ঞাতস্বারে বরং স্বামীর উপস্থিতিতে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি গর্হিত এবং সভ্যতা ও নীতি-নৈতিকতাবিরোধী কর্মকাণ্ড তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[২] সানহাজা গোত্রের পুরুষগণ যতজন নারীকে ইচ্ছা একসঙ্গে বিয়ে করত। এমনকি গোত্রপ্রধান ইয়াহইয়া নয়জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। মোটকথা, একমাত্র কালিমা ছাড়া নামায, যাকাত বা শরীয়তের অন্য কোন বিধান তারা মোটেই জানত না।[৩]

প্রিয় পাঠক! আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমরা বর্তমানে যে সমাজে

---

[১] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৩১/৮২।

[২] আলী সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুরাবিতীন*, পৃ : ১৫।

[৩] ইবনে আবি যারা', *আলআনিসুল মুতরিব*, পৃ : ১২৪।

Scanned with CamScanner

ও যে ধরনের পরিস্থিতিতে বসবাস করছি, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও শোচনীয় ছিল আলোচ্য সানহাজা গোত্রের সমাজ-পরিস্থিতি। এবার সামনে আমরা দেখব, কীভাবে একটি জাতি জেগে ওঠে? উপলব্ধি করব, নববী আদর্শের অনুসরণে পরিচালিত সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে কীভাবে একটি জাতির সামগ্রিক অবস্থা আমূল বদলে যায় এবং কীভাবে একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়? পাশাপাশি আমরা পরিচিত হব সেসব মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, যারা ছিলেন এই জাতি-সংস্কার ও রাষ্ট্র-বিনির্মাণ রেনেসাঁর প্রধান পথিকৃৎ।

ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম আলগুদালী রহ.

জাতির সংস্কার-চিন্তায় দগ্ধ এক মহান শাসক

নতুন শাসক ইয়াহইয়া আলগুদালী কিছুদিন পর হজ্ব করার মনস্থ করলেন। এটি সে যুগের কথা, যখন হজ্বের সফর কেবল হজ্বের সফর হত না, হজ্বের সফর হত একই সঙ্গে প্রেমের সফর ও জ্ঞানার্জনের সফর। আর তাই দীর্ঘ এক সফরের প্রস্তুতি নিয়ে ইয়াহইয়া মুসলিম প্রাচ্যের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি তার পুত্র ইবরাহীমকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন। মানাসিকে হজ্ব সমাপন করার পর ফেরার পথে তিনি কায়রোওয়ানে উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার তৎকালীন মালেকী ইমাম আবু ইমরান বিন মুসা বিন ঈসা আলফাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে সেকালে মালেকী মাযহাবই প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও সেখানে মালেকী মাযহাবই প্রচলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন আন্দালুসের মুসলিম জনগোষ্ঠীও ছিল মালেকী মাযহাবের অনুসারী। যাই হোক, ইয়াহইয়া আলগুদালী মালেকী শায়খ আবু ইমরান আলফাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আবু ইমরান সেই মহান আলিম, যার সম্পর্কে ইমাম হুমাইদী মন্তব্য করেছেন,

> তিনি ছিলেন কায়রোওয়ানের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ এবং আপন যুগের ইমাম। তিনি আন্দালুস সফর করেছেন এবং ইলম অন্বেষণে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে ইরাক পর্যন্ত গিয়েছেন। কায়রোওয়ান,

Scanned with CamScanner

> মিশর, মক্কাসহ ইলমের সমৃদ্ধ সব অঙ্গন থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪]

অপরদিকে আল্লামা হিময়ারী 'আররাওযুল মি'তার' গ্রন্থে তাকে ফকীহ, ইমাম, ইলম ও সৎ গুণের ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন।[৫]

ইবনে ফারহুন লিখেছেন,

> তিনি (আবু ইমরান) ছিলেন জ্ঞান ও ধী-শক্তির ক্ষেত্রে আপন যুগের শীর্ষতম ব্যক্তি। মালেকী মাযহাবের প্রখর জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখস্থকরণ, মর্মার্থ অনুধাবন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিদ্বান ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল উচ্চারণে সাত কেরাতে কোরআন পাঠ করতেন। এছাড়াও ইলমুর রিজাল, ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ইত্যাদি শাস্ত্রেও তার অসামান্য দক্ষতা ছিল। মাগরেব ও আন্দালুসের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য তালিবে ইলম তার কাছ থেকে ইলমী সুধা লাভ করে ধন্য হয়েছে। তার 'লিক্বা' ও জ্ঞানসংস্পর্শ হতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণও তার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করার 'ইজাযত' লাভের তামান্না করত। ফিকহে মালেকীর আকর গ্রন্থ 'আলমুদাওওয়ানা'-এর ওপর তার সুবিশাল টীকাগ্রন্থ রয়েছে, যা তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি।[৬]

ফকীহ আবু ইমরানের সাক্ষাৎ লাভ ও তার দরসে বসার পর ইয়াহইয়ার চোখ খুলে গেল। তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং বলতে গেলে নতুন এক জীবনের সন্ধান লাভ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার জাতি মূর্খতার ঘোর-অমানিশায় নিমজ্জিত আছে। নিশ্চিত করেই বলা যায়, জাতি ও কওমের কল্যাণকামী এই মহান শাসকের সামনে যখন বাস্তবতা উন্মোচিত হল, তখন তিনি আপন জাতির প্রতি বিরাট এক দায়িত্বভার অনুভব করলেন। তিনি তার শায়খ ও উসতায আবু ইমরানকে জানালেন তার পশ্চাৎপদ জাতির কথা। জানালেন, তিনি এমন এক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন, যারা দ্বীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সাধারণ জনগণ তো কালিমা

---

[৪] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস*, ১/৩৩৮।

[৫] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৪৩৫।

[৬] ইবনে ফারহুন, *আদদিবাজুল মুযাহহাব ফী মা'রিফাতি আ'ইয়ানি উলামাইল মাযহাব (আলমালিকী)*, ২/৩৩৭-৩৩৮।

Scanned with CamScanner

ছাড়া কিছুই জানে না; গোত্রের বিশেষ ব্যক্তিগণের মধ্যেও খুব অল্পসংখ্যক মানুষই নামায পড়ে। তাদের না আছে ধর্মজ্ঞান, না আছে অনুসরণীয় মাযহাব। কারণ, তারা বসবাস করে সভ্য জগতের বসতি থেকে বহু দূরে মরুভূমির গহীনে। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ-ই তাদের এলাকায় সফর করে না। অবশ্য তাদের মাঝে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা সুযোগ ও পরিবেশ পেলে দ্বীনের নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন বা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী।

ফকীহ আবু ইমরান ইয়াহইয়ার সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তিনি ইয়াহইয়াকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু জেনে নিলেন এবং সানহাজা জাতির জ্ঞান-দীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন।[৭]

এরপর তিনি তার ছাত্রদের সামনে বিষয়টি তুলে ধরে মরুভূমির দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষদের কাছে দ্বীন পৌছানোর জন্য সফরে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু কেউ-ই তাতে রাজী হল না। এরপর ফকীহ আবু ইমরান ইয়াহইয়াকে পাঠালেন তার নিজের শায়খ মাগরেবের বিখ্যাত ফকীহ ওয়াজাজ বিন যিলু আললামতীর নিকট। ইয়াহইয়া তার কাছে উপস্থিত হয়ে সবকিছু খুলে বললে ফকীহ ওয়াজাজ ইয়াহইয়ার সঙ্গে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করলেন তার অন্যতম মেধাবী ও নামকরা ছাত্র আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনকে।

[৭] ইবনে আবি যারা', *আলআনিসুল মুতরিব*, পৃ : ১২২।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন রহ. ও মুরাবিতী আন্দোলনের সূচনা

কে এই শায়খ? কী তার পরিচয়?

মুরাবিতীদের প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ, বিক্ষিপ্ত মুরাবিতী সমাজকে এক পতাকাতলে সমবেতকারী আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন রহ. ছিলেন ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম ধারক এবং মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ। তার মৃত্যু ৪৫১ হিজরী মোতাবেক ১০৫৯ খৃস্টাব্দে।

তিনি ছিলেন একাধারে প্রখর মেধাবী, অত্যন্ত প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ এক তালিবে ইলম, জ্ঞানে-গুণে-ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণে অনন্য; তাকওয়া ও খোদাভীরুতায়, ফিকহ ও দ্বীনের প্রাজ্ঞতায়, সাহিত্য ও রাজনীতিতে অত্যুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।[৮]

হাফিয যাহাবী রহ. তার সম্বন্ধে লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন ইস্পাতকঠিন মনোবলের অধিকারী, উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুবিবেচক ও দক্ষ প্রশাসক।[৯]

আর তাই তারই সমবয়স্ক অন্যরা যখন সভয়ে পিছিয়ে এসেছিল, তিনিই তখন এই মহান দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং শহরের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের পরিবর্তে বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সংগ্রামের জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ... নববী মিশন

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন সুগভীর সাহারার পথে রওয়ানা হলেন। আলজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও মৌরিতানিয়ার উত্তর অঞ্চল পাড়ি দিয়ে তিনি পৌঁছলেন প্রচণ্ড উষ্ণ ও অনুর্বর মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে গুদালা গোত্র

---

[৮] দেখুন : ইবনে আবি যারা', *রাওযুল কিরতাস*, পৃ : ১২৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৭।

[৯] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৩১/৮০।

Scanned with CamScanner

অধ্যুষিত এলাকায়। তিনি সেখানকার মুসলমানদের করুণ পরিস্থিতি স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। দেখলেন, কীভাবে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীল ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে; দেখলেন, কেউ তাদের বাধা দিচ্ছে না, বাধা দেওয়ার কথা ভাবছেও না। তিনি দেখলেন এবং দরদ-ব্যথায় অস্থির হলেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি তাদের মাঝে দ্বীনী শিক্ষার প্রচার শুরু করলেন, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করলেন, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করলেন। সানহাজা গোষ্ঠী তখন কতটা অজ্ঞতাচ্ছন্ন ছিল, তার বিবরণ কাযী ই'য়ায রহ. এভাবে দিয়েছেন,

> দ্বীনের জ্ঞান তাদের মাঝে একেবারেই অল্প ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ, মূর্খ। বেশির ভাগ মানুষ কালিমা ছাড়া কিছুই জানত না। কালিমা-পরিচয় ব্যতীত ইসলামের বিধি-বিধান ও কর্ম-দায়িত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান তাদের ছিল না।[১০]

কিন্তু আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন যখন দ্বীনী জ্ঞানের প্রচার শুরু করলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দিতে লাগলেন, গুদালা গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হল। কারণ, চলমান মূর্খতাপূর্ণ পরিবেশ থেকে তারাই সবচে' বেশি ফায়দা লুটছিল। তাদের প্ররোচনায় জনসাধারণ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করল এবং তার দাওয়াতী কাজে বাধা সৃষ্টি করল। গোত্রপ্রধান ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম আলগুদালী শত চেষ্টা করেও এদের হাত থেকে শায়খকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন।

বিরুদ্ধবাদীদের শত বাধায়ও আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন হতোদ্যম হলেন না। তিনি আপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। জনসাধারণ তাকে বেদম প্রহার করল, অপমান করল; এমনকি একপর্যায়ে বিতাড়ন ও হত্যার হুমকি দিল; কিন্তু শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন অটল-অবিচল। বাধা যত বৃদ্ধি পায়, তার চেয়ে বহু গুণে বৃদ্ধি পায় তার দৃঢ়তা ও কর্ম-প্রচেষ্টা। এভাবেই দিন অতিবাহিত হতে লাগল। তিনি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। একপর্যায়ে মানুষ তাকে বসতি থেকে তাড়িয়ে দিল। সানহাজা গোষ্ঠী যেন তাদের আচরণের ভাষায় বলছিল, বাপু! তুমি নিজের চিন্তা কর, আমাদের চিন্তা তোমার করতে হবে না। তুমি আপন কওমের কাছে ফিরে যাও, আমাদের

---

[১০] কাযী ইয়ায, *তারতীবুল মাদারিক*, ২/৬৪।

Scanned with CamScanner

বাদ দিয়ে তাদেরকে দ্বীন শেখাও। এই দেশ যেমন আছে, তেমনই থাকতে দাও। এখানকার মানুষজন নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

আর শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন, বিশ্বাস করুন প্রিয় পাঠক! আমি যেন দিব্য চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মানুষ তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সানহাজা গোত্রের সীমানা ঘেঁষে; গণ্ডদেশ বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একজন দরদী দাঈর হৃদয়ে জমে থাকা ব্যথার বরফ; মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমতাভরা হৃদয়ে ধরে আসা কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করছেন,

﴿يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ﴾

আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত! [সূরা ইয়াসিন : ২৬]

আহা! কত ব্যথা হৃদয়ে ভরা! তিনি চাইছেন বদলে দিতে; কিন্তু পারছেন না। মানুষ তার কাছ থেকে পালিয়ে ছুটছে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির পথে, সুপথ ও সঠিক নীতি হতে বিচ্যুতির দিকে; কিন্তু তিনি সংশোধনের সুযোগ পাচ্ছেন না। এ বিষয়টিও তাকে পীড়া দিচ্ছিল যে, এ দেশে কত মুসলিম শিশু জন্মগ্রহণ করবে; কিন্তু দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার এবং সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার উপযুক্ত কাউকে তারা খুঁজে পাবে না। তিনি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কোথায় থাকবেন? কীভাবে থাকবেন? নতুন করে গুদালা গোত্রের মাঝে ফিরে যাবেন? কিন্তু তাহলে যে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। তাকে হত্যা করেও যদি তারা কোন কল্যাণের সন্ধান পেত, তিনি হাসিমুখে মৃত্যুকে স্বাগত জানাতেন। কিন্তু হায়! কোথায় তাদের কল্যাণ? কত দূর?

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ... মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অঙ্কুরোদ্গম

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ভাবতে লাগলেন, তিনি কী করবেন। ভাবনার অথৈ সাগরে তিনি হাবুডুবু খেতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা তাকে পথ দেখালেন। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের গভীরতম অঞ্চল সাহারার আরও গহীনে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন এবং একটি দ্বীপে পৌঁছলেন। ঐতিহাসিকগণের প্রবল ধারণামতে এটি ছিল টিমবাক্টা (Timbukta)[১১]

[১১] বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মালির একটি শহর।

Scanned with CamScanner

শহরের নিকটে নাইজার নদীর বাঁকে অবস্থিত কোন এলাকা। জনমানবহীন এ এলাকা থেকেই মুরাবিতী সাম্রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[১২] ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন এ দ্বীপটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> নীল নদ[১৩] দ্বীপটিকে বেষ্টন করে আছে। গ্রীষ্মকালে নদীর পানি এত কম থাকে যে, পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়; আর শীতকালে তা এমন খরস্রোতা রূপ ধারণ করে যে, পার হতে নৌকার প্রয়োজন হয়।[১৪]

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন সেখানে একটি সাদামাটা তাঁবু স্থাপন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তার বিগত দিনের দাওয়াতী প্রচেষ্টার ফলে গুদালা গোত্রের কিছু ব্যক্তি বিশেষ করে কিছু তরুণের হৃদয় ও স্বভাব-প্রকৃতি দ্বীনের প্রতি স্পন্দিত হয়েছিল। তারা যখন শায়খের এই দূরবর্তী অবস্থানস্থলের সংবাদ পেল, তখন মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে তারাও শায়খের কাছে ভীড় জমাতে লাগল। প্রথমে এদের সংখ্যা সাতের অধিক ছিল না। হিজরতকারী দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম আলগুদালী;[১৫] তিনি তার জাতি ও ক্ষমতা ছেড়ে শায়খের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থের বর্ণনামতে এই প্রথম কাফেলায় লামতুনা গোত্রের দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন। তারা হলেন ইয়াহইয়া বিন ওমর ও তার ভাই আবু বকর বিন ওমর।[১৬]

নতুন এই পরিবেশ যে কতটা প্রতিকূল ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এখানেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন তাদেরকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেভাবে ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে, ইসলামের সেই সঠিক ও স্বচ্ছ শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন; তাদের সামনে তুলে ধরলেন, কেন ও কীভাবে ইসলাম সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম এবং কীভাবে ইসলাম মানবজীবনের সকল বিষয়ে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল ধারা সৃষ্টি করে।

---

[১২] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩০২।

[১৩] ইবনে খালদূনের উদ্দেশ্য নাইজার নদীর কোন শাখা নদ। মিশর ও সুদানে অবস্থিত নীলনদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। নাইজারের কোন শাখা নদই সেকালে নীল নামে পরিচিত ছিল।

[১৪] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/১৮৩।

[১৫] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১২৫, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, ৩/২২৭ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৮।

[১৬] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/১৮৩।

Scanned with CamScanner

মুরাবিতীদের আবির্ভাব এবং নববী আদর্শে তারবিয়াত ও দীক্ষা

ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকল তালিবে ইলমের সংখ্যা এবং স্বাভাবিকভাবেই অস্থায়ী আশ্রয়-তাঁবুর সংখ্যা। প্রথমে পঞ্চাশ, এরপর এক শ', দেড় শ', দুই শ'। একসময় জ্ঞানপিপাসুদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল যে, শায়খের পক্ষে সবার কাছে একসঙ্গে তার ইলম পৌছানো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি তাদেরকে ছোট ছোট কয়েকটি 'হালাকা' ও পাঠদলে বিভক্ত করলেন এবং প্রতিটি হালাকার জন্য মেধাবী একজনকে জিম্মাদার নিযুক্ত করলেন। প্রকৃতপক্ষে বহুসংখ্যক ছাত্রকে এভাবে হালাকাভিত্তিক বণ্টন করে সহজে শিক্ষাপ্রদানের নীতিটি ছিল নববী আদর্শপ্রসূত। মক্কায় সাহাবীদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার সময় নবীজী এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বাইআতে আ'কাবার সময় মদীনা থেকে আগত বাহাত্তর জন সাহাবীকে নবীজী বারটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতি পাঁচজনের জন্য একজন করে মুখপাত্র ও জিম্মাদার নির্ধারণ করেন। এরপর নবীজী তাদেরকে পুনরায় মদীনায় পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বীজ মূলত এদের মাধ্যমেই রোপিত হয়েছিল।

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন এই নববী মানহাজ অনুসরণ করে তার তা'লীমী মেহনত অব্যাহত রাখলেন। ফলে দাওয়াতী প্রচেষ্টার সূচনা ও মাতৃভূমি ত্যাগ করে এই দূর দ্বীপে আশ্রয় নেওয়ার মাত্র চার বছরের মাথায় ৪৪০ হিজরীতে (১০৪৮ খৃস্টাব্দে) তালিবানে ইলমের সংখ্যা এক হাজারে পৌছল। মহান আল্লাহর বাণী তো চিরন্তন সত্য,

﴿نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর (হে রাসূল!) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। [সূরা সাফ্ফ : ১৩]

নিঃসন্দেহে শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের এই কর্মপ্রচেষ্টা একজন দাঈ ও মুআল্লিমের জন্য তথা দ্বীনের সকল ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত এবং সান্ত্বনার পাথেয়। একজন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বান করায় বিতাড়িত হলেন, নির্যাতনের শিকার হলেন, প্রহৃত হলেন, পেলেন প্রাণনাশের হুমকি। এরপর বাধ্য হয়ে পাড়ি জমালেন সাহারার গহীনতম এলাকায় সেনেগালের উত্তরে সম্পূর্ণ একাকী বিতাড়িত অবস্থায়। তারপর

Scanned with CamScanner

মাত্র চার বছর সময়কালের মধ্যেই তার হাতে তৈরি হল এক হাজার জনের এক আলোকিত কাফেলা, যারা প্রত্যেকে ইসলামী জ্ঞান ও বাস্তবতার তত্ত্বজ্ঞানে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত।

ইবনে আবি যারা' মুরাবিতী আন্দোলনের এই পর্যায় সম্বন্ধে লিখেছেন,

> তারা দু'জন দ্বীপে উপস্থিত হলেন এবং তাদের সঙ্গে দ্বীপে প্রবেশ করলেন গুদালা গোত্রের সাতজন ব্যক্তি। তারা সেখানে একটি ছাউনি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সেখানে অবস্থান করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে তিন মাস পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন রইলেন। এক কান-দু' কান করে মানুষের কাছে তাদের ইবাদতের কথা, জান্নাতের প্রত্যাশায় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশায় রোনাজারি করার কথা পৌঁছে গেল। ফলে ইসলাম সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক প্রচুর মানুষ তাওবা করে ধীরে ধীরে সেখানে ভীড় জমাল।
>
> আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন তাদেরকে কোরআন পাঠ শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাদের মাঝে পরকালমুখিতা সৃষ্টি করলেন, নেককাজের প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং আল্লাহর আযাবের কথা তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করতে লাগলেন। ফলে মুসলমানদের প্রতি তার হৃদয়ের ভালোবাসা ও মমতার বিষয়টি সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল এবং অল্প ক'দিনের মধ্যেই সানহাজা গোত্রের বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় প্রায় এক হাজার ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। যেহেতু তারা ইলম অর্জনের জন্য সবসময় শায়খের ছাউনির পাশে জমে থাকত, তাই তিনি তাদেরকে মুরাবিতীন (ছাউনিওয়ালা) বলে ডাকতেন।
>
> শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন তাদেরকে কোরআন, সুন্নাহ, ওযু, নামায, যাকাতসহ যাবতীয় ফারায়েযের শিক্ষা দান করতে লাগলেন। যখন তারা দ্বীনের এসব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করল এবং সংখ্যায়ও অনেক হল, একদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করে নসীহত করতে শুরু করলেন এবং সকলের অন্তরে জান্নাতের আগ্রহ এবং জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ভয়, আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার অবলম্বনের আদেশ করলেন এবং এতে যে ফাযায়েল ও সাওয়াব নিহিত আছে, তা শোনালেন।
>
> এরপর তিনি তাদেরকে সানহাজা গোত্রের যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ

Scanned with CamScanner

করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে মুরাবিতী সম্প্রদায়! তোমরা তো এখন বড় একটি জামাত। তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের বিশ্বাস ও আমলের সংশোধন করেছেন এবং তোমাদেরকে তার সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ-প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর করা, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।

তখন উপস্থিত তালিবানে ইলমের জামাত বলল, শায়খ! আপনি যা ইচ্ছা আদেশ করুন, আমাদেরকে বাধ্য ও অনুগত পাবেন। আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের বাপ-দাদাকে হত্যা করার আদেশও করতেন, আমরা তাও পালন করতাম।

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন তাদেরকে বললেন, আল্লাহর বরকতকে সঙ্গী করে তোমরা বের হয়ে পড় এবং তোমাদের আপন সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন কর, আল্লাহর বিধি-বিধান ও দলীল-প্রমাণ তাদের কাছে পুরোপুরি পৌঁছিয়ে দাও। যদি তারা তাওবা করে এবং হকের পথে ফিরে আসে, যেসব অন্যায়-অনাচারে তারা লিপ্ত আছে, তা পুরোপুরি বর্জন করে, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। আর যদি তারা সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ও ভ্রষ্ট কর্মে অটল থাকে এবং অবাধ্যতাকেই আঁকড়ে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করব এবং আল্লাহ পাকের ফয়সালা আসার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর বিধান পালন করে যাব। আল্লাহ তাআ'লাই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

শায়খের এই ভাষণের পর প্রত্যেকে আপন আপন পরিবার ও কওমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। তারা তাদেরকে দ্বীনের কথা শোনাল, আযাবের কথা শোনাল এবং যে ভ্রান্তিতে সকলে নিমজ্জিত আছে, তা ত্যাগ করার আহ্বান জানাল। কিন্তু কেউ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হকের পথে ফিরে এল না।

এরপর শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন নিজেই বের হয়ে এলেন এবং সকল শাখা-গোত্রের প্রধান ব্যক্তি ও প্রবীণদেরকে একত্র করে তাদের

Scanned with CamScanner

সামনে আল্লাহর বিধান পাঠ করে শুনিয়ে তাদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান জানালেন। একটানা সাতদিন তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে সতর্ক করলেন; কিন্তু তারা শায়খের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করল না; বরং অনাচার আরও বাড়িয়ে দিল। অবশেষে তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন তার শিষ্যদেরকে বললেন, আমরা আল্লাহর বিধান পূর্ণরূপে পৌছিয়ে দিয়েছি এবং সতর্ক করেছি। এখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও।[১৭]

'মুরাবিতীন' শব্দের অর্থ

আরবী 'রিবাত' শব্দের মূল গঠনতান্ত্রিক অর্থ হল প্রত্যেক এমন বস্তু, যা দ্বারা বাহনজন্তুকে বাঁধা হয়। পরবর্তীতে শব্দটি সীমান্ত-শহরবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে; যারা সর্বদা বাইরের আক্রমণ থেকে সীমান্তশহরকে রক্ষায় ব্যস্ত থাকে। এ বিবেচনাতেই রিবাত-এর আরেকটি অর্থ হল সার্বক্ষণিক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা।[১৮] ইমাম বুখারী রহ. আপন সনদে সাহল বিন সা'দ রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»

আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও তার উপর যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।[১৯]

যেহেতু মুরাবিতীগণ (সীমান্তরক্ষীগণ) সীমান্ত এলাকাতে ছাউনি স্থাপন করে মুসলিম সীমান্তকে রক্ষা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেন, তাই শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ও তার সঙ্গীগণ, যারা সেনেগালের নদীর পাড়ে ছাউনি স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন, সকলে মুরাবিতী জামাত নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং ইতিহাসে এ নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

---

[১৭] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১২৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৮।

[১৮] দেখুন : ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, (ربط) ভুক্তিমূল, ৭/৩০২।

[১৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৭৩৫ ও *জামে' তিরমিযী*, হাদীস নং ১৬৬৪।

Scanned with CamScanner

অবশ্য কোন কোন উৎসগ্রন্থে তাদেরকে 'মুলাছ্ছামিন' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে 'আমীরুল মুলাছ্ছামিন' 'দাওলাতুল মুলাছ্ছামিন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ নামকরণের কারণ উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান রহ. লিখেছেন,

> এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবসময় নিজেদের চেহারা নেকাব বা মুখোশে আবৃত করে রাখত এবং কখনোই উন্মুক্ত করত না। এ কারণেই মানুষ তাদেরকে 'মুলাছ্ছামিন' বলে ডাকত। এ রীতি তারা বংশপরম্পরায় পূর্বসূরিদের কাছ থেকে লাভ করেছিল। এভাবে চেহারা আবৃত রাখার কারণ সম্পর্কে কথিত আছে, হিময়ার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অত্যধিক গরম ও প্রচণ্ড শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুখ ঢেকে রাখত। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে গোত্রের সাধারণ মানুষগণও এরূপ করতে শুরু করে। আরেক বর্ণনামতে, এর কারণ হচ্ছে, একবার তাদের পার্শ্ববর্তী এক শত্রুগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নেয়– তারা যখন কোন কারণে এলাকার বাইরে থাকবে, তখন তাদের গ্রামে আক্রমণ করে ধন-সম্পদ লুট করবে এবং নারীদেরকে অপহরণ করবে। তখন গোত্রের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরামর্শ দেন, গোত্রের নারীদেরকে পুরুষদের পোশাক পরিধান করিয়ে গোপনে গ্রামের এক প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং পুরুষগণ নারীদের বেশে চেহারা ঢেকে বাড়িতে অবস্থান করবে। যখন শত্রুরা তাদেরকে নারী ভেবে আক্রমণ করতে আসবে, তখন তারা বেরিয়ে আসবে। গ্রামের নওজোয়ানরা প্রবীণদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এবং প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে হত্যা করে। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের এই স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার উদ্দেশ্যে এরপর থেকে তারা সর্বদা নেকাবে মুখ ঢেকে রাখত।[২০]

ইবনুল আছীর রহ.[২১] তাদের এই রীতি অবলম্বনের কারণ উল্লেখ করতে

---

[২০] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/১২৯।

[২১] উলূমে ইসলামিয়া (ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান)-এর জগতে ইবনুল আছীর নামে তিনজন ব্যক্তি বিখ্যাত এবং তারা পরস্পর সহোদর ভাই। সকলের জন্ম বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত জাযিরাতু ইবনে ওমর (Cizre) এলাকায়। তাদের বংশধারা হল: ... বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম বিন আবদুল ওয়াহিদ। নিম্নে তিন ভাইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

১. ইবনুল আছীর আলমুহাদ্দিস (হাদীসবিশারদ ইবনুল আছীর)

Scanned with CamScanner

গিয়ে লিখেছেন,

লামতুনা গোত্রের একটি দল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে শত্রুরা তাদের এলাকায় আক্রমণ চালাতে আসে। এলাকায় তখন বয়োবৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা ছাড়া কেউ উপস্থিত ছিল না। প্রবীণ ব্যক্তিগণ যখন নিশ্চিত হলেন যে, আগত কাফেলা তাদের শত্রু, তখন তারা নারীদেরকে পুরুষদের বেশ ধারণ করার, পরিচয় লুকানোর জন্য চেহারা আবৃত রাখার এবং অস্ত্রধারণ করার নির্দেশ দিলেন। নারীরা তা-ই করল। বয়োবৃদ্ধ ও শিশুরা সামনে থাকল আর নারীরা বাড়ির আশেপাশে চক্কর দিতে লাগল। শত্রুদল কাছে আসার পর সত্যিই ধোঁকায় পড়ে গেল এবং তাদেরকে পুরুষ মনে করল। তারা বলাবলি করতে লাগল, এসব পুরুষরা নিজেদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য রয়ে গেছে। সুতরাং তারা মরণপণ লড়াই করে হলেও তাদেরকে রক্ষা করবে। তাই আমরা তাদেরকে হামলা না করে বাইরে থাকা গবাদি পশু লুট করে চলে যাব। আর যদি তারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তাহলে তখন

তার নাম মুবারক, উপনাম আবুস সাআ'দাত, উপাধি মাজ্‌দুদ্দীন। জন্ম ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০ খৃস্টাব্দে), মৃত্যু ৬০৬ হিজরীতে (১২১০ খৃস্টাব্দে) মুসিলে। তার বিখ্যাত কয়েকটি রচনাকর্ম হল: গারীবুল হাদীস (হাদীসের দুর্বোধ্য, জটিল ও কঠিন শব্দসমূহের অর্থ নির্ণয়-শাস্ত্র)-শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ «النهاية في غريب الحديث والأثر», হাদীসশাস্ত্রে «جامع الأصول في أحاديث الرسول» , তাফসীরশাস্ত্রে «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» ইত্যাদি।

২. ইবনুল আছীর আলমুআর্‌রিখ (ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর):
তার নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি ইযযুদ্দীন। জন্ম ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খৃস্টাব্দে), মৃত্যু ৬৩০ হিজরীতে (১২৩৩ খৃস্টাব্দে) মুসিলে। তার বিখ্যাত কয়েকটি রচনাকর্ম হল: ইতিহাসশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ «الكامل», সাহাবা পরিচিতি-শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ «أسد الغابة في معرفة الصحابة», বালাগাতশাস্ত্রে «الجامع الكبير» ইত্যাদি।

৩. ইবনুল আছীর আলকাতিব:
তার নাম নাসরুল্লাহ, উপনাম আবুল ফাত্‌হ, উপাধি যিয়াউদ্দীন। জন্ম ৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খৃস্টাব্দে), মৃত্যু ৬৩৭ হিজরীতে (১২৩৯ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে। তার বিখ্যাত কয়েকটি রচনাকর্ম হল, «كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب», «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ইত্যাদি। মুসিলের শাসনকর্তা মাহমুদ বিন ইযযুদ্দীন মাসউদের দরবারে লেখক হিসেবে কাজ করতেন বলে তিনি আলকাতিব নামে পরিচিত লাভ করেন।

বলাবাহুল্য, আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ ইতিহাস বিষয়ক হওয়ায় উদ্ধৃতিসমূহে *'আলকামিল'* গ্রন্থের লেখক ইবনুল আছীর আলমুআররিখ-এর নামই উদ্দেশ্য হবে। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

যেহেতু তারা পরিবার থেকে দূরে থাকবে, সহজেই আমরা তাদেরকে পরাভূত করতে পারব। যখন শত্রুদল চারণভূমি থেকে গবাদি পশু একত্র করতে লাগল, ঠিক তখনই গোত্রের পুরুষ সদস্যরা ফিরে এল। ফলে শত্রুদল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং নিজেদেরকে শত্রুপক্ষের দু' দলের মাঝে আবিষ্কার করল। ফলে পুরুষদল তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করল, নারীরা হত্যা করল আরও বেশি।

সেই সময় থেকে তারা নেকাব পরিধান করাকে নিজেদের সার্বক্ষণিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিল, যেন যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ পার্থক্য করা না যায়। রাত-দিন সবসময়ই তারা নেকাব পরিধান করে থাকত। তাদের এই নেকাব পরিধান সম্পর্কে বিভিন্ন কবিতাও রচিত হয়েছে। যেমন,

قَوْمٌ لَهُمْ دَرْكُ الْعُلٰى فِيْ حِمْيَرٍ وَإِنِ انْتَمَوْا صَنْهَاجَةً فَهُمُ هُمُ

لَمَّا حَوَوْا إِحْرَازَ كُلِّ فَضِيْلَةٍ غَلَبَ الْحَيَاءُ عَلَيْهِمُ فَتَلَثَّمُوْا

হিময়ার গোত্রের জনৈক শাখা-গোত্রের আছে উচ্চতর বংশীয় মর্যাদা আর যখন তারা সম্বন্ধিত হন সানহাজা গোত্রের প্রতি, তখন তো সোনায় সোহাগা!

উন্নত সব সম্বন্ধ ও মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় তারা স্বভাব-লাজুকতায় আক্রান্ত হল আর তাই আবৃত করল আপন চেহারা।[২২]

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ও তার সঙ্গী মুরাবিতীদের ইতিহাস যিনি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করবেন, তিনি মনে করবেন যে, তারা হয়তো কেবল সভ্যতার কোলাহল ও সামাজিক বিভিন্ন ব্যস্ততা থেকে দূরে অবস্থান করে নিশ্চিন্তে আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত করার জন্যই সমাজ ত্যাগ করে এই দূর দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং তাদের এই সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ছিল একটি দীর্ঘ ও বিশাল পরিকল্পনার অংশ-মাত্র। শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা, সঠিক উপলব্ধিবোধ, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুনিপুণ কুশলতা– এ সবকিছুর সমন্বয়ে একটির পর একটি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই

[২২] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*; ৮/৩৩১। পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের রচয়িতা হিসেবে আবু মুহাম্মাদ বিন হামিদ আলকাতিব-এর নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

সুবিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

মুরাবিতীদের সংখ্যা যখন এক হাজারে পৌঁছল, শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন তাদেরকে আপন আপন কওমের কাছে সতর্কবাণী পৌঁছিয়ে দিতে, তাদেরকে বিদআত ও ভ্রষ্ট কাজ হতে বাধাপ্রদান এবং সঠিক দ্বীনের বিধি-বিধান অনুসরণের দাওয়াত করতে আদেশ করলেন। মুরাবিতীগণ তার আদেশ পালন করে আপন আপন কওমকে হেদায়েতের পথ অবলম্বন করার এবং দ্বীনের নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিহার করার আহ্বান করল। কিন্তু কওমের কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিল না। এরপর আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন নিজে বের হয়ে গোত্রগুলোর প্রবীণ ব্যক্তিদের শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার আহ্বান জানালেন এবং আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করলেন। কিন্তু এবারও বিরোধিতা ও হুমকি-ধমকি ছাড়া কিছুই জুটল না। সরশেষে আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ও তার সঙ্গীবৃন্দ বিরুদ্ধচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।[২৩]

এরপর তারা আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে ইসলামী অভিযান পরিচালনা করার উদ্দেশে প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং বিরুদ্ধচারীদের কাছে বারবার সতর্কবার্তা পাঠালেন। এরপরই শুরু হল মুরাবিতীদের যুদ্ধাভিযান, বিজিত হতে লাগল একের পর এক বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চল। ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ফকীহ-আলিমগণ সংবাদ পেয়ে সামরিক সহায়তা পাঠাতে লাগলেন, যেন এসব এলাকার মুসলমানগণ তাগুত ও অন্যায় শাসকদের শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

মুরাবিতী-অধ্যায়ের অনন্য নাম ইয়াহইয়া বিন ওমর লামতুনী

কিছুদিন পর মুরাবিতীদের আমীর ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম আলগুদালী এক যুদ্ধে শহীদ হলেন। আমীর ইয়াহইয়া-ই সেই মহান ব্যক্তি, যার মাধ্যমে ইতিহাসে মুরাবিতী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সেই সাতজনের একজন, যারা শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন গুদালা কওম কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর শায়খের সঙ্গে দ্বীপান্তর ও তাঁবুর জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীমের মৃত্যুর পর শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন রহ. জাওহার আলগুদালীকে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। কিন্তু নেতৃত্ববিমুখ জাওহার গুদালী এ প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর

---

[২৩] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩০২-৩০৩।

Scanned with CamScanner

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আর তা হল নেতৃত্বের দায়িত্ব ইয়াহইয়া বিন ওমর লামতুনীকে প্রদান।[২৪] পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, সর্বপ্রথম যে সাতজন ব্যক্তি দেশত্যাগ করে শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের তাঁবুতে ইলম অন্বেষণে সমবেত হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র দু' জন ছিলেন সানহাজা গোত্রের দ্বিতীয় বৃহৎ শাখাগোত্র লামতুনা গোত্রের। তাদের একজন হলেন এই ইয়াহইয়া বিন ওমর লামতুনী, অপরজন তারই সহোদর আবু বকর বিন ওমর লামতুনী।

বাস্তবে আমরা এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিতে পারি না যে, শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের সঙ্গে ইয়াহইয়া-পরবর্তী গুদালা গোত্রপ্রধান জাওহার গুদালীর পূর্বেই গোপনে সমঝোতা হয়েছিল এবং দ্বীন ও উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে জাওহার গুদালী ইয়াহইয়া লামতুনীর জন্য নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কেননা, এমন একটি দল, যাদের অধিকাংশই গুদালা গোত্রের, তাদের নেতৃত্ব লামতুনা গোত্রের ইয়াহইয়া বিন ওমরকে প্রদানের মধ্যে এমন দীক্ষামূলক মর্ম লুকিয়ে আছে, যা যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে চলে আসা সাম্প্রদায়িক পতনকে রুখতে সক্ষম।[২৫] তাছাড়া এতে দাওয়াতী কাজের অগ্রগতির স্বার্থও নিহিত ছিল। কেননা, ইয়াহইয়া ও তার ভাই আবু বকর উভয়ে ছিলেন লামতুনা গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি; কিন্তু শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের দাওয়াতে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে তারা নেতৃত্ব ত্যাগ করে শায়খের সামনে দো'জানু হয়ে বসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাদের একজনকে নেতৃত্ব প্রদান করা হলে স্বাভাবিকভাবেই লামতুনা গোত্রের লোকেরা মুরাবিতীদের এই সংস্কার-আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবে বলে আশা করা যায়। অপরদিকে প্রথমেই লামতুনা গোত্রের ইয়াহইয়া বিন ওমরকে নেতৃত্ব প্রদান না করে জাওহার গুদালীকে প্রস্তাব দেওয়া এবং জাওহার কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যানের পেছনেও দ্বীনী ও দাওয়াতী স্বার্থ নিহিত ছিল। এর ফলে গুদালা গোত্রের লোকদের মনেও এই অশুভ ধারণা সৃষ্টি হবে না যে, তাদের বাদ দিয়ে লামতুনা গোত্রের একজনকে তাদের নেতৃত্ব

---

[২৪] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৩২৮।

[২৫] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, লামতুনা ও গুদালা গোত্র ছিল মাগরেবের এ অঞ্চলের সবচে' শক্তিশালী ও বৃহৎ গোত্র। সংক্ষেপে ও সহজে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য একে ইসলামপূর্ব মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু গোত্রদু'টির মধ্যে বিগত বহু বছর ধরে বংশ ও গোত্রকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা চলে আসছিল, তাই এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখাও জরুরী ছিল। ইতিহাস সাক্ষী, শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণে কতটা ইতিবাচক প্রভাব রেখেছিল।

৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খৃস্টাব্দে) ইয়াহইয়া বিন ওমর লামতুনী মুরাবিতীদের নেতা নির্বাচিত হলেন। এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই একের পর এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও ছোট ছোট গোত্র বিজিত হতে থাকল এবং মুরাবিতীদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পাশাপাশি হাজারো মুসলমান তাদের শাসনভুক্ত হল।

লুমতুনা গোত্র মুরাবিতী কাফেলায় শামিল হওয়ার কিছুদিন পরই ৪৪৭ হিজরীতে তাদের নেতা ইয়াহইয়া বিন ওমর লামতুনী রহ. এক যুদ্ধে শহীদ হলেন। ফলে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার সহোদর শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী রহ.।

শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনীও প্রবল উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্বে শরীক হলেন এবং দিনে দিনে মুরাবিতীদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। মুরাবিতীগণ প্রথমে নিজেদের অবস্থানস্থল সেনেগালের উত্তরাঞ্চলের চারপাশের বিস্তৃত এলাকায় পৌঁছতে শুরু করল এবং নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুরাবিতী রাষ্ট্রের সীমা উত্তর সেনেগাল থেকে দক্ষিণ মৌরিতানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এরপর গুদালা গোত্রও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। যেহেতু উত্তর সেনেগাল থেকে দক্ষিণ মৌরিতানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই সুবিশাল অঞ্চলে এ দু'টি গোত্রই বিদ্যমান ছিল, তাই উভয়ের একজোট হওয়ার অর্থ দাঁড়াল, পুরো অঞ্চলই এখন মুরাবিতী জামাতের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ইতিহাসের এ পর্যায়ে এসে সমাপ্তি ঘটল মুরাবিতী জামাতের মূল প্রতিষ্ঠাতা ও ইসলামী ইতিহাসের এক অমর নাম শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের সংগ্রামী জীবনের। ৪৫১ হিজরীতে (১০৫৯ খৃস্টাব্দে) ভ্রান্ত কোন এক ধর্মের অনুসারী গোত্র বনু বুরগুওয়াতার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে তিনি শহীদ হলেন। পরিসমাপ্তি ঘটল উম্মাহকে ঈমানী ও সংগ্রামী চেতনায় গড়ে তোলার এক মহান কারিগরের দীর্ঘ এগার বছরের সংগ্রাম-ইতিহাসের।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী (মৃত্যু: ৪৮০ হি./১০৮৭ ঈ.) এবং মুরাবিতী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব

শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের শাহাদাতের পর আবু বকর বিন ওমর লামতুনী মুরাবিতী জামাতের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। দ্বীনী জিম্মাদারী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব– দু'টিই এবার তার স্কন্ধে অর্পিত হল। কেননা, কেবল নেতৃত্বগুণই নয়, ইলমী অঙ্গনেও তিনি ছিলেন মুরাবিতী জামাতের শীর্ষস্থানীয়দের একজন। আবু বকর বিন ওমর লামতুনীর নেতৃত্ব লাভের দু' বছরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল, যা 'মুরাবিতী রাষ্ট্র' নামে খ্যাত। তৎকালে এর সীমানা ছিল বর্তমানের সেনেগালের উত্তরাংশ ও মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত, যা এখনও বিশ্বমানচিত্রে দৃষ্টিগোচর হয়।

মুরাবিতীদের নেতৃত্ব গ্রহণের দু' বছরের মাথায় ৪৫৩ হিজরীতে (১০৬১ খৃস্টাব্দে) শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী জানতে পারলেন যে, গুদালা ও লামতুনা গোত্রের মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ তৈরি হয়েছে এবং একে কেন্দ্র করে ফিতনা সৃষ্টির উপক্রম হয়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিকদের কারও কারও মত হল, বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল লামতুনা ও মাসুফা গোত্রের মধ্যে। এ কথা জানামাত্র শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী মুরাবিতীদের একটি অংশকে নিয়ে বিবাদমান দু' পক্ষের দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগী হলেন এবং নিজে মুরাবিতীদের নেতৃত্বের দায়িত্ব ত্যাগ করে তা তার চাচাতো ভাই ইউসুফ বিন তাশফীনকে সোপর্দ করলেন।

বিভেদের আগুন নেভানোর কাজ সমাপ্ত হতেই শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী তৎকালীন মাগরেবের দক্ষিণাঞ্চলের (বর্তমান সুদানের) জনসাধারণকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সেখানে গিয়ে এমন একটি পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের দেখা পেলেন, যারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে গাছ-পালা ও মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে।

Scanned with CamScanner

তাদের কাছে তখনও ইসলাম নামক অমীয় সুধার দাওয়াত পৌঁছেনি।

শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী তার সঙ্গে থাকা সাত হাজার মুসলমানকে নিয়ে এ অঞ্চলে দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করলেন। তিনি এতদঅঞ্চলের মানুষের কাছে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরলেন, তাদেরকে দ্বীনে ইসলামের সমুন্নত শিক্ষা প্রদান করলেন। পরম ধৈর্যের সঙ্গে শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন।

অনেক মানুষ তাদের দাওয়াতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে শামিল হল; আবার বিরুদ্ধাচরণও করল অনেকে। কেননা মূর্তিপূজার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের রুটি-রোজগারের সহজ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হল হক ও বাতিলের এক সুদীর্ঘ লড়াই।

শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী তার দাওয়াতী আন্দোলনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে লাগলেন এবং এক কওম থেকে অপর কওমের কাছে ঘুরে ঘুরে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতে লাগলেন। দক্ষিণ মৌরিতানিয়ায় গঠিত মুরাবিতী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ছেড়ে আসার পনের বছরের মাথায় ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী আবারও মুরাবিতী রাষ্ট্রে ফিরে এলেন। এই সুদীর্ঘ পনের বছর তিনি কাটিয়েছেন আল্লাহ তাআ'লার পথে এক সুমহান দায়িত্ব পালনে, আল্লাহর পথভোলা বান্দাদেরকে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বানে। যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, এমন লক্ষ মানুষকে তিনি দ্বীনের সন্ধান দিয়েছেন; আর যারা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন হতে নিবৃত্ত রাখতে চেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের যুদ্ধে নেমেছেন, যেন তারা দ্বীনের পথে ফিরে আসে কিংবা অন্তত দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী ছিলেন মুরাবিতী ইতিহাসের অন্যতম মহান নেতা, তাকওয়া-পরহেযগারী ও ধর্মীয় অনুশাসন পালনে উচ্চমার্গের ব্যক্তিত্ব, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত এক মহান সেনাপতি। তৎকালীন সুবিশাল মুসলিম রাষ্ট্র মাগরেবের বিনির্মাণ ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে একত্রিকরণে তার ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছুটে গেছেন উষর সাহারার গহীনে, সেনেগাল ও নাইজারের সীমান্তে। এতদঞ্চলের পৌত্তলিক জাতিগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বশীভূত করেছেন। আফ্রিকান নিগ্রো জাতিগোষ্ঠীর

Scanned with CamScanner

অসংখ্য মানুষ তার হাত ধরে ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে শামিল হয়েছে, নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র মুরাবিতী রাষ্ট্রের বিনির্মাণ, বিস্তৃতি ও সুদৃঢ়করণে অংশগ্রহণ করেছে এবং অবশেষে তারাই আপন মুসলিম ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দালুস-ভূমিতে ক্রুশেড-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মুরাবিতী সাম্রাজ্যে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সভ্যতা নির্মাণ করেছে।[২৬]

ইউসুফ বিন তাশফীন রহ. ও ইস্পাতকঠিন দায়িত্বভার

আল্লামা যাহাবী রহ. ইউসুফ বিন তাশফীন[২৭]-এর বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

> ইউসুফ বিন তাশফীন ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, আলিমদের সংস্পর্শপ্রিয়। তিনি ছিলেন বাদামী বর্ণবিশিষ্ট, ছিপছিপে গড়নের, পাতলা শ্মশ্রুমণ্ডিত, চিকন কণ্ঠের অধিকারী, সুদক্ষ অশ্বারোহী, দক্ষ নেতা, বিচক্ষণ ও বলিষ্ঠ সেনাপতি। তিনি জুমার খোতবায় (খলীফা হিসেবে) ইরাকের খলীফার নাম উল্লেখ করতেন।[২৮]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর রহ. তার পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন,

> তিনি ছিলেন সহনশীল, ক্ষমাশীল, উদার, দানশীল, ধার্মিক, মহানুভব। তিনি আহলে ইলম ও আহলে দ্বীন তথা আলিম-উলামা ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের ভালোবাসতেন এবং তাদেরকেই তার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করতেন। আলিম-উলামাদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। কেউ তাকে নসীহত করলে তিনি তা শ্রবণ করার সময় ভীত-প্রকম্পিত হয়ে পড়তেন এবং তার হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত, নসীহতের প্রভাব তার মাঝে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হত। তিনি বড় বড় ত্রুটি ও অপরাধকেও মার্জনা ও উপেক্ষা করা পছন্দ করতেন।[২৯]

শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী তার চাচাতো ভাই ইউসুফ বিন তাশফীনের হাতে যে মুরাবিতী সাম্রাজ্য ছেড়ে গিয়েছিলেন, তার পরিস্থিতি অবশ্য তখনও স্থিতিশীল হয়নি। তাই আবু বকর তার স্থলাভিষিক্ত শাসক

---

[২৬] সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুরাবিতীন*, পৃ : ৬৩।

[২৭] জন্ম ৪০০ হিজরী মোতাবেক ১০০৯ খৃস্টাব্দে; মৃত্যু ৫০০ হিজরী মোতাবেক ১১০৬ খৃস্টাব্দে।

[২৮] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/২৫৩।

[২৯] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৯/৯৯।

Scanned with CamScanner

ইউসুফকে মুরাবিতীদের বিরুদ্ধাচরণকারী সবচে' শক্তিশালী তিন প্রতিপক্ষ ইয়াফ্‌রান, যিনানা ও মুগ্‌রাওয়াত গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন।[৩০]

ইউসুফ বিন তাশফীন তার অধীনস্থ অঞ্চল উত্তর মৌরিতানিয়া ও দক্ষিণ মাগরেবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি এ অঞ্চলে বসবাসকারী বার্বার গোত্রীয় মানুষের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করলেন। নির্দিষ্ট করে বললে ৪৫৩ হিজরীতে (১০৬১ খৃস্টাব্দে) তিনি এ অঞ্চলের গোত্রগুলোর মাঝে বিস্ময়কর কিছু বিষয় দেখতে পেলেন। এসব গোত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

১. গুমারা গোত্র

গুমারা একটি বার্বার গোত্র। এ গোত্রে তৎকালীন সময় হতে এক শ' বছরেরও অধিক সময় পূর্বে হামীম বিন মান্নিল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি নবুওয়তের দাবি করেছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করেনি; বরং সে নিজেকে দ্বীনে ইসলামের অনুসারী দাবি করত। নবুওয়ত দাবি করার পর সে তার অনুসারীদের জন্য নতুন ধর্ম-নীতি প্রণয়ন করেছিল। তার অনুসারীরা ইসলাম মনে করে সেই নতুন ধর্মেরই অনুসরণ করত।[৩১]

হামীম বিন মান্নিল্লাহ তার অনুসারীদের জন্য দিনে-রাতে মাত্র দু' ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিল; এক ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের সময়, অন্য ওয়াক্ত সূর্যাস্তের সময়। সে তার অনুসারীদের জন্য বার্বার ভাষায় কোরআন রচনা করেছিল। তার প্রণীত বিধানগুলোর মধ্যে আরও ছিল ওযুর বিধান বাতিল, বীর্যপাতের পর পবিত্রতা অর্জনের অপরিহার্যতা বাতিল, হজ্বের ফরযিয়্যাত বাতিল, পাখির ডিম খাওয়া হারাম, মাদী শুকর খাওয়া বৈধ, যবেহ করা ব্যতিরেকে

---

[৩০] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৩৪, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, ৩/২৩২ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২।

[৩১] হামীম নামক এ ভণ্ডনবীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ৩১৩ হিজরীতে। তৎকালীন মুসলিম আন্দালুসের শাসক আবদুর রহমান আননাসির তাকে হত্যা করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলে ৩১৫ হিজরীতে উক্ত ব্যক্তি হামীমকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিকগণ অনেকেই লিখেছেন, তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন লিখেছেন, তার মৃত্যুর পর গুমারা গোত্রের আরও এক ব্যক্তি নবী দাবি করেছিল। ইবনে খালদূন অবশ্য তার নাম-ধাম ও ইতিহাস উল্লেখ করেননি। গুমারা গোত্র ইবনে খালদূনের আমলেও যাদু-চর্চা করত। ঐতিহাসিকগণ এই ভণ্ড নবী হামীমের ভণ্ডামীতে ভরা অনেক প্রথার কথাই উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

মাছ খাওয়া হারাম ইত্যাদি।[৩২] নিজেকে মুসলমান দাবি করে এ ধরনের গর্হিত আদেশ করা নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও চরম মূর্খতা। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, মানুষ তার এই বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা মেনে নিত আর বিশ্বাস করত এরই নাম 'ইসলাম'![৩৩]

২. বুরগুয়াতা গোত্র

এটি এ অঞ্চলের আরেকটি বার্বার গোত্র। এদের নেতা ছিল সালেহ বিন তারীফ বিন শামঊন নামক জনৈক ব্যক্তি।[৩৪] নাম সালেহ হলেও এই ব্যক্তিটির কার্যকলাপ কিন্তু মোটেই সালেহ বা সততাপূর্ণ ছিল না। সেও নিজেকে নবী দাবি করেছিল। তার অনুসারীদের জন্য সে যেসব বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছিল সেগুলো হল সকালে পাঁচ ওয়াক্ত ও সন্ধ্যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, ওযুর মধ্যে প্রচলিত অঙ্গগুলোর পাশাপাশি নাভি ও উভয় কটিদেশ ধৌত করা ফরয, আপন চাচাতো বোনকে বিয়ে করা হারাম, চারের অধিক বিয়ে করা বৈধ ইত্যাদি। আর এ সবকিছুর পরও সে নিজেকে একজন মুসলমান ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী বলে দাবি করত।[৩৫]

মুরাবিতীদের অভ্যুদয়ের সময় বুরগুয়াতা সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল সালেহ বিন তারীফের জনৈক পৌত্র আবু হাফ্স আবদুল্লাহ। শায়খ আবুদল্লাহ বিন ইয়াসিনের আমলেই মুরাবিতীগণ এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই চলাকালেই শায়খ শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্বে শায়খ মুরাবিতীদের অসিয়ত করে যান যে, তারা যেন এই কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখে পূর্ণতায় পৌঁছাতে সচেষ্ট হয় এবং এক্ষেত্রে ভীরুতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতার শিকার না হয়। শায়খের শাহাদাতের পর আবু বকর বিন

---

[৩২] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ৯৯।

[৩৩] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ৯৮-৯৯, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২১৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ১/১৪৮, ২৪৯।

[৩৪] এই সালেহ বিন তারীফের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল হিশাম বিন আবদুল মালিকের আমলে। সেও তার পিতার মতো নবী দাবি করেছিল। শামঊন তার পিতামহের নাম নয়; বরং উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, তার পিতা আন্দালুসের বারবাত দুর্গের একজন ইহুদি ছিল। সে শামঊন বিন ইয়াকুব আ.-এর বংশধর।

[৩৫] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৩২, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২০৭ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১৮।

Scanned with CamScanner

ওমর লামতুনী দায়িত্ব গ্রহণ করেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধারা পুনরায় চালু করেন এবং তাদেরকে চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য করেন।

৩. যিনাতা গোত্র

যিনাতা গোত্র ছিল এ অঞ্চলের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী গোত্রগুলোর একটি। কিন্তু তাদের মাঝে জুলুম-অত্যাচারের ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা তাদের আশেপাশের এলাকায় ছিনতাই-লুটপাট ও রাহাজানি চালাত। সবলরা দুর্বলদের ওপর নিপীড়ন করত। ঐতিহাসিক আননাসিরী তাদের অবস্থা সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

> মাগরেবে যিনাতা গোত্রের সর্দাররা তাদের অধীনস্থদের ওপর ইচ্ছেমতো স্বেচ্ছাচারিতা চালাত; কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী কেউ ছিল না। তারা আপন প্রবৃত্তি ও স্বার্থের চাহিদা অনুযায়ী প্রজাদের পরিচালিত করত।[৩৬]

যিনাতা কওমের সঙ্গে মুরাবিতীদের যুদ্ধও শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের জীবদ্দশায়ই শুরু হয়েছিল। শায়খের আমল এবং পরবর্তীতে ইয়াহইয়া বিন ওমর ও আবু বকর বিন ওমরের আমলেও এই যুদ্ধ-তৎপরতা অব্যাহত ছিল এবং মুরাবিতীগণ যিনাতা গোত্র অধ্যুষিত অনেক এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবু বকর বিন ওমর লামতুনী যিনাতা গোত্র ও এর শাখাগোত্রগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধারা আরও জোরদার করেন এবং শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের মৃত্যুর পর যিনাতা গোত্র অধ্যুষিত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইউসুফ বিন তাশফীনকে যিনাতা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-তৎপরতা অব্যাহত রেখে পূর্ণতায় পৌঁছানোর এবং একে স্থগিত না রাখার পরামর্শ দেন।

এই গোত্রের অনেক মানুষ পুরোপুরি দ্বীন ত্যাগের উপক্রম হয়েছিল। এ ছাড়াও মাগরেবের দক্ষিণ অংশের এ অঞ্চলে বসবাসকারী একটি গোত্র মেষ পূজা করত এবং মেষকে রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে বিশ্বাস করত। এটি সেই অঞ্চল, যা সুপ্রাচীনকালে পৃথিবী জুড়ে ইসলামের বিস্তারের একেবারে গোড়ার দিকে উকবা বিন নাফে' রাযি. এবং পরবর্তী সময়ে মুসা বিন নুসাইর জয় করেছিলেন।[৩৭]

---

[৩৬] আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/১২।

[৩৭] আলআব্বাদী, *দিরাসাতুন ফী তারীখিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস*, পৃ : ২৯১। (সূত্র: আলী সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুরাবিতীন*, পৃ : ৫৯)

Scanned with CamScanner

ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

এই ধর্মবিমুখ পরিস্থিতি ইউসুফ বিন তাশফীনকে অত্যন্ত ব্যথিত করল। তিনি তার বাহিনী নিয়ে উত্তরে রওয়ানা হলেন। মুরাবিতী বাহিনীর সদস্য-সংখ্যা ইতোমধ্যে চল্লিশ হাজারে পৌঁছেছে।[৩৮] এ অঞ্চলের প্রতিটি গোত্র এমনকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের অনুসারী যিনাতা গোত্রও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। অবশ্য কালের পরিক্রমায় এসব গোত্রের মানুষেরা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করল এবং মুসলিম সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হল।[৩৯]

দক্ষিণ সেনেগাল ও আফ্রিকার অরণ্যে ও প্রান্তরে দীর্ঘ পনের বছর দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করার পর শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী যখন ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) মুরাবিতী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনি দেখতে পেলেন, যে ইউসুফ বিন তাশফীনকে তিনি ৪৫৩ হিজরীতে (১০৬১ খৃস্টাব্দে) কেবল উত্তর সেনেগাল ও দক্ষিণ মৌরিতানিয়ার দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলেন, আজ মাত্র পনের বছরের পরিক্রমায় সেই ইউসুফ বিন তাশফীন পুরো সেনেগাল, পুরো মৌরিতানিয়াসহ মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার পুরো অঞ্চলের অধিকারী হয়েছেন; আজ ইউসুফ বিন তাশফীনের সৈন্যসংখ্যা পদাতিক সৈন্যের হিসাব বাদে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যের হিসেবেই এক লক্ষ! এই বিশালসংখ্যক মুসলিম সৈনিকের কাফেলা এক পতাকা বহন করছিল এবং একই পরিচয় তথা 'মুরাবিতী' নাম ও পরিচয় ধারণ করছিল।

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী আরও দেখতে পেলেন, মুরাবিতীদের এই রাষ্ট্রে এমন একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার ভিত্তি কেবলই তাকওয়ার ওপর; তিনি মুরাবিতী রাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে যে নগরীটির অস্তিত্বই পৃথিবীর বুকে ছিল না। নগরীটি হল ইউসুফ বিন তাশফীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মার্‌রাকিশ (Marrakesh) নগরী। এ নগরীর প্রথম স্থাপনা ছিল সেই ঐতিহাসিক মসজিদটি, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্মিত মসজিদে নববীর আদলে পুরোপুরি মাটি ও কাঁচা ইট (ইষ্টক) দ্বারা

---

[৩৮] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৩৮।

[৩৯] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, ৩/২৩৪ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২৩।

Scanned with CamScanner

তৈরি করা হয়েছে। রাসূলের আদর্শ অনুকরণে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের আমীর হয়েও নিজে সকলের সঙ্গে মাটি বহনের কাজ করে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন।[৪০]

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী তার সামনে এমন এক মহান নেতাকে দেখতে পেলেন, যিনি এতদঅঞ্চলে এমন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার অস্তিত্ব বিগত কালে ছিল না। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন, এই মহান নেতা দুনিয়াবিমুখ, সংযমী ও মিতব্যয়ী, খোদাভীরু, দ্বীনের আলিম ও আল্লাহর অনুগত। এ সবকিছু প্রত্যক্ষ করে আবু বকর বিন ওমর লামতুনী এমন একটি কাজ করলেন, যার দৃষ্টান্ত কেবল মুসলমানদের ইতিহাসেই পাওয়া সম্ভব।

তিনি ইউসুফ বিন তাশফীনকে বললেন, ভাই! আমার তুলনায় তুমিই শাসনকার্য পরিচালনার অধিকতর উপযুক্ত। তুমিই প্রকৃত শাসক। যদিও আমি তোমাকে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলাম; কিন্তু এখন তুমিই এই রাষ্ট্রের আমীর ও শাসক হওয়ার উপযুক্ত। তুমি এ অঞ্চলের মানুষকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে এবং রাষ্ট্রের শাসক হয়ে এর চেয়েও বৃহৎ অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম। আর আমি? আমি তো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করার স্বাদ পেয়ে গেছি। তাই আমি আবারও ফিরে যেতে চাই আফ্রিকার গহীন অরণ্যে, মানুষকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করতে।

আবু বকর বিন ওমর লামতুনী এক মহান দাঈ ও সুমহান সেনাপতি

ইসলামের দাওয়াতী মেহনতের উদ্দেশ্যে আবু বকর বিন ওমর লামতুনী আবারও চলে গেলেন আফ্রিকার গহীন অরণ্যে। এবার তিনি ইসলামের পতাকাতলে শামিল করলেন গিনি বিসাউ, দক্ষিণ সেনেগাল, সিয়েরালিওন, আইভরিকোস্ট, মালি, বুর্কিনা ফাসো, নাইজার, ঘানা, বেনিন, টোগো, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, জেবুন ইত্যাদি আফ্রিকান রাষ্ট্রকে। নাইজেরিয়ায় এটি ছিল ইসলামের দ্বিতীয় পদার্পণ; কয়েক শতাব্দী পূর্বেও নাইজেরিয়ায় একবার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছিল।

---

[৪০] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৩৮-১৩৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/২৫-২৭।

Scanned with CamScanner

এভাবে এই মহান বীর যোদ্ধা আবু বকর বিন ওমর লামতুনীর হাত ধরে আফ্রিকার পনেরটির অধিক রাষ্ট্র ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়েছিল। ইবনে কাসীর রহ.-এর ভাষ্যমতে, আবু বকর বিন ওমর লামতুনী যখন আল্লাহর পথে লড়াইয়ের আহ্বান জানাতেন, তখন পাঁচ লক্ষ জানবাজ সৈনিক লাব্বাইক বলে সাড়া দিত। এ তো কেবল সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কথা, এর বাইরে রয়ে গেছে কত নারী, শিশু ও এতদঅঞ্চলের অসংখ্য জনগণ, যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা এই মহান দাঈর হাতে হেদায়েত দান করেছেন।

যখনই আজকের নাইজার, মালি, নাইজেরিয়া বা ঘানার কোন মুসলমান নামায পড়েন, কিংবা যখনই তারা কেউ কোন নেক আমল করেন, নিশ্চিতভাবেই শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী রহ. ও তার সঙ্গী কাফেলার নেক আমলের দফতরে সেসব আমলের হিস্যা জমা হতে থাকে।

হাফিয ইবনে কাসীর রহ. *'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> আবু বকর বিন ওমর লামতুনী ছিলেন মুলাছ্ছামীন শাসক। ফারগানা অঞ্চলের এই মহান ব্যক্তির সঙ্গে এত বেশি নেক-মুত্তাকী লোকের সম্মিলন ঘটেছিল, যা অন্য কোন শাসকের ক্ষেত্রে হয়নি। তিনি যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা হতেন, পাঁচ লক্ষ সৈনিক তার সঙ্গে শরীক হত। প্রত্যেকেই তার আনুগত্যে আস্থা রাখত। তিনি হুদুদে ইসলাম কায়েম করতেন, মাহারিমে ইসলামের সংরক্ষণ করতেন, দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তিনি আপন আকীদা ও দ্বীনের শুদ্ধতা বজায় রাখার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতেন এবং আব্বাসী খেলাফতের প্রতি মিত্রতা পোষণ করতেন। রণাঙ্গনে কণ্ঠনালীতে তীরবিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৪১]

এভাবে আল্লাহর রাস্তায় এক অনন্য সংগ্রামী জীবন সমাপ্ত করে ৪৮০ হিজরীতে (১০৮৭ খৃস্টাব্দে) এক যুদ্ধাভিযানে শায়খ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী শহীদ হন। পরিসমাপ্তি ঘটে ইসলামী ইতিহাসের দাওয়াত ও সামরিক অঙ্গনের উজ্জ্বলতম এই তারকার জীবনসফরের।

---

[৪১] ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/১৬৫।

Scanned with CamScanner

আমীরুল মুসলিমীন নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুরাবিতী রাষ্ট্র

আমরা মুরাবিতী ইতিহাসের আলোচনা শুরু করেছিলাম ৪৪০ হিজরী (১০৪৮ খৃস্টাব্দ) থেকে। যে ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল একজন মাত্র ব্যক্তি শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের হাত ধরে। আর এখন মাত্র আটত্রিশ বছর পরে ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) মুরাবিতী নেতা ইউসুফ বিন তাশফীন এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। নিজের জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন 'আমীরুল মুসলিমীন' ও 'নাসিরুদ্দীন' পরিচয়। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি কেন ধারণ করলেন না? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

> আল্লাহ মাফ করুন, আমি এ উপাধি কিছুতেই ধারণ করব না। এ উপাধি তো ধারণ করবেন আব্বাসী খলীফাগণ। তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিচয়ের অধিকারী। তারা মক্কা ও মদীনা উভয় হারামের খলীফা। আমি তো তাদের একজন কর্মচারী, তাদের প্রচারকমাত্র।[৪২]

অথচ পাঠক জেনে অবাক হবেন, তখন আব্বাসী খেলাফত শক্তি ও আয়তন উভয় দিক থেকেই ছিল মুরাবিতী সাম্রাজ্যের তুলনায় দুর্বল ও ক্ষুদ্র। আব্বাসীদের শাসন তখন কেবল বাগদাদে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীন ছিলেন 'ওয়াহদাতুল উম্মাহ' ও জাতীয় ঐক্যের চেতনা লালনকারী বিনয়ী এক মহান শাসক। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন, মুসলমানরা যেন এক পতাকাতলে সমবেত হয়। তিনি খেলাফতের শাসনছড়িকে ভাঙতে কিংবা আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাননি। আপন সামরিক শক্তিকে আব্বাসী খলীফার শক্তির সঙ্গে যুক্ত করা এবং নিজে এ অঞ্চলে আব্বাসী খেলাফতের একজন গভর্নর হয়ে থাকা তার তামান্না ছিল। আর তাই তিনি উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন এই ঐক্যের বাণী ও আশাবাদের ধ্বনি, 'আমি তো এখানে তাদের এক কর্মচারী মাত্র'। বস্তুত এটাই হল সঠিক প্রজ্ঞা, এটাই ইসলামের সার্বজনীন চিন্তা।

---

৪২ লেখক অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়াহ*, পৃ : ২৯। অবশ্য ইবনে আবি যারা' ও লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবসহ অন্য অনেকের ভাষ্যমতে ইউসুফ বিন তাশফীন রহ. আরও পরে ৪৭৯ হিজরীতে যাল্লাকার প্রান্তরে যুদ্ধজয়ের পর 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মুরাবিতী রাষ্ট্রের কাছে আন্দালুসের সাহায্যপ্রার্থনা

৪৭৮ হিজরী মোতাবেক ১০৮৫ খৃস্টাব্দে টলেডোর পতন হয়। এরপর আর কোনদিন টলেডো মুসলিম শাসনভুক্ত হয়নি। টলেডোর পতনের পর সেভিল অবরোধ করা হয়। অথচ সেভিল ছিল আন্দালুসের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত এবং উত্তরের খৃস্টান আন্দালুস থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। ফলে সেভিল-শাসক মু'তামিদ আ'লাল্লাহ-ও সেই পরিণতি বরণের মুখোমুখি হন, যা বরণ করেছিল বারবাস্ট্রো বা ভ্যালেন্সিয়া নগরী। কিন্তু তার পরম সৌভাগ্য, আল্লাহ তাআ'লা তার মস্তিষ্কে মুরাবিতীদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার চিন্তা দান করেন।

প্রকৃতপক্ষে মুরাবিতীদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনার চিন্তাটি ছিল একটি জাতীয় চিন্তা, যা সর্বপ্রথম মুসলিম আন্দালুসের ওলামা-মাশায়েখের চিন্তা-জগতে আলোড়ন তুলেছিল। সাধারণ জনগণ তাদের এই চিন্তাধারাকে সাদরে গ্রহণ ও সমর্থন করেন। এরপর তা গণদাবি ও জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয় এবং শাসকদের দরবারে পৌছয়।

এটিও একেবারে সুস্পষ্ট যে, এ দাবির সূচনা টলেডো পতনের বেশ কয়েক বছর পূর্বেই হয়েছিল। বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গ তখন যদি জনগণের চেতনা উপলব্ধি করতে পারতেন, নিশ্চিত করেই বলা যায়, তারা টলেডোর পতন ঠেকাতে সক্ষম হতেন এবং তাদের ভাগ্যে টলেডো-পতনের পূর্বের ও পরের এই লাঞ্ছনার ইতিহাস লেখা হত না।

আল্লামা নুওয়াইরী লিখেছেন,

> কর্ডোভার প্রবীণ ওলামায়ে কেরাম বিদ্যমান দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ফকীহদের সমবেত করে বললেন, আজ আন্দালুসের মুসলিম নগরীগুলো একে একে খৃস্টানদের দখলে চলে যাচ্ছে। অল্প কিছু

Scanned with CamScanner

নগরীই বাকি আছে, যেখানে তারা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পরিস্থিতি যদি এভাবেই এগোতে থাকে, তাহলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন পুনরায় আন্দালুস খৃস্টান রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এরপর মাশায়েখে কেরাম কাযী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আদহামের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, আন্দালুসের মুসলমানগণ আজ যে হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার, তা আপনি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করছেন। যে মুসলমানগণ একদিন খৃস্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করত, তারাই এখন খৃস্টানদের জিযিয়া প্রদান করছে। ইবনে আব্বাদ নিজেই খৃস্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছেন। ফলে যা ঘটার, তা-ই ঘটছে; খৃস্টানরা যা ইচ্ছা, দাবি করছে। আমরা একটি পরিকল্পনা করেছি, তা আপনার সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। কাযী আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, কী সেই পরিকল্পনা? মাশায়েখে কেরাম বললেন, আমরা আফ্রিকার আরবদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে জানাব যে, তারা যদি আমাদের দেশে আগমন করে, আমরা আমাদের সম্পদ তাদেরকে বণ্টন করে দেব এবং তাদের সঙ্গে মিলে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব। তখন কাযী আবদুল্লাহ বললেন, আমার আশঙ্কা হয়, তারা আফ্রিকায় যেমন করেছে, তেমনই আন্দালুসও ধ্বংস করে ফেলবে এবং খৃস্টানদের রেখে যাবে আপনাদের শেষ করতে। এর তুলনায় মুরাবিতীগণ আমাদের তুলনামূলক বেশি নিকটে এবং তাদের অবস্থাও তুলনামূলক সুসংগঠিত। তখন মাশায়েখে কেরাম বললেন, তাহলে আপনি (মুরাবিতী আমীর) ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ জানান, যেন তিনি নিজে আমাদের এখানে আসেন কিংবা তার কোন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। কাযী আবদুল্লাহ বললেন, এখন আপনারা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

এর অব্যবহিত পরেই মু'তামিদ কর্ডোভায় আগমন করলে কাযী আবদুল্লাহ তার দরবারে উপস্থিত হয়ে কর্ডোভাবাসীর সঙ্গে তার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিষয়টি অবগত করলেন। সবকিছু শুনে মু'তামিদ বললেন, তারা বেশ ভালো পরামর্শ দিয়েছে। আপনি-ই আমার পক্ষ থেকে দূত হিসেবে ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে যাবেন। কাযী সাহেব প্রথমে নিজে যেতে অসম্মতি জানালেন এবং

Scanned with CamScanner

অব্যাহতি চাইলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, মু'তামিদের তাকে দূত হিসেবে প্রেরণের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করা। তখন মু'তামিদ বললেন, আমি তো এ দায়িত্ব পালনের জন্য আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখছি না।

এরপর কাযী আবদুল্লাহ তার সঙ্গে কাতিব আবু বকর বিন কাসীরাকে নিয়ে আমীরুল মুসলিমীনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তারা তাকে সিউটায় পেলেন এবং তার কাছে কর্ডোভাবাসীর বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা ও আযফুনাশের প্রতি তাদের ভয় ও আশঙ্কার কথা অবগত করলেন। তারা যে প্রথমে আল্লাহর এবং তারপর আমীরুল মুসলিমীনের সাহায্য প্রার্থনা করছেন এবং মু'তামিদও যে তার সাহায্য কামনা করেছেন, তাও তাকে অবহিত করলেন।[৪৩]

বরং আমরা এ দাবিও করতে পারি যে, কাযী আবদুল্লাহ ও কাতিব আবু বকরের সিউটায় গমনের পূর্বেই মাশায়েখ ও ফুকাহায়ে কেরামের এই প্রচেষ্টার সংবাদ ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে পৌঁছেছিল। ৪৭৪ হিজরীতে আন্দালুসের একটি প্রতিনিধিদল ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে প্রতিবেশী খৃস্টান রাষ্ট্র কর্তৃক মুসলিম আন্দালুসে সৃষ্ট দুর্দশার অভিযোগ করে। ইউসুফ বিন তাশফীন তখন তাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্দালুসে ফেরত পাঠান।[৪৪]

এছাড়াও আন্দালুসবাসীর পক্ষ থেকে বহু চিঠি-পত্র ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে প্রেরিত হতে থাকে এবং নিজেদের দুর্দশার কথা জানিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এর দু' বছর পর আলমারিয়া থেকে আবদুর রহমান বিন আসবাত ইউসুফ বিন তাশফীনের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আন্দালুসের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।[৪৫]

ইতঃপূর্বে যারা তার কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বাতালইয়ুস-শাসক মুতাওয়াককিল বিন আফতাসও ছিলেন। খৃস্টানশক্তি যখন তার রাষ্ট্রে হামলা চালিয়েছিল, তখন তিনি ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে সাহায্যের

---

[৪৩] নুওয়াইরী, *নিহায়াতুল আরিব*, ২৩/২৬৬-২৬৭, ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৫-৪৪৬।

[৪৪] লেখক অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৩৩।

[৪৫] ইবনুল খতীব, *আলইহাতা*, ৪/৩৫০।

Scanned with CamScanner

ফরিয়াদ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তার পত্র পাওয়ার পর ফিরতি পত্রে আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন তাকে নিরাপত্তা দান ও শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৪৬]

অবশ্য আন্দালুসে সহায়তা প্রদানের জন্য অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ইউসুফ বিন তাশফীনের সামনে মৌলিক দু'টি বাধা ছিল। একটি হল, তিনি তখনও সিউটা নৌবন্দরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আর আমরা পূর্বে অনেকবারই উল্লেখ করেছি যে, আন্দালুসে প্রবেশের ক্ষেত্রে সিউটা নৌবন্দরের ভূমিকা মূল প্রবেশদ্বারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তখনও সিউটা বন্দরের নিয়ন্ত্রণ ছিল বারগুয়াতী জাতির নেতা সাককুত বারগুয়াতীর হাতে। দ্বিতীয় বাধা হল, গ্রানাডা বা সেভিলে অবতরণ করা ছাড়া তার পক্ষে আন্দালুস-ভূমিতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। কেননা, এ দু'টি রাষ্ট্রই মাগরেবের নিকটে অবস্থিত। তাই মুসলিম আন্দালুসে নিরাপদে অবতরণ করতে চাইলে এবং সেভিল বা গ্রানাডার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী বিবেচিত না হতে চাইলে ইউসুফ বিন তাশফীনের জন্য মু'তামিদ বিন আব্বাদের বার্তার অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অবশ্য আন্দালুসবাসীর সাহায্যের আবেদন পাওয়ার পরই ইউসুফ বিন তাশফীন সিউটা দখলে উদ্যোগী হন এবং অবশেষে তা জয়ও করেন। এরপর তিনি জনবল ও অস্ত্রবল বৃদ্ধির প্রস্তুতি শুরু করে সেভিল-শাসক ইবনে আব্বাদের দূত আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন।

নিঃসন্দেহে মু'তামিদ ইবনে আব্বাদও এ সবকিছু জানতেন ও বুঝতেন। তাই তো তিনি যখন ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন, তখন তার ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হচ্ছিল যে, তিনি জনসাধারণ ও মুতাওয়াককিল বিন আফতাসের সঙ্গে ইউসুফ বিন তাশফীনের কৃত পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি লিখেছিলেন, 'ইসলামের সাহায্যের লক্ষ্যে সাগর পাড়ি দিয়ে স্বেচ্ছাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ওয়াদা পূরণের প্রত্যাশায়'।[৪৭]

মু'তামিদ যখন আলফোন্সোর পত্রের উত্তরে তাকে মুরাবিতী সৈন্যদের আগমনের হুমকি প্রদান করেন এবং ইউসুফ বিন তাশফীনকে আন্দালুসে

---

[৪৬] লেখক অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৩৩।

[৪৭] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/১৮৬।

Scanned with CamScanner

আগমনের অনুরোধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন এ সংবাদ পুরো আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তাদের মাঝে নতুন করে আশার ঢেউ বইতে শুরু করে। অপরদিকে বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গ যখন ইবনে আব্বাদের সংকল্প সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, ইবনে আব্বাদ এককভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেউ পত্রের মাধ্যমে, কেউ স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তার এই সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেন। তারা তাকে বলেন, রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা মানুষকে মায়াহীন করে দেয় আর এক খাপে দুই তরবারি একত্র হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে মু'তামিদ তার সেই প্রবাদতুল্য উক্তিটি করেছিলেন, 'শুকরের রাখালগিরি করার চেয়ে উট চড়ানো শতগুণে শ্রেয়'। এর অর্থ হল মুরাবিতী শাসক ইউসুফ বিন তাশফীনের হাতে বন্দী হয়ে আফ্রিকার মরুভূমিতে উট চড়ানো আযফুনাশের (আলফোন্সো) হাতে নিগৃহীত ও বন্দী হয়ে ক্যাস্টোলায় শুকর চড়ানোর চেয়ে শতগুণে উত্তম। নিন্দুক ও ভর্ৎসনাকারীদের উদ্দেশ্য করে মু'তামিদ আরও বলেছিলেন, দেখুন! আমার সামনে দু'টি পরিস্থিতি বিদ্যমান; একটি সুনিশ্চিত, অপরটি সংশয়ে ঘেরা; আর একটি বেছে নেওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। সংশয়ে ঘেরা দিকটি হল– যদি আমি ইউসুফ বিন তাশফীন বা আযফুনাশ- দু' জনের কোন একজনের ওপর আস্থা রাখি, তাহলে হয়তো তিনি আমার আস্থা রক্ষা করবেন; আবার হতে পারে, বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। এটি হল সংশয়ে ঘেরা দিক। আর সুনিশ্চিত দিকটি হল– আমি যদি ইউসুফ বিন তাশফীনের প্রতি আস্থা রাখি, তাহলে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করব আর যদি আযফুনাশের প্রতি আস্থা রাখি, তাহলে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করব। সংশয়ে ঘেরা দিকটি যখন অস্থায়ী, সুতরাং আমি কিসের আশায় এবং কোন মরীচিকার সন্ধানে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে ত্যাগ করে তার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিকে টেনে আনব? মু'তামিদের এ কথা শোনার পর সকলে তাকে নিন্দা করা থেকে নিবৃত্ত হয়।[৪৮]

শাসকবর্গের মধ্যে বাতালইয়ুস-শাসক মুতাওয়াককিল বিন আফতাস ও গ্রানাডা-শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন ইবনে আব্বাদের সঙ্গে ঐকমত্য

---

[৪৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৫৯।

Scanned with CamScanner

পোষণ করেন। ফলে বড় তিন ইসলামী শক্তি গ্রানাডা, সেভিল ও বাতালইয়ুস মুরাবিতীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় একতাবদ্ধ হয়।

একমত হওয়ার পরপরই তিন শাসক এই তিন নগরীর কাযীদের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি আবু বকর বিন আদহাম, গ্রানাডার বিচারপতি আবু জাফর কালীয়ী ও বাতালইয়ুসের বিচারপতি আবু ইসহাক বিন মুকানা। এরপর মু'তামিদ এদের সঙ্গে প্রতিনিধিদলে তার উযীর আবু বকর বিন যাইদুনকে যোগ করেন। তিনি কাযীদেরকে তাদের উপযুক্ত কাজ অর্থাৎ ইউসুফ বিন তাশফীনকে নসীহত করার দায়িত্ব প্রদান করেন আর উযীর আবু বকর বিন যাইদুনকে দেন তার উপযুক্ত কাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব। এভাবে মাত্র চারজনের মাধ্যমেই এই প্রতিনিধিদল গঠিত হয়।[৪৯]

সরকারী এই প্রচেষ্টা ছাড়াও ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে আন্দালুসসীমান্ত থেকে একের পর এক প্রতিনিধিদলের আগমন অব্যাহত ছিল। প্রতিনিধিদলগুলো কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে আল্লাহ ও ইসলামের শপথ দিয়ে তার সহায়তা কামনা করত এবং মুরাবিতী রাষ্ট্রের আলিমসমাজ ও উযীরদের মাধ্যমে তার কাছে সুপারিশ করাত। আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতেন। মুসলিম ভাইদের দুর্দশার কথা শুনে তার হৃদয় সিক্ত হয়ে উঠত।[৫০]

৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) ইউসুফ বিন তাশফীন সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হতে আগত প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। তারা তার কাছে খৃস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য কামনা করে।[৫১] এরপর তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে নৌযানে করে আন্দালুসের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তিনি যখন জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিচ্ছিলেন, মাঝ-সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের তোড়ে জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। আদর্শ শাসক ও মহান নেতা ইউসুফ বিন তাশফীন এ সময় লুটিয়ে পড়েন আল্লাহর দরবারে। আত্মবিনয়ী হয়ে আসমানপানে দু' হাত তুলে তিনি দোয়া করেন,

---

[৪৯] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৮৮, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৫৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৩৯।

[৫০] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৮৯।

[৫১] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৬।

Scanned with CamScanner

> হে আল্লাহ! আমার এই সমুদ্র অতিক্রমণে যদি আপনি মুসলমানদের কল্যাণ ও উপকার রেখে থাকেন, তাহলে এই সমুদ্র-সফর আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আর যদি এতে কল্যাণ না থাকে, তাহলে এ সফর কঠিন করে তুলুন, যেন আমরা সমুদ্র পাড়ি দিতে না পারি।

সঙ্গে সঙ্গে বাতাস শান্ত হয়ে যায় এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্রও শান্ত হয়; তিনি ও তার সঙ্গীগণ নিরাপদে সাগর পাড়ি দেন।[৫২] এদিকে আন্দালুসসীমান্তে মুসলিম অভিযাত্রীদের স্বাগত জানাতে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। আন্দালুসে পা রাখামাত্রই ইউসুফ বিন তাশফীন আল্লাহর অনুগ্রহে নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ায় এবং আল্লাহর পথের একজন সৈনিক হিসেবে কবুল হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর আদায় করেন।[৫৩]

ইউসুফ বিন তাশফীন ... বর্তমানে বিলুপ্ত এক আদর্শের নাম

আন্দালুস-ভূমিতে অবতরণ করার পর ইউসুফ বিন তাশফীন প্রথমে সেভিলে গমন করেন। এ সময় মুসলিম আন্দালুসের জনগণ দলে দলে ওপারের মুসলিম বাহিনীকে স্বাগত জানাতে থাকে। এরপর আমীরুল মুসলিমীন তার বাহিনীকে নিয়ে বাতালইয়ুস অভিমুখে রওয়ানা হন। কারণ, ষষ্ঠ আলফোন্সো মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য যে যাল্লাকা প্রান্তরে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল বাতালইয়ুসের নিকটে।[৫৪]

ইউসুফ বিন তাশফীন সেভিলে মু'তামিদ বিন আব্বাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। মু'তামিদও তার সৈন্যদের সমবেত করেছিলেন। কর্ডোভা থেকেও প্রচুর সৈন্য উপস্থিত হয়েছিল। এছাড়া আন্দালুসের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছাসেবী অনেকে এই মোবারক কাফেলায় যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিল। আলফোন্সোর কাছে যখন এসব সংবাদ পৌঁছয়, তখন তিনিও তার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে টলেডো থেকে রওয়ানা হয়ে যান।[৫৫]

---

[৫২] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৫, আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৩৪।

[৫৩] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩২০।

[৫৪] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৭, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/১০০, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/১১৬, *তারিখে ইবনে খালদূন*, ৬/১৮৬, হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৯২, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৪, আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৪৩ ও ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৬।

[৫৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬১।

Scanned with CamScanner

কর্ডোভা, সেভিল ও বাতালইয়ুস থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাগণ ইউসুফ বিন তাশফীনের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর মুসলিম বাহিনী যখন মুসলিম আন্দালুসের উত্তরে যাল্লাকা প্রান্তরে পৌছয়, তখন তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজারে।

প্রকৃতপক্ষে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এটিই হল মুসলমানদের মাঝে আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য এবং তার কার্যকারিতার গুরুত্ব। নিঃসন্দেহে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সকল মুসলমানের মাঝে দ্বীনী চেতনা-বোধ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সুপ্ত আছে; লুকিয়ে আছে অগ্নিশিখা। প্রয়োজন কেবল এমন কারও, যিনি সুপ্ত আবেগ-অনুভূতি ও দ্বীনী গাইরতকে অচেতন ও অবসন্ন অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলবেন; ফুৎকার দিয়ে প্রজ্বলিত করবেন ছাইচাপা আগুন।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
যাল্লাকার যুদ্ধ (Battle of Zallaqa)

ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্য রওয়ানা হয় যাল্লাকার উদ্দেশে। এই যাল্লাকা প্রান্তরেই সংঘটিত হয় ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহাসিক যুদ্ধ।

ইউসুফ বিন তাশফীনের আগমনের কারণে খৃস্টানরাও সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছিল। কোন কোন অনুমান অনুযায়ী খৃস্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন লক্ষেরও অধিক।[৫৬] ফ্রান্স, ইটালিসহ বিভিন্ন খৃস্টান রাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দিয়ে আলফোন্সোকে সহায়তা করেছিল। আলফোন্সো ক্রুশ ও ঈসা মাসীহের প্রতিকৃতি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আমি জ্বীন-মানুষ এমনকি আসমানের ফিরেশতাদের বিরুদ্ধেও লড়তে পারব। তিনি পুরোপুরিই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এটি ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের ধর্মযুদ্ধ, হিলাল-ছালিবের লড়াই।[৫৭]

পত্র-বিনিময় এবং যুদ্ধের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

আলফোন্সো এর পূর্বেই ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রের ভাষা ছিল আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। পত্রে আলফোন্সো লিখেছিলেন,

---

[৫৬] ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থগুলোর অধিকাংশতে যদিও খৃস্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু তাদের সংখ্যা যে বিশাল ছিল, বর্ণনাভঙ্গিতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে যারা তাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তাদের কারও কারও মতে খৃস্টান বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্য ছিল আশি হাজার এবং পদাতিক সৈন্য ছিল দু' লক্ষ। আবার কারও কারও মতে, তাদের বাহিনীতে বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যাই ছিল আশি হাজার। *'আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া'* গ্রন্থের লেখক এ বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন, যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর তিন লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছিল। আবার কারও কারও মতে খৃস্টান বাহিনীর অশ্বারোহী ও বর্মধারী সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। মতান্তরে অশ্বারোহী ও বর্মধারী সৈন্যসংখ্যা ছিল কমপক্ষে চল্লিশ হাজার এবং এদের প্রত্যেকের অধীনে প্রচুর সৈন্য ছিল।

[৫৭] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৮৯, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৪২।

Scanned with CamScanner

আসমান-যমীনের স্রষ্টা হে প্রভু! আপনার নামে শুরু করছি। প্রভু শান্তি বর্ষণ করুন তার রূহ ও কালিমা সাইয়েদ মাসীহের প্রতি। পরকথা, পরিপক্ক ও সুদৃঢ় বুদ্ধি ও চিন্তার অধিকারী কারোরই অজানা নয় যে, আমি যেমন খৃস্টধর্মের নেতা, আপনিও তেমনই ইসলাম ধর্মের আমীর। আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, মুসলিম আন্দালুসের নেতৃবৃন্দের ওপর বর্তমানে কীরূপ দুর্বল ও পরাজিত মনোভাব, পরনির্ভরতা, প্রজাদের প্রতি অবহেলা, আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি চেপে বসেছে। আমি দমন-নীতি ও দেশান্তরের মাধ্যমে মুসলমানদের অপদস্থ করছি, তাদের সন্তান-সন্ততিকে দাস-দাসী বানাচ্ছি, পুরুষদের অঙ্গ-ছেদন করছি। আপনার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কোন অজুহাত থাকতে পারে না।

আপনাদের ধারণা হল, আল্লাহ তাআ'লা আমাদের প্রতি-দশজনের বিরুদ্ধে আপনাদের একজনের উপর যুদ্ধ অবধারিত করেছেন। কিন্তু আপনাদের দুর্বলতা দেখে আল্লাহ আপনাদের বোঝা আরও হালকা করেছেন। এখন আমাদের একজন আপনাদের দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। আপনারা না পারবেন আত্মরক্ষা করতে, না পারবেন প্রতিরোধ গড়তে। আপনার সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়েছে যে, আপনি সৈন্য সমবেত করেছেন এবং রণাঙ্গনের তত্ত্বাবধান করছেন। কিন্তু আপনি তো বছরের পর বছর টালবাহানা করেই যাচ্ছেন, এক পা অগ্রসর হলে দু' পা পিছিয়ে যাচ্ছেন। বুঝতে পারছি না, ভীরুতা ও কাপুরুষতা আপনার গতি মন্থর করে দিয়েছে, নাকি আপনার প্রভুর ওয়াদার প্রতি আপনার আস্থা নেই?

আমি আরও শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এমন কোন কারণে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারছেন না, যা সঙ্গে নিয়ে আপনার ঝাঁপ দেওয়া সঙ্গত নয়। এখন শুনুন, আপনার জন্য যা সহজ ও আরামদায়ক, তাই বলছি। আমি-ই আপনার পক্ষ হয়ে আপনার কৈফিয়ত পেশ করার সুযোগ করে দিচ্ছি। শর্ত এই যে, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করবেন, ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ধরবেন এবং আপনার দাসদের দিয়ে আমার জন্য কিছু নৌযান পাঠাবেন, আমি আমার লোকবল নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপনার দেশে আসব এবং আপনার

Scanned with CamScanner

> সবচে' পছন্দসই স্থানে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব। যুদ্ধে যদি আপনি জয়লাভ করেন, তাহলে অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আপনি লাভ করবেন, আর যদি আমি জয়লাভ করি, আপনার ওপর আমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমি উভয় ধর্মের নেতা ও উভয় ভূখণ্ডের শাসকরূপে গৃহীত হব। মহান প্রভুই সৌভাগ্য দান করে থাকেন এবং সংকল্প পূরণ সহজ করে দেন। তিনি ছাড়া সাহায্যকারী কেউ নেই এবং তার প্রদত্ত কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই।[৫৮]

মুরাবিতী সৈন্যদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পৌছা শেষ হলে ইউসুফ বিন তাশফীন এর জবাবে ষষ্ঠ আলফোন্সোর কাছে নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন।

> আযফুনাশ! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছ এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের কাছে পৌছার জন্য কিছু নৌযান চেয়েছ। এখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমরাই তোমার কাছে চলে এসেছি। আল্লাহ তাআ'লা এই ময়দানে তোমার সঙ্গে আমাদের সমবেত করতে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তুমি তোমার প্রার্থনার পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে। আর কাফিরদের প্রার্থনার পরিণতি তো কেবল ভ্রষ্টতা ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়।

পাশাপাশি পত্রে ইউসুফ বিন তাশফীন তাকে ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান বা যুদ্ধ– তিনটির কোন একটি বেছে নিতে বলেন।[৫৯]

পত্র পেয়ে পাঠ করামাত্র আলফোন্সো ক্রোধে ফেটে পড়েন। তার গোস্বা ও ক্ষোভের সাগর ফুঁসে ওঠে, কুফরী ও অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, কী! সে আমাকে এভাবে সম্বোধন করেছে; অথচ আমি ও আমার পিতা দীর্ঘ আশি বছর ধরে তার স্বধর্মীয়দের জিযিয়া দিতে বাধ্য করে

---

[৫৮] ঐতিহাসিকগণের কারও কারও মতে এটি ষষ্ঠ আলফোন্সোর প্রেরিত পত্রের ভাষ্য নয়; বরং আরও প্রায় একশত বছর পরে আমীর ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত অষ্টম আলফোন্সোর পাঠানো পত্রের ভাষ্য। কিন্তু সঠিক মত হল এটি ষষ্ঠ আলফোন্সো কর্তৃক আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে প্রেরিত পত্রেরই ভাষ্য। দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ১০/২৩৭, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/৬-৭, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৫/১৯৮।

[৫৯] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৬, হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯০, লেখক অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৫৩, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৩, আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৪২।

Scanned with CamScanner

আসছি। এরপর আলফোন্সো হুমকির ভাষাসম্বলিত আরেকটি পত্র পাঠান এবং তাতে লেখেন, 'আচ্ছা, আমি যুদ্ধই বেছে নিলাম। এখন তোমার উত্তর ও প্রতিক্রিয়া কী?' পত্র পাওয়ামাত্র আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন তা উল্টিয়ে অপর পিঠে লেখেন, 'আমার উত্তর তো কানে শোনার নয়; স্বচক্ষেই তুমি তা দেখতে পাবে'। ইউসুফ বিন তাশফীনের উত্তর পাওয়ামাত্র আলফোন্সো ভয় পেয়ে যান এবং বুঝে ফেলেন, তিনি এমন এক ব্যক্তির মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন, আর যাই হোক, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে যার ওপর তার কর্তৃত্ব চলবে না।[৬০]

হিময়ারী রহ. আররাওযুল মি'তার গ্রন্থে লিখেছেন,

> ষষ্ঠ আলফোন্সো যখন ইউসুফ বিন তাশফীনের সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি আপন রাষ্ট্র, আশেপাশের ও দূর-দূরান্তের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর অধিবাসীদের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা ছড়িয়ে দিলেন। পাদ্রী, বিশপ ও সন্ন্যাসীগণ ক্রুশ উত্তোলন করে ও ইঞ্জিলের বাণী পাঠ করে মানুষকে যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। গ্যালিসিয়া, ফিরিঙ্গী ও আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের অসংখ্য সৈন্য খৃস্টান বাহিনীতে যোগ দিতে সমবেত হল। ইবনে আব্বাদের প্রতি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে তাকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি আলফোন্সো মুসলিম বাহিনীর খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। উভয় দলের গুপ্তচরেরা সবার সঙ্গে মিশে গোপনে সংবাদ সংগ্রহে সচেষ্ট হল। ষষ্ঠ আলফোন্সো ইবনে আব্বাদের কাছে লিখলেন, তোমাদের বন্ধু ইউসুফ দূর-দেশ থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। বাকি যতদিন সে বেঁচে আছে, ততদিন তার দেখাশোনা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। তোমাদেরকে আর ক্লান্ত করতে চাই না। তোমাদের প্রতি দয়া ও সম্মানস্বরূপ আমিই তার কাছে আসছি এবং তোমাদের ভূমিতে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। আর সমমনা ও উযীরদেরকে তিনি বললেন, আমার মত হল, যদি আমরা তাদেরকে আমাদের দেশে প্রবেশের সুযোগ দিই এবং তারা আমাদের ভূমিতে লড়াই করে আর কোন কারণে আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহলে তো তারা আমাদের দেশ উজাড় করে ফেলবে, এক সকালেই

---

[৬০] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৬ ও লেখক অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৫৩।

Scanned with CamScanner

সবাইকে কচুকাটা করবে। তাই আমি চাচ্ছি, তাদের দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে। যদি আমরা সেখানে পরাজিতও হই, তারা যা পাবে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, পুনরায় প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া পিছু নেওয়ার বা আমাদের দেশে হামলা করার চিন্তা করবে না। ফলে আমাদের দেশও রক্ষা পাবে, পরাজয় কাটিয়ে উঠে পুনরায় প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগও পাওয়া যাবে। আর যদি আমরা জয়লাভ করি, তাহলে আমরা নিজেদের দেশে যুদ্ধে পরাজিত হলে যে আশঙ্কা করছি, ঠিক তা-ই ঘটবে তাদের ভাগ্যে।[৬১]

মুসলিম বাহিনীকে ধোঁকা দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে আলফোন্সো যুদ্ধের দিনও নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি বার্তা পাঠান, আগামীকাল শুক্রবার আর শুক্রবার আপনাদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই সেদিন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। তার পরের দিন শনিবার, ইহুদিদের আনন্দের দিন। যেহেতু আমাদের এ অঞ্চলে প্রচুর ইহুদিও আছে, তাই আমাদের কর্তব্য তাদের দিকটিও খেয়াল রাখা। আর এর পরদিন হল রোববার, আমাদের আনন্দের দিন। সুতরাং, আসুন, আমরা এসব আনন্দের দিনগুলোর সম্মান বজায় রাখি। সোমবারেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।[৬২]

আলফোন্সোর বার্তা পাঠ করার পর ইউসুফ বিন তাশফীন প্রবঞ্চিত হয়ে পড়েন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজন্যবর্গ কখনো প্রতারণা করেন না;[৬৩] অধিকন্তু এটি ছিল খৃস্টানদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবেলা। তবে মু'তামিদ বিন আব্বাদ ঠিকই আলফোন্সোর চাল ধরে ফেলেন এবং তার আশঙ্কার কথা ইউসুফ বিন তাশফীনকে জানিয়ে রাখেন।[৬৪]

মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস ও ইবনে রুমাইলার স্বপ্ন

মু'তামিদের অবগতির ভিত্তিতে ইউসুফ বিন তাশফীন পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং আলফোন্সোর কথার ওপর আস্থা না রেখে বৃহস্পতিবারই মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস ও সর্বশেষ যুদ্ধপ্রস্তুতিতে মনোযোগী হন। তিনি পরবর্তী দিন যুদ্ধ করার জন্য বাহিনীকে পূর্ণ প্রস্তুত করেন।

---

[৬১] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯৮।

[৬২] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৬ ও *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৫৭।

[৬৩] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১৯৪-১৯৫।

[৬৪] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৭।

Scanned with CamScanner

এটি ছিল এমন এক উত্তেজনাকর মুহূর্ত, আন্দালুসবাসী আন্দালুসের মাটিতে অনেক বছর পর যার স্বাদ পেতে যাচ্ছে। লাঞ্ছনা, অবমাননা ও জিযিয়া প্রদানের দিনগুলো পেরিয়ে কত বছর পর আবারও তারা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে! আন্দালুসের মুমিনদের অন্তর শাহাদাতের তামান্নার পাশাপাশি কত দিন যাবৎ এই ক্ষণটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে! ইউসুফ বিন তাশফীন এ সময় সকলকে সূরা আনফাল পাঠ করার আদেশ দেন এবং সকলকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে খতীবদের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজে বাহিনীর প্রতিটি অংশের কাছে গিয়ে গিয়ে আওয়াজ দিতে থাকেন, সৌভাগ্য তার জন্য, যে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবে। আর যে গাজী হবে, তার জন্য তো রয়েছে আজর ও গনীমত। আররাওযুল মি'তার গ্রন্থে আছে,

> ইউসুফ বিন তাশফীন ও মু'তামিদ বিন আব্বাদ আপন আপন সৈন্যদের নসীহত করলেন। ফকীহ ও আবিদগণ মানুষকে নসীহত করার পাশাপাশি সবর ও অটলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভয়াবহ আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।[৬৫]

জুমা-পূর্ব রাতে কর্ডোভার বিশিষ্ট মালেকী শায়খ ফকীহ-আবিদ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন রুমাইলা আলকুরতুবীও মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ইবনে বাশকুওয়াল 'আসসিলাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> তিনি (আবুল আব্বাস আহমাদ বিন রুমাইলা) ছিলেন জ্ঞানানুরাগী, মাশায়েখে কেরামের সংস্পর্শপ্রিয়। দুনিয়াবিমুখতা সম্বন্ধে তার চমৎকার কিছু কবিতা আছে। তিনি দান-সদকা ও কল্যাণমূলক কাজ প্রচুর পরিমাণে করতেন। আবুল আব্বাস জ্ঞানে-গুণে, তাকওয়া ও ধার্মিকতায় শীর্ষদের কাতারে ছিলেন।[৬৬]

সেদিন শায়খের দায়িত্ব কেবল মসজিদে বসে থাকা, দরস প্রদান করা কিংবা কোরআন শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ ছিল না। সে রাতে তার অবস্থান ছিল বাড়িতে, মসজিদে কিংবা দরসগাহে নয়; সে রাতে তিনি অবস্থান করছিলেন

---

[৬৫] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯০।

[৬৬] ইবনে বাশকুওয়াল, *আসসিলাহ*, ১/১১৮।

Scanned with CamScanner

সেনাছাউনিতে। শায়খ আবুল আব্বাস সে রাতে স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছেন, ইবনে রুমাইলা! নিঃসন্দেহে তোমরাই বিজয়ী হবে আর নিশ্চয়ই তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

এতটুকু দেখার ইবনে রুমাইলার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি জানেন, স্বপ্নে রাসূলকে দেখার অর্থ স্বয়ং রাসূলকেই দেখা। কেননা, শয়তান কখনো নবীজীর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. আপন সনদে হযরত আনাস রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِيْ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ»

যে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখল, সে ঠিক আমাকেই দেখল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[৬৭]

আনন্দে উদ্বেলিত শায়খ আবুল আব্বাস উঠে দাঁড়ান। খুশিতে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। স্বয়ং নবীজী স্বপ্নযোগে তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, শীঘ্রই তিনি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে যাচ্ছেন। তার সামনে এখন একই সঙ্গে দু'টি সুপরিণতি: মুমিনদের বিজয় আর নিজের শাহাদাত লাভ। আল্লাহু আকবার! কী আনন্দ বিজয়ের! কী আজর শাহাদাতের!

ইবনে রুমাইলা তৎক্ষণাৎ গভীর রাতেই শয্যা ত্যাগ করে মুসলিম সেনাপতিদেরকে; এমনকি স্বয়ং মু'তামিদ বিন আব্বাদকে জাগিয়ে তোলেন। সবাইকে শোনান স্বপ্নে পাওয়া নবীজী-প্রদত্ত সুসংবাদের কথা। স্বপ্নের এ সুসংবাদ ইবনে আব্বাদকেও আলোড়িত করে, করে আন্দোলিত। তিনি এ সংবাদ ইউসুফ বিন তাশফীন ও সকল সেনাপতির কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আনন্দের আতিশয্যে মধ্যরাতে সেনাপতিদের সমস্বর কণ্ঠধ্বনিতে জেগে ওঠে পুরো মুসলিম বাহিনী। সবার কণ্ঠে একই আনন্দধ্বনি– ইবনে রুমাইলা নবীজীকে বলতে দেখেছেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরাই বিজয়ী হবে আর নিশ্চয়ই তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে'।[৬৮]

---

[৬৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৫৯৩।

[৬৮] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯০, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৪৫।

Scanned with CamScanner

রণাঙ্গনের নজরদারীতে ইবনে আব্বাদের গোয়েন্দা-তৎপরতা

আগত মুরাবিতী বাহিনীর সৈন্যগণ আলফোন্সোর কোন গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে এই আশঙ্কায় ইবনে আব্বাদ মুরাবিতী ছাউনির ওপরও নজর রাখছিলেন। কারণ, মুরাবিতীগণ আন্দালুস-ভূমিতে একেবারেই নবআগন্তুক। এ দেশের পথ-ঘাট সম্বন্ধে তাদের মোটেই ধারণা নেই। তিনি নিজেই এ দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি কথিত আছে, মুরাবিতী ছাউনি থেকে জনৈক বেদুঈন সৈনিক কোন কাজে বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বের হলে স্বয়ং ইবনে আব্বাদকে মুরাবিতী ছাউনির চারপাশে টহলরত অবস্থায় দেখতে পায়। ইবনে আব্বাদ তখন মুরাবিতী ছাউনির বিভিন্ন পথের প্রবেশমুখগুলোতে অশ্বারোহী বাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টকে বিন্যস্ত করার কাজ শেষ করে নিজেই টহল দিচ্ছিলেন। মুরাবিতী ছাউনি থেকে বের হওয়া সৈনিকরা চলাফেরার সময় বারবার ইবনে আব্বাদের মুখোমুখি হওয়ায় মাঝে মধ্যেই ভাবছিল যে, আমরা কি ভুলে আন্দালুসী ছাউনিতে চলে এলাম?![৬৯]

রাতেই মু'তামিদের গোয়েন্দা-বাহিনীর দু'জন সদস্য তাকে জানায় যে, তারা দু'জন রাতের অন্ধকারে আলফোন্সোর ছাউনির কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা খৃস্টান সেনাবাহিনীর কোলাহল এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেয়েছে। এরপর গোয়েন্দা-বাহিনীর অন্যরাও উপস্থিত হয়ে আলফোন্সোর আগামীকাল যুদ্ধ শুরু করার তৎপরতার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এর কিছুক্ষণ পর আলফোন্সোর ছাউনির ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা গুপ্তচরেরা উপস্থিত হয়ে ইবনে আব্বাদকে জানায়, আমরা গোপনে কান পেতে আলফোন্সোর কথা শুনতে পেরেছি। সে তার সঙ্গীদের বলছিল, ইবনে আব্বাদই এ যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছে। মরুচারী এই বেদুঈন গোষ্ঠী যদিও সামরিক ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ; কিন্তু এ দেশ ও পরিবেশ-প্রতিবেশ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। ইবনে আব্বাদই তাদেরকে পরিচালিত করছে। সুতরাং তোমরা তাকেই প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করবে এবং তার ওপরই হামলা চালাবে। সে যদি পরাভূত হয়, তাহলে এই বেদুঈনরা তোমাদের সামনে তুচ্ছ। তোমরা যদি একযোগে তাদের ওপর হামলা চালাও, আমার মনে হয় না, তারা তোমাদের সামনে টিকতে পারবে। ইবনে আব্বাদ তৎক্ষণাৎ

---

[৬৯] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৭ ও হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯০।

Scanned with CamScanner

আলফোন্সোর তৎপরতার সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার জন্য তার কাতিব আবু বকর বিন কুসাইরাকে ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে পাঠান। ইবনুল কুসাইরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মুরাবিতী ছাউনিতে আমীরুল মুসলিমীনের কাছে পৌঁছেন এবং তাকে গোয়েন্দাদের সংগ্রহ করা যাবতীয় তথ্য অবহিত করেন।[৭০]

মুসলিম বাহিনী ও যুদ্ধ-পরিকল্পনা

১২ রজব, ৪৭৯ হিজরী।
২৩ অক্টোবর, ১০৮৬ খৃস্টাব্দ।
শুক্রবার।
বাদ ফজর।

মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বাহিনীর সদস্যগণ ভোরে ফজর নামায শেষ করার পরপরই ষষ্ঠ আলফোন্সো স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন এবং সেদিনই আক্রমণ শুরু করলেন। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা– এগুলো তো খৃস্টানদের জাতীয় স্বভাব।

খৃস্টান বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে মুসলিম বাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতির সম্মুখীন হল, যেমনটি স্বয়ং ইউসুফ বিন তাশফীনও পরবর্তী সময়ে তার লেখা এক পত্রে নিশ্চিত করেছেন। খৃস্টান বাহিনীর সবগুলো অংশ চারিদিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথম আঘাতটি ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন।

উল্লেখ্য, মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে তিনটি মৌলিক অংশে বিভক্ত ছিল।

১. আন্দালুসী বাহিনী। এ অংশে আন্দালুসের সকল সৈনিক অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মু'তামিদ বিন আব্বাদ ও আন্দালুসের অন্যান্য রাজন্যবর্গ; যেমন আলমারিয়ার শাসক ইবনে সামাদিহ, গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন, উচ্চ সীমান্তের প্রধান নিরাপত্তারক্ষক ইবনে মাসলামা, ইবনে যিননূন, ইবনুল আফতাস প্রমুখ। ইউসুফ বিন তাশফীন তাদের সকলকে মু'তামিদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭১] মু'তামিদ

---

[৭০] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯০, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/৩৬৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৪৫।

[৭১] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৪৪-৪৫।

Scanned with CamScanner

ছিলেন এই বাহিনীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে, মুতাওয়াককিল বিন আফতাস দক্ষিণ বাহুতে, পূর্ব আন্দালুসের শাসকবর্গ বাম বাহুতে এবং অন্যান্য শাসকবর্গ ছিলেন এই দলের পেছনের অংশে।[৭২]

ক্রুশেড বাহিনীর প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধকারী অগ্রবর্তী অংশের জন্য মু'তামিদ নিজেই নিজেকে নির্বাচন করেছিলেন।[৭৩] এর মাধ্যমে তিনি তার বিগত বছরগুলোর দোষ-ত্রুটি ও লাঞ্ছনা-অবমাননা ধুয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন কিংবা তার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাব্য বিজয়ের মূল কৃতিত্ব ও মর্যাদা লাভ করা এবং বিজয়ের গৌরব তার নামে প্রচারিত হওয়া। বাস্তব নিয়ত কী ছিল, আল্লাহই ভালো জানেন।

অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে, স্বয়ং ইউসুফ বিন তাশফীন আশঙ্কা করেছিলেন যে, মু'তামিদ হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকবেন না এবং সর্বস্ব বিলীন করে যুদ্ধ করবেন না। তাই ইউসুফ বিন তাশফীনের দাবিতেই মূলত মু'তামিদ নিজেকে অগ্রবাহিনীর সম্মুখ সারিতে রেখেছিলেন।[৭৪]

২. মুরাবিতী যোদ্ধাগণের একটি অংশ। এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মুরাবিতী বীর যোদ্ধা দাউদ বিন আয়েশা। এ দলটির অবস্থান ছিল আন্দালুসী দলের পেছনে।

৩. মুরাবিতী বাহিনীর মূল অংশ। ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্বে এ দলটি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত মূল বাহিনী হতে দূরে একটি টিলার আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে ছিল, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের দেখা না যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে, পুরো মুসলিম বাহিনী দু' দলে বিভক্ত; আন্দালুসী বাহিনী এবং দাউদ বিন আয়েশার নেতৃত্বাধীন মুরাবিতী বাহিনী।[৭৫]

এই পদক্ষেপের পেছনে ইউসুফ বিন তাশফীনের পরিকল্পনা ছিল, যুদ্ধ যখন তীব্রতর পর্যায়ে পৌঁছবে এবং উভয় পক্ষ লড়াই করে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়বে, হারিয়ে ফেলবে লড়াই করার শক্তি, যেমনটি ম্যারাথন দৌড়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তখন তিনি তার বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর কাতারে যোগ

---

[৭২] অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৫৯।

[৭৩] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/১১৭।

[৭৪] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৭।

[৭৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৭, ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৪৬ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, ৩/২৪২-২৪৩।

Scanned with CamScanner

দিয়ে যুদ্ধের পাল্লা মুসলিম বাহিনীর দিকে ঝুঁকিয়ে দেবেন।[৭৬]
অবশ্য ইউসুফ বিন তাশফীনের এই পরিকল্পনা মুসলমানদের যুদ্ধ-ইতিহাসে নতুন কোন পরিকল্পনা ছিল না। এই একই কৌশল সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. পারস্য-বিজয়ের সময় ওয়ালাজা রণাঙ্গনে (Battle of Walaja) ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া পারস্য-অভিযানেই আরেক বিখ্যাত সাহাবী নোমান বিন মুকার্‌রিন রাযি.ও এই একই পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছিলেন নিহাবন্দের যুদ্ধে (Battle of Nahavand)। সুতরাং ইউসুফ বিন তাশফীনের এই পরিকল্পনা প্রমাণ করে, তিনি ইতিহাস পাঠ করতেন এবং ইসলামী ইতিহাসের মহান সেনাপতি ও বীর সৈনিকদের যুদ্ধ-ইতিহাস অধ্যয়ন করে তা থেকে শিক্ষা নিতেন।

যাল্লাকা ... আন্দালুসে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ

৪৭৯ হিজরীর ১২ রজব মোতাবেক ১০৮৬ খৃস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর শুক্রবার আলফোন্সো তার সুবিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রথম অংশের (অর্থাৎ আন্দালুসী বাহিনীর) ওপর হামলা চালালেন। আলফোন্সো তার বাহিনী নিয়ে মু'তামিদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলেন। মু'তামিদ ও তার সঙ্গী আন্দালুসী সৈনিকগণ প্রবল বিক্রমে খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল এবং অভূতপূর্ব ধৈর্য ও অটলতার পরিচয় দিল।

খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার পাশাপাশি ইবনে আব্বাদ ইউসুফ বিন তাশফীনের আগমনের পথে তাকিয়ে ছিলেন। ইউসুফ বিন তাশফীনের আগমন তার কাছে বিলম্বিত মনে হচ্ছিল। এদিকে খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠছে এবং পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর আকার ধারণ করছে। মরুবাসী মুরাবিতীদের বিলম্বে মু'তামিদের সঙ্গীগণ বিরূপ ধারণার শিকার হল। মু'তামিদ-পুত্র আবদুল্লাহসহ অনেকেই হাল ছেড়ে দিল এবং পরাভূত হল। ইবনে আব্বাদ নিজে গুরুতর আহত হলেন। প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাতে তার মাথায় মারাত্মক যখম হল, ডান হাতও আঘাতপ্রাপ্ত হল। তার শরীরের একপাশ বর্শার আঘাতে রক্তাক্ত হল। যুদ্ধরত অবস্থায় একে একে তার তিনটি ঘোড়া নিহত হল। যখনই একটি ঘোড়া মারা

---

[৭৬] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/১১৮।

Scanned with CamScanner

যাচ্ছিল, আরেকটি ঘোড়া তাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ইবনে আব্বাদ যেন মৃত্যু-দরিয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে তার ডানে-বামে তরবারি চালনা করে যাচ্ছিলেন। এই মরণপণ অবস্থায় তার স্মরণ হল তাঁর অতি প্রিয় এক বালক পুত্রের কথা, যাকে তিনি অসুস্থ অবস্থায় সেভিলে রেখে এসেছিলেন। তার এই পুত্রের নাম ছিল মুআল্লা, আর উপনাম ছিল আবু হাশেম। পুত্রের কথা স্মরণ হওয়ামাত্রই স্বভাবকবি মু'তামিদ রণাঙ্গনের এই সুকঠিন মুহূর্তে আবৃত্তি করলেন,

أَبَا هَاشِمٍ هَشَّمَتْنِي الشِّفَارُ فَلِلّٰهِ صَبْرِيْ لِذَاكَ الْأُوَارِ

ذَكَرْتُ شُخَيْصَكَ تَحْتَ الْعَجَاجِ فَلَمْ يُثْنِنِيْ ذِكْرُهُ لِلْفِرَارِ

আবু হাশেম! তরবারি ও বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই চরম সঙ্গীন মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই আমি অটল-অবিচল রয়েছি।

ধুলোয় ধূসর রণাঙ্গনেও আমার স্মৃতিপটে বারবার ভেসে উঠেছে তোমার মুখচ্ছবি। তোমার মুখচ্ছবির সুখস্মৃতিই আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের জন্য দুর্বল হতে দেয়নি।

এর পরপরই বীর সেনাপতি দাউদ বিন আয়েশার নেতৃত্বে মুরাবিতী সৈন্যদের প্রথম দলটি আন্দালুসী সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিল। দাউদ বিন আয়েশা এসে ইবনে আব্বাদের দুশ্চিন্তা দূর করলেন।[৭৭]

এদিকে আলফোন্সোও তার বাহিনীকে দু' ভাগে বণ্টন করেছিলেন। মুরাবিতী সৈন্যগণ যুদ্ধে যোগদান করামাত্রই আলফোন্সো তার বাহিনীর বিশাল দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে দাউদ বিন আয়েশার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রবল হামলা চালালেন। মুরাবিতী সৈন্যগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করে যেতে লাগল। কিন্তু খৃস্টান সৈন্যসংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাদের তোড়ে মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধ ভেসে যাওয়ার উপক্রম হল। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। হাজারো তরবারি ভোঁতা হল, অসংখ্য বর্শা ভেঙে গেল। বারহানিস ও রডমির-পুত্রের নেতৃত্বে খৃস্টান

---

[৭৭] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৭৭, হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯১, আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১৯৪-১৯৫, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্‌সা*, ২/৪৬।

Scanned with CamScanner

বাহিনীর অপর অংশ ইবনে আব্বাদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখল এবং প্রতিরোধক্ষমতা প্রায় গুড়িয়ে দিল। মুসলিম বাহিনীর বাতালইয়ুসের অংশের সেনাপতিগণ যুদ্ধে পরাভূত হল। এক ইবনে আব্বাদ ও তার সৈন্যরা ছাড়া কেউ যুদ্ধের ময়দানে টিকতে পারল না। ইবনে আব্বাদ তার সেভিলীয় সৈন্যদের নিয়ে রণাঙ্গনের এক প্রান্তে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লড়াইয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন। মোটকথা, মুসলিম বাহিনী আরও একবার পরাজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল।

এই যখন যুদ্ধ পরিস্থিতি, ঠিক তখনই ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্বে মুরাবিতী সৈন্যদের মূল দলটি অগ্রসর হল। এতক্ষণের প্রবল ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিম-খৃস্টান উভয় দলের শক্তিই নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। ইউসুফ বিন তাশফীন ও তার সঙ্গীগণ এতক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাজাদম সৈন্যদের নিয়ে ইউসুফ বিন তাশফীন রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন যুদ্ধের শেষ দৃশ্যে সর্বশেষ আঁচড়টি টানার জন্য।

ইউসুফ বিন তাশফীন তার সঙ্গী সৈন্যদের দু' ভাগে বণ্টন করলেন। সায়র বিন আবু বকরের নেতৃত্বে প্রথম অংশে ছিল যিনাতা, মুছাদামা, গুমারাসহ অন্যান্য বার্বার গোত্র এবং মাগরেবের বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধাগণ। এ দলটি দাউদ বিন আয়েশা ও ইবনে আব্বাদের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সহায়তায় অগ্রসর হল। সানহাজা গোত্রের অন্যান্য শাখাগোত্র দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় অংশটি কী করল, তার বিবরণ আমরা পড়ব ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের ধারা-বর্ণনায়।

> (দ্বিতীয় দলটি) ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্বে যুদ্ধরত খৃস্টান বাহিনীর পেছনে চলে গেল এবং সরাসরি খৃস্টান বাহিনীর শিবিরের উদ্দেশে রওয়ানা হল। তারা আগুন লাগিয়ে খৃস্টান বাহিনীর তাঁবু জ্বালিয়ে দিল এবং সেখানে আলফোন্সো যেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধাকে ছাউনির প্রহরা ও নিরাপত্তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন, তাদের ওপর আক্রমণ করল। এই আক্রমণ থেকে যারা আত্মরক্ষা করতে পারল, তারাও প্রতিরোধ করার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আলফোন্সোর উদ্দেশে ছুটতে লাগল। ছাউনিতে থাকা অতিরিক্ত অশ্বগুলোও আগুন দেখে ছাউনি ছেড়ে পালাতে লাগল।
>
> আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম

Scanned with CamScanner

বাহিনী যুদ্ধ-দামামা বাজিয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে তাদের পিছু নিল। তাদের নিপুণ তরবারি চালনায় খৃস্টান বাহিনীর মাঝে রক্তের বন্যা বয়ে গেল।

আলফোন্সো অবাক হয়ে বললেন, এরা আবার কারা? তাকে খৃস্টান বাহিনীর ছাউনি ভস্ম হওয়া, অস্ত্র-শস্ত্র লুট হওয়া, প্রহরীদের নিহত হওয়া এবং নারীদের বন্দী হওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হল। আলফোন্সো নতুন এই দলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি দেখলেন, আমীরুল মুসলিমীন তার দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। উভয়ের মধ্যে শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। এমন বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা কখনো শোনা যায়নি।[৭৮]

এর পরবর্তী পরিস্থিতি *'আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া'* গ্রন্থের লেখকের ভাষায়,

খৃস্টান বাহিনী যখন দেখল যে, তাদের সামনেও মুসলিম বাহিনী, পেছনেও মুসলিম বাহিনী এবং তারা দু' দিক থেকেই অবরুদ্ধ, এ অবস্থা দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তারা দেখল, তাদের ছাউনি আগুনে পুড়ছে, সেখান থেকে বেঁচে থাকা আহত প্রহরীদের আর্তনাদ ভেসে আসছে। এসব দৃশ্য দেখে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তারা দ্রুত নিজেদের ছাউনি রক্ষায় অগ্রসর হতে চাইলে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হল। শুরু হল দুই বাহিনীর তীব্র লড়াই। যুদ্ধের পাল্লা একবার মুসলিম বাহিনীর দিকে হেলে যায়, তো আরেকবার খৃস্টান বাহিনীর দিকে। অবশেষে মুসলিম বাহিনী রণাঙ্গনের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে সক্ষম হল। যুদ্ধ-পরিস্থিতি খৃস্টান বাহিনীর প্রতিকূলে চলে গেল। খৃস্টান বাহিনীর নামকরা বীর যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ একে একে নিহত হল। অশ্বের পিঠ থেকে ছিটকে পড়তে লাগল খৃস্টান যোদ্ধাদের প্রাণহীন দেহ। আলফোন্সো তার সৈন্য, পরিচারক ও ভৃত্যদেরকে অশ্বের পিঠ থেকে নেমে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণের আহ্বান করলেন। আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করলেন এবং কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন।[৭৯]

---

[৭৮] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৭৭।

[৭৯] লেখক অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৫৯।

Scanned with CamScanner

যাই হোক, এভাবে খৃস্টান বাহিনী সামনে থেকে আন্দালুসী বাহিনী এবং পেছন থেকে মুরাবিতী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। ফলে খৃস্টান বাহিনীর মাঝে বিশৃঙ্খলা ও পিছুটান শুরু হয়ে গেল। কিছু সৈনিক আলফোন্সোর পাশে সমবেত হয়ে তার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করল। কিন্তু এরপরই খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি হল এক বিশাল আলোড়ন।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিময়ারী রহ. লিখেছেন,

> ইউসুফ বিন তাশফীন তার (আলফোন্সোর) দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আপন সঙ্গীদের নিয়ে তার ওপর হামলা করলেন। ইবনে আব্বাদের সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। আসন্ন বিজয়ের সুঘ্রাণ পেতে থাকা মুসলিম বাহিনী এবার একযোগে খৃস্টান বাহিনীর ওপর হামলা চালাল। মুসলিম বাহিনীর অশ্বদলের পদচারণায় রণাঙ্গন প্রকম্পিত হয়ে উঠল। রক্ত পাড়ি দিয়ে প্রতিটি অশ্ব এগিয়ে চলল পরবর্তী লক্ষ্যের সন্ধানে। উভয় পক্ষই প্রচণ্ড বীরত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে লড়াই করে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সংবাদ পেয়ে ইবনে আব্বাদের বাহিনীর পলায়নপর সৈন্যরাও ফিরে এল এবং সবাই মিলে একসঙ্গে হামলা চালাল।[৮০]

সূর্যাস্তের সামান্য পূর্ব পর্যন্ত চলল ঘোরতর লড়াই। এ সময় ইউসুফ বিন তাশফীন চার হাজার দক্ষ সুদানী সৈন্যের একটি অশ্বারোহী দলকে দূর থেকে ইঙ্গিত করলেন। এরা তার বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র তারা আপন আপন ঘোড়া থেকে নেমে গেল এবং বিশেষ মিশন পালনকারী কমান্ডো বাহিনীর মতো খৃস্টান সৈন্যদের ভেদ করে তাদের মধ্যখানে অবস্থানরত নৃপতিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চার হাজার সৈন্যের এই বিশেষ দলটি পৌঁছে গেল লড়াইয়ের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। তাদেরই একজন খৃস্টান সেনাপতি ও নৃপতি আলফোন্সোর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হলেন এবং সঙ্গে থাকা খঞ্জর আলফোন্সোর উরুতে বিদ্ধ করলেন।

'আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া' গ্রন্থের লেখক যুদ্ধের এই মুহূর্তের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> যুদ্ধ তীব্রতর অবস্থায় পৌঁছলে পরিস্থিতি খৃস্টান বাহিনীর প্রতিকূলে

---

[৮০] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯০।

Scanned with CamScanner

চলে গেল। খৃস্টান বাহিনীর নামকরা বীর যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ একে একে নিহত হল। অশ্বের পিঠ থেকে ছিটকে পড়তে লাগল খৃস্টান যোদ্ধাদের প্রাণহীন দেহ। আলফোন্সো তাঁর সৈন্য, পরিচারক ও ভৃত্যদেরকে অশ্বের পিঠ থেকে নেমে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণের আহ্বান করলেন। আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করলেন। ... এরই মাঝে কৃষ্ণকায় এক তরুণ মুসলিম যোদ্ধা অত্যাচারী আযফুনাশের কাছে পৌছে হাতে থাকা খঞ্জর দিয়ে তার বর্ম ছিন্ন করে ফেলল এবং প্রচণ্ড আঘাত করে খঞ্জরটি তার উরুতে গেঁথে ফেলল। খঞ্জরটি তার উরু ভেদ করে অশ্বপিঠের জিন পর্যন্ত পৌছে গেল। পরবর্তী সময়ে আযফুনাশ প্রায়ই বলতেন, কৃষ্ণবর্ণের এক তরুণ আমার মুখোমুখি হয়ে কাস্তে দিয়ে আমার উরুতে আঘাত করেছে। বিশেষভাবে তৈরি এ খঞ্জর বক্র আকৃতির হওয়ায় আলফোন্সো একে কাস্তে মনে করেছিলেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের খঞ্জরকে বার্বাররা 'আফতাস' বলত।[৮১]

আরেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ.-এর বর্ণনাই-বা বাদ দেব কেন?! তিনি লিখেছেন,

উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর প্রধান ইউসুফ বিন তাশফীন তার বিশেষ অনুচরদের আদেশ করতেই তারা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এল এবং হালকা ও ছোট বিশেষ এক ধরনের বর্শা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করল। বর্মপরিহিত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে এ ধরনের ছোট ও হালকা অস্ত্রের কোন বিকল্প ছিল না। এ দলেরই একজন আযফুনাশের ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল এবং খঞ্জর দিয়ে তাকে আঘাত করল।[৮২]

মৃত্যু অবধি এই আঘাতের ক্ষত ও প্রভাব আলফোন্সোর শরীরে রয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন।

আহত আলফোন্সো তার ছাউনির কাছে ছোট্ট একটি টিলার আড়ালে আশ্রয় নিলেন। সুবিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা আলফোন্সোর সঙ্গে এখন পাঁচ শ' অশ্বারোহীর ক্ষুদ্র একটি দল, যারা প্রত্যেকেই আহত। বাকিরা হয়

---

[৮১] অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৬১।

[৮২] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, তৃতীয় অংশ, পৃ : ২৪৩।

Scanned with CamScanner

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে কিংবা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছে।

রাতের আঁধার গভীর হতেই আলফোন্সো পলায়নের পথ ধরলেন। পথে তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা জখমের কারণে একের পর এক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল। আলফোন্সো যখন টলেডোতে পৌঁছলেন, তখন তার সঙ্গে এক শ' সৈন্যও অবশিষ্ট ছিল না। কোন কোন বর্ণনামতে তো ত্রিশ জনেরও কমসংখ্যক সৈন্য জীবিত অবস্থায় টলেডোতে ফিরতে পেরেছিল। মুসলিম বাহিনী গনীমত হিসেবে প্রচুর সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র, বাহন ইত্যাদি লাভ করল। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রায় তিন হাজার সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। আর তাই সর্ব বিবেচনায় কোন প্রকার অতিশয়োক্তি ছাড়াই যাল্লাকার যুদ্ধকে তুলনা করা যায় ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে।

রণাঙ্গন শান্ত হতেই মু'তামিদ বিন আব্বাদ পলায়নরত আলফোন্সোর চূড়ান্ত দফা-রফা করতে তাকে ধাওয়া করার মত পেশ করলেন। কিন্তু ইবনে তাশফীন বললেন, এখন খৃস্টান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন ও তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার অর্থ তাদেরকে মরণপণ যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া। তখন তাদের লড়াইয়ের মনোভাব হবে 'হয় মার, না হয় মর'। এতে মুসলিম বাহিনীর সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বিশেষত যুদ্ধ চলাকালে প্রাথমিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে পালিয়ে গিয়েছিল এমন অনেক আহত মুসলিম সৈন্য এখন যুদ্ধপরিস্থিতি আমাদের পক্ষে আসার সংবাদ পেয়ে হয়তো ফেরার পথে আছে। তারা আলফোন্সোর পথে পড়তে পারে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই দলবিচ্ছিন্ন আহত দুর্বল সৈন্যরা শক্তিতে আলফোন্সোর বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাদের ফিরে আসার জন্য যদি আমরা আজকের দিনটি অপেক্ষা করি, তাহলে তাদের প্রত্যাবর্তনে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যায় ভারসাম্য ফিরে আসবে এবং আগামী দিন আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব। ইবনে আব্বাদ উত্তরে তাকে বললেন, এখন যদি সে আমাদের সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারে, তাহলে তার পরাজিত সঙ্গীরা যখন তার সঙ্গে যোগ দেবে, তখন তাকে পরাভূত করা কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীন তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং বললেন, কুকুরকে বেশি ভয় দেখানো হলে সে বাধ্য হয়ে কামড় দেয়।

আমরা আজ যখন ইতিহাসের পাতায় সেদিনের ঘটনা পাঠ করছি, তখন এক্ষেত্রে ইউসুফ বিন তাশফীনের তুলনায় ইবনে আব্বাদের মতই তুলনামূলক সঠিক মনে হয়। কেননা, আলফোন্সো এরপরও নিবৃত্ত হননি;

Scanned with CamScanner

বরং এরপর আরও বিশ বছর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। যাল্লাকার পরাজয়ে তিনি মোটেও দুর্বল বা হতোদ্যম হননি। যাল্লাকা যুদ্ধের দিন যদি তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করা হত, আজ আমরা নিশ্চিত করেই আন্দালুসের ইতিহাস অন্যভাবে লিখতাম। মুসলমানরা আবারও হৃত টলেডো নগরী পুনরুদ্ধার করতে পারত। অবশ্য আমরা আজ আমাদের এই মত প্রকাশ করছি ঘটনাপ্রবাহ শেষ হওয়ার বহু বছর পরে। স্বীকার করতেই হবে, সেদিন যদি আমরা সেই পরিস্থিতিতে উপস্থিত থাকতাম, তাহলে আমাদের অবস্থান কী হত, তা এখন নির্ধারণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

যাল্লাকার ঘটনাপ্রবাহের সমাপ্তি না ঘটতেই মাগরেব থেকে ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে এক মর্মন্তুদ সংবাদ এসে পৌঁছল। এ সংবাদ ছিল তার ও তার পরিবারের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক এক সংবাদ। সংবাদ এল, তার বড় পুত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সংবাদে ইউসুফ বিন তাশফীনের মাগরেব প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত হল।

যুদ্ধ-বিবরণ যাল্লাকার মহানায়ক ইউসুফ বিন তাশফীনের কলমে

যাল্লাকা যুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দালিলিক নথি অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর লেখক স্বয়ং যাল্লাকা যুদ্ধের মহানায়ক আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন। প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান তার ইতিহাসগ্রন্থ *'দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস'*-এ পুরো বিবরণটিই উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'বিবরণটি আমীর আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন তাশফীন পত্রাকারে মাহদিয়ায় আননাসির বি দ্বীনিল্লাহ তামীম বিন মুই'য বিন বাদিসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। পত্রে মুসলিম প্রতীচ্যের দেশগুলোর বিবরণ, তার আন্দালুসে গমন, ৪৭৯ হিজরীর রজব মাসে খৃস্টান নৃপতি আযফুনাশকে পরাজিত করা ইত্যাদির মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে।'

তবে আমাদের জন্য এ নথির যে অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেই অংশটুকুই অর্থাৎ আমীরুল মুসলিমীনের কলমে যাল্লাকা-যুদ্ধের বিভিন্ন পরিস্থিতির বিবরণ এখানে তুলে ধরছি। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন লিখেছেন,

সৈন্য-সমাবেশ ঘটিয়ে আমরা আলফোন্সোর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম

Scanned with CamScanner

এবং মুসলিম ভূমির কুরিয়া[৮৩] এলাকায় পৌঁছলাম, আল্লাহ তাআ'লা পুনরায় তা মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিন। আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে সে-ও ময়দানে পৌঁছল এবং আমাদের অপেক্ষায় সেখানকার একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ছাউনি স্থাপন করল। কোরআনে বর্ণিত মহান আল্লাহ তাআ'লার বিধান অনুযায়ী আমরা তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বার্তা পাঠালাম এবং তাকে দ্বীনে মুহাম্মাদী গ্রহণ করার দাওয়াত দিলাম। অন্যথায় হীনবল হয়ে জিযিয়া প্রদান এবং অধিকৃত এলাকার দখল ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বললাম। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাল এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। সে কুফরী ও ভ্রষ্টতার পথেই অটল রইল। এরপর সে আমাদের উদ্দেশে অগ্রসর হল এবং খৃস্টান জাতিকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতে উদ্বুদ্ধ করল। সে তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের ছাউনি থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে ছাউনি স্থাপন করল। ময়দানে উপস্থিত থাকলেও পরবর্তী কয়েকদিন আমরা তাদের দিক থেকে সাড়া পেলাম না। এ সময় আমরা অগ্রবর্তী দল পাঠিয়ে তার গতিবিধির খোঁজখবর নিতাম। অবশেষে ৪৭৯ হিজরীর ১১ রজব বৃহস্পতিবার দিন আমরা তার সঙ্গে লড়াই করার সর্বশেষ প্রস্তুতি নিলাম এবং বাহিনী বিন্যাস করলাম।

শুক্রবার দ্বিতীয় প্রহরে হঠাৎ করেই খৃস্টান বাহিনীর সবগুলো অংশ দিগন্ত ছেয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে এল এবং মৃত্যু যেভাবে দৃষ্টিকে খুঁজে ফেরে, তেমনভাবেই এগিয়ে এল। আত্মরক্ষার জন্য তারা নিজেদের শরীর বর্ম দ্বারা আবৃত করেছিল আর পায়ে বেঁধেছিল লোহার পাত। মদে মাতাল খৃস্টান বাহিনী ভাবছিল, জয় তাদেরই হবে। সেদিন ভোরে আমরা আপন আপন তাঁবুতেই অবস্থান করছিলাম। সে মুহূর্তে আমরা সকলে ছিলাম উদাসীন ও অপ্রস্তুত। তারা পূর্ণ উদ্যমে ও প্রবল উৎসাহে ধেয়ে এল এবং আন্দালুসী বাহিনীর প্রধান মু'তামিদ আলাল্লাহ আলমুআইয়াদ বি নাসরিল্লাহ - আল্লাহ তাকে আপন তাওফীকে সৌভাগ্যশীল করুন- এর ছাউনিতে হামলা করল, যেন তাদের লক্ষ্য কেবল মু'তামিদের ছাউনি,

[৮৩] আসসাগরুল আদনা বা নিম্ন সীমান্ত অঞ্চলের একটি এলাকা। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

মু'তামিদের সৈন্যদল। আমাদের সঙ্গী দাউদ তার সামনের অংশেই ছিলেন। পুরো খৃস্টান বাহিনী তাদের দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে একযোগে মু'তামিদের সৈন্যদলের ওপর প্রবল স্রোতের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণে মু'তামিদের সৈন্যদল, যারা ইতঃপূর্বে সম্পদ গুদামজাত করায় ব্যস্ত ছিল, দিশেহারা হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা এমন হল যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে না, ভয়ে পাঁজর কম্পমান, হস্তদ্বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পায়ের তলায় মাটি নেই, আত্মা যেন উড়ে গেছে। তারা যেন আরোহণ করেছে গাধার পিঠে! ভয়ে তারা রণাঙ্গন ছেড়ে পালাল এবং আশ্রয়ের জন্য কোন দুর্গ তালাশ করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কে আছে আশ্রয়দাতা! আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে আল্লাহ ছাড়া কার কাছেই-বা যাওয়া যাবে?

যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি দেখে তারা পালিয়ে বাতালইয়ুসে আশ্রয় নিল আর তাদের সেনাপতি মু'তামিদকে একাকী ফেলে রেখে গেল সামান্য কিছু পদাতিক সৈন্য ও তীরন্দায দলের সঙ্গে। তারা তাকদীরকেই মেনে নিয়েছিল। খৃস্টান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেমন সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের উপর। খৃস্টান সৈন্যরা গির্জার জয়গান গেয়ে যাচ্ছিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেবল মু'তামিদ ও তার সৈন্যরাই পুরো খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে গেল। যুদ্ধের সেই ঘোরতর পরিস্থিতিতে মু'তামিদ এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, যেন মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার নিয়তের সততা ও লক্ষ্যের অবিচলতার কারণে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি বীরের মতো লড়াই করে গেলেন। তার অশ্বারোহী সৈন্যরা কেউ ফিরেও এল না, কেউ তার পক্ষ হয়ে প্রতিরোধও করল না।

এরপর আলফোন্সোর বিশাল পাহাড়ের ন্যায় কিংবা নিকষ রজনীর ন্যায় কালো সৈন্যদল দাউদের ছাউনি ও তাঁবু লক্ষ্য করে অগ্রসর হল। তারা এসব ছাউনির চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং অনেককে হত্যা করল। আল্লাহর শোকর, যারা নিহত হলেন, সকলেই লাভ করলেন শহীদী মর্যাদা, পৌঁছে গেলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির ছায়াতলে। আমরা তখনও আপন স্থানেই অবস্থান করছিলাম।

Scanned with CamScanner

যখন আমাদের পদক্ষেপের সময় হল, আমরা গিরিপথের আড়াল থেকে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় আরবী চিহ্নিত অশ্বে আরোহী অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। এসব অশ্ব তরবারি ও বর্শার আঘাত এড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হতে সক্ষম। খৃস্টান বাহিনী যখন আমাদেরকে দেখল, তারা ভাবল, এই বুঝি তাদের তরবারির নতুন গ্রাস এসে গেছে, বর্শার নতুন শিকার এসে গেছে। আমরা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর নামে তাকবীর দিয়ে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হলাম এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য জেগে উঠলাম। মৃত্যু থেকে তো কারোরই নিস্তার নেই! আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, দুনিয়াতে এটিই আমাদের শেষ দিন। সুতরাং সকলে শহীদী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

প্রতিপক্ষ নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় আমাদের দিকে ছুটে এল। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের দৃঢ়পদ রাখলেন এবং আমাদের অন্তরে শক্তি যোগালেন। আমরা অনুভব করলাম, আসমানের ফিরেশতারা আমাদের সঙ্গে আছেন আর আল্লাহ তাআ'লাই আমাদের বিজয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের প্রবল আক্রমণে খৃস্টান সৈন্যরা রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে লাগল। আল্লাহর কী কুদরত! তাদের অধিকাংশই কোন তরবারি বা বর্শার আঘাত ছাড়াই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভীতি তাদের হস্তচালনার শক্তি কেড়ে নিল। আমরা সামহারিয়্যা বর্শা[৮৪] দিয়ে তাদের আঘাত করতে লাগলাম। সুপ্রশস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ করেই তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। দিগ্বিদিক হারিয়ে পলায়নরত খৃস্টান সৈন্যদের অবস্থা এমন ছিল যে, সামনে যাই পড়ে, তাকেই মুসলিম সৈন্য ভেবে কেঁপে ওঠে! মুসলিম বাহিনীর তরবারির আঘাতে খৃস্টান বাহিনীতে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। আল্লাহর শপথ! বর্মের ওপর আঘাত করা হচ্ছিল, তো বর্ম ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল; শিরস্ত্রাণে আঘাত করা হচ্ছিল, তো তা কেটে তরবারির আঘাত মাথায় লাগছিল। আমাদের পদাতিক সৈন্যগণ বর্শা নিক্ষেপ করে তাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের একের পর এক ভূপাতিত করছিল।

অবস্থা এমন হল যে, খৃস্টান বাহিনীর যে অশ্বারোহী সৈন্যের দিকেই

---

[৮৪] বিশেষ এক ধরনের মজবুত বর্শা। দেখুন : ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, ভুক্তিমূল: سمهر ।

Scanned with CamScanner

তাকাবে, দেখবে তার অশ্ব প্রভুর ভূপাতিত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু পালাতে পারছে না। পালাবে কীভাবে, ভূপাতিত সৈন্যরা যে তাদের লাগাম টেনে ধরে আছে! অশ্বগুলো যেন কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ! আমরা আমাদের সুরক্ষিত, বরকতপূর্ণ ও তাজাদম আরবী ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছিলাম। আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত স্থান পরিবর্তনে দক্ষ এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম। আমাদের প্রত্যেকের তরবারির খাপে ছিল দু'টি তরবারি আর হাতে ছিল তৃতীয় আরেকটি। উদ্দেশ্য, যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা।

যাই হোক, খৃস্টান সৈন্যদের ভূপাতিত মৃতপ্রায় দেহগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। পলায়নপর মুসলিম সৈন্যরা ফিরে আসতে লাগল। সাময়িক স্খলনের পর তারা এতক্ষণে নিরাপদ বোধ করল। আমাদের প্রতিটি ছাউনি আবার পূর্ণ হল।

খৃস্টান বাহিনীর দু' হাজার বা তারও কম সৈন্য বাঁচতে পেরেছিল। আমরা জানতে পেরেছি, বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে আযফুনাশও ছিল। আহত ও দুর্বল অবস্থায় তারা তাদের ছাউনিতে অবস্থান করছিল এবং পলায়নের জন্য রাতের অন্ধকারের অপেক্ষা করছিল। আল্লাহর কসম! আমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকগণ তাদের ছাউনিতে প্রবেশ করে তাদের চোখের সামনে থেকে তাদের আসবাব-পত্র, সহায়-সম্বল তুলে নিচ্ছিল আর তারা এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেভাবে ছাগ তাকিয়ে থাকে কসাইয়ের ছুরির দিকে। রাত যখন গভীর হল এবং চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল, তারা নিজেদের বাহন, সামানা সবকিছু ফেলে লাঞ্ছিত অবস্থায় পালাতে লাগল। কত বর্ম মাটিতে পড়ে ছিল! কত ঘোড়া হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে ছিল! আমাদের একেকজন অশ্বারোহী সৈন্য পাঁচটি বা তারও বেশি ঘোড়া বেঁধে নিয়ে এসেছিল। আর গাধা ও খচ্চরের সংখ্যা তো ছিল ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি। পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সম্পদের কথা তোমাকে আর কী বলব! তারা পালাতে গিয়ে ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেয়নি, সম্পদ ফেলে যেতেও দ্বিধা করেনি। তারা পালিয়ে প্রথমে কুরিয়ায় আশ্রয় নিল, এরপর যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেল। আমরা আমাদের নিয়তকে পুনঃনবায়ন করে নিলাম এবং মু'তামিদের প্রতি

Scanned with CamScanner

আন্তরিক ধারণা পোষণ করলাম। আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে তারই শোকর আদায় করতে করতে বিজয়ী বেশে আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম।

আমাদের মধ্য থেকে অল্প কিছুসংখ্যক যোদ্ধা, যাদের ভাগ্যে আল্লাহ তাআ'লা শাহাদাত নসীব করেছিলেন, তারাই নিহত হয়েছিলেন। আমাদের ধারণা, তারা সকলেই কেবল খৃস্টানদের সঙ্গে লড়াই করার পূর্ব-অভিজ্ঞতার অভাব কিংবা শাহাদাতের প্রবল তামান্নার কারণেই নিহত হয়েছেন। আল্লাহ তাদের রূহকে আপন পুণ্যাত্মা বান্দাদের কাতারে শামিল করুন, তাদের ঠিকানা ও সমাধিকে সম্মানিত করুন এবং জান্নাতকেই তাদের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলনের স্থানরূপে নির্ধারিত করুন। এ যুদ্ধে আমরা আমাদের এমন বিশজন শীর্ষস্থানীয় বীর যোদ্ধাকে হারিয়েছি, যাদের বীরত্বের খ্যাতি পুরো মাগরেব জুড়ে ছিল।

এরপর আমরা সেভিলে মু'তামিদের রাজধানীতে ফিরলাম এবং সেখানে তার আতিথ্যে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। অবশেষে তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা তার কাছ থেকে চলে এলাম। এ বিদায়ী অভিবাদন চির বিচ্ছেদের নয়! আল্লাহ মু'তামিদের দীর্ঘ জীবন দ্বারা সেভিলকে সুশোভিত রাখুন।[৮৫]

চাই না কোন প্রতিদান, চাই না কৃতজ্ঞতা

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর সৈন্যগণ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করল। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীন এক্ষেত্রে স্থাপন করলেন সততা ও একনিষ্ঠতা এবং নির্মোহতা ও আত্মনিবেদনের উজ্জ্বল ও গৌরবময় এক দৃষ্টান্ত। বিশেষকরে বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গসহ সকল আন্দালুসবাসীর সামনে নির্মোহতার অনন্য এক প্রায়োগিক নমুনা স্থাপন করে তিনি পুরো গনীমতের সম্পদ আন্দালুসবাসীকে প্রদান করলেন। সম্পদ-নিরাসক্তি ও নির্ভেজাল তাকওয়ার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি ফিরে গেলেন মাগরেবে। অব্যক্ত ভাষায় যেন আন্দালুসবাসীকে বলে গেলেন,

﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

[৮৫] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৪৪৮।

Scanned with CamScanner

আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না। [সূরা দাহর : ০৯]

মাক্কারী রহ. *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থে লিখেছেন,

মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চারদিন সেখানেই অবস্থান করল এবং যুদ্ধলব্ধ সকল সম্পদ একত্রিত করা হল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনকে এগুলো বণ্টনের অনুরোধ করা হলে তিনি নিজে তা থেকে সামান্যও গ্রহণ করলেন না; বরং আন্দালুসের রাজন্যবর্গকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর পথে লড়াইয়ের আজরে আযীম ও চিরস্থায়ী সাওয়াব অর্জন; অন্য কিছু নয়। রাজন্যবর্গ যখন গনীমত গ্রহণে ইউসুফ বিন তাশফীনের উদারতা ও পরার্থপরতা প্রত্যক্ষ করল, তখন ইউসুফ বিন তাশফীনের প্রতি তাদের হৃদয় শ্রদ্ধাবনত হল এবং তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।[৮৬]

মাগরেবে ফিরে আসার পূর্বে ইউসুফ বিন তাশফীন বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গকে একত্র করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং হানাহানি ও সংঘাত পরিহার করার নির্দেশ দিলেন, যেন তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে এই মহান বিজয়ের সুফল বিনষ্ট না হয়। এরপর এই দুঃসাহসী মুসলিম বীর ফিরে গেলেন নিজ দেশে। এ সময় তার বয়স ছিল ঊনআশি বছর!

তিনি চাইলেই পারতেন নির্জন মরুভূমি ও উত্তাল সাগর পাড়ি দেওয়ার কষ্ট সহ্য না করতে। চাইলেই পারতেন যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও রক্তপাত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে। তিনি পারতেন অজানা ভূমির অচেনা মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজে না গিয়ে মাগরেবে অবস্থান করতে এবং তার কোন সেনাপতিকে আন্দালুসে প্রেরণ করতে। কিন্তু আশি ছুঁই ছুঁই এই টগবগে বৃদ্ধ কঠিন সব বাধাকে জয় করেছেন, ভ্রাতৃত্ববাদী চেতনাকে লালন করেছেন এবং অশ্বের পিঠে চড়ে রণাঙ্গনে ছুটে বেড়িয়েছেন। তার চেতনা ও শ্লোগান ছিল কবির ভাষায়,

إِذَا غَامَرْتَ فِيْ شَرَفٍ مَرُوْمٍ فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُوْنَ النُّجُوْمِ

[৮৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৯।

Scanned with CamScanner

فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِيْ أَمْرٍ حَقِيْرٍ كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِيْ أَمْرٍ عَظِيْمٍ

কাঙ্ক্ষিত গৌরব অর্জনের জন্য তুমি (মৃত্যু) ঝুঁকিই যখন নেবে, তাহলে সুদূর আকাশের তারকারাজি ছোঁয়ার পূর্বে তুষ্ট হয়ো না। কেননা, তুচ্ছ লক্ষ্য অর্জনে ভোগ করা মৃত্যুর স্বাদ তো গুরুত্বপূর্ণ কোন মিশন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে লাভ করা মৃত্যু-স্বাদের তুলনায় ভিন্ন কিছু নয়।[৮৭]

কিন্তু তিনি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করেও এবং শাহাদাতের সন্ধান করেও মৃত্যুবরণ করেননি; বেঁচে ছিলেন অনেকদিন। আর তাই হারাম হোক ভীরু-কাপুরুষদের চোখের নিদ্রা!

যাল্লাকার যুদ্ধে জ্ঞানী-গুণী, প্রথিতযশা আলিমসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন। যেমন, নবীজীকে স্বপ্নে দেখা ইবনে রুমাইলা, মার্‌রাকিশের কাযী আবু মারওয়ান আবদুল মালিক মাছমুদী প্রমুখ। আল্লাহ তাআ'লা তাদের সকলকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন।[৮৮]

মু'তামিদ বিন আব্বাদ ও আল্লাহর পথের সৈনিকের মর্যাদা

যুদ্ধ শেষে মু'তামিদ বিন আব্বাদ যখন সেভিলে প্রত্যাবর্তন করলেন, উৎসাহী জনতার ভীড় যেন উপচে পড়ছিল। সবাই তাকে বিজয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছিল। ক্বারী সাহেবগণ কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, কবিগণ তার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে তার শানে রচিত কবিতা পাঠ করছিলেন।

আবদুল জলীল বিন ওয়াহবুন রহ. বলেন,

সেদিন আমিও মু'তামিদের সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম এবং তার সামনে পাঠ করব বলে মনের মাধুরি মিশিয়ে অতি চমৎকার একটি কবিতা রচনা করলাম। এমন সময় আমি ক্বারী সাহেবকে তেলাওয়াত করতে শুনলাম,

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ ﴾

তোমরা যদি তার সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোন ক্ষতি

---

[৮৭] পঙ্‌ক্তিদ্বয় নেওয়া হয়েছে *'দিওয়ানুল মুতানাব্বী'* হতে।

[৮৮] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯২, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৬৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৪৮।

Scanned with CamScanner

নেই । কেননা,) আল্লাহই তার সাহায্য করেছেন । [সূরা তাওবা : ৪০]
এ আয়াত শুনে আমি জনান্তিকে বলে উঠলাম, চুলোয় যাক আমার কবিতা! কোরআনের এ চিরন্তন আয়াত তো আমার জন্য উপস্থাপন করার মতো কিছুই বাকি রাখেনি!

যুদ্ধে মু'তামিদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের খ্যাতি সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার গৌরব ও মর্যাদা বিস্তৃত হল । তিনি লাভ করলেন জনমানুষের হৃদয়ের আসন এবং শাসকবর্গের সম্মান-আচরণ । রাজন্যবর্গ সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠাল । পরবর্তী সময়ে ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে তিনি যে ব্যতিক্রমী আচরণ করেছিলেন, যার বিবরণ সামনে আসছে, তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সকলের কাছে মাননীয়, বরণীয় ও সম্মানিত হয়েই ছিলেন ।[৮৯]

[৮৯] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ২৯২, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৭০ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৫০ ।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আন্দালুসে বিভক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন

যাল্লাকার প্রান্তরে চূড়ান্তরূপে পরাজিত হওয়ার পরও মুসলিম আন্দালুসে খৃস্টানশক্তির আগ্রাসন বন্ধ হল না; বরং এ যুদ্ধের পর খৃস্টানশক্তি মুসলিম ভূমিতে হামলা, আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ আরও বৃদ্ধি করল। খণ্ডিত আন্দালুসের শাসকবর্গ এর মোকাবেলায় কিছুই করতে পারলেন না। বরং অবস্থার অবনতিতে একসময় খৃস্টানশক্তির হাতে পূর্ব আন্দালুসের প্রধান নগরী এবং পুরো মুসলিম আন্দালুসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী ভ্যালেন্সিয়ার পতন ঘটল।

শাসকবর্গের মাঝে পূর্ব থেকে চলে আসা পারস্পরিক হানাহানি ও সংঘাতও বন্ধ হল না। ইউসুফ বিন তাশফীন মাগরেবে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, তা তারা মোটেই স্মরণ রাখল না। ফলে বাধ্য হয়ে জনসাধারণ আবারও ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। স্বয়ং মু'তামিদ বিন আব্বাদও তার সহায়তা কামনা করলেন। এসব কারণেই আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন দ্বিতীয়বারের মতো সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসের মাটিতে পা রাখলেন।

এবারও প্রথমবারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। মুরাবিতী সৈন্যগণ খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করল। তবে ৪৮১ হিজরীতে (১০৮৮ খৃস্টাব্দে) এলেডো (Aledo) দুর্গ অবরোধকালে ইউসুফ বিন তাশফীন অনুভব করলেন, বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গ প্রতারণা ও কপটতার আশ্রয় নিচ্ছেন এবং তার সঙ্গে অবাধ্য আচরণ করছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, আন্দালুসের মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে খৃস্টানশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন ও পক্ষপাতিত্বের প্রবণতা রয়েছে। এতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

পরবর্তী সময়ে এ ধরনের পরিস্থিতি বারবার সৃষ্টি হতে লাগল। বাধ্য হয়ে ইউসুফ বিন তাশফীন ৪৮৩ হিজরীতে (১০৯০ খৃস্টাব্দে) তৃতীয়বারের মতো

Scanned with CamScanner

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তার বাহিনীসহ আন্দালুসে প্রবেশ করলেন।

বাস্তবতা হল, ইউসুফ বিন তাশফীনের হৃদয়ে আন্দালুসের সম্পদরাজি বা ক্ষমতার প্রতি মোটেই মোহ-আকর্ষণ ছিল না। প্রথমবার সাগর পাড়ি দেওয়ার পূর্বে তিনি এ নিয়ে দীর্ঘ সময় দ্বিধাগ্রস্তও ছিলেন। ইতঃপূর্বে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তিনি গনীমতের সম্পদে নিজের অধিকার উপেক্ষা করেছেন এবং তা মু'তামিদসহ অন্যান্য শাসকবর্গের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন; নিজে তা থেকে কিছুই নেননি। এরপর বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গের পারস্পরিক মতানৈক্য ও ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে তাদের কারও কারও মিত্রতার কারণে তিনি পুনরায় আন্দালুসে পা রেখেছেন। আর এবার তৃতীয়বারের মতো তার আন্দালুসে আগমন ছিল এসব অথর্ব শাসকবর্গের তামাশার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নাম দিয়ে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী এবং পরস্পর সংঘাত ও হানাহানিতে লিপ্ত এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছিল।[৯০]

মূলত দ্বিতীয়বারের অভিযানের শেষ সময়েই ইউসুফ বিন তাশফীনের সামনে এসব শাসকবর্গের প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, কীভাবে তারা পরস্পর হানাহানি ও সংঘাতে লিপ্ত আছে, আপন ভাইদের বিরুদ্ধে খৃস্টানশক্তির সাহায্য কামনা করছে, কীভাবে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধাভিযানে তারা অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে মুশরিকদের প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করছে। এমনকি দ্বিতীয়বারের সফরে তিনি যখন এলেডা দুর্গে বসবাসকারী খৃস্টানদের অবরোধ করলেন, তখন পূর্ব আন্দালুসের কিছু শাসক তাকে সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দাম্ভিক ভাষায় বলল, আপনার আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। কেননা, আপনি শরীয়ত-স্বীকৃত কোরাইশ বংশীয় ইমাম নন!

এর থেকেও নোংরা ও জঘন্য বিষয় হল, এমন একটি পত্র ইউসুফ বিন তাশফীনের হস্তগত হল, জনৈক মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে যা খৃস্টান শাসকের কাছে পাঠানো হচ্ছিল এবং পত্রে খৃস্টানদেরকে ইউসুফ বিন তাশফীনের মোকাবেলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং অটল থাকতে উৎসাহ যোগানো হয়েছিল।

দাম্ভিক ও উদ্ধত শাসকদের আপত্তির জবাবে ইউসুফ বিন তাশফীন

---

[৯০] শাওকী আবু খলীল, *আয্যাল্লাকা*, পৃ : ৬৪-৬৫।

Scanned with CamScanner

তাদেরকে বলেছিলেন, আমি কোরাইশ বংশীয় নই ঠিক আছে; কিন্তু আমি তো আমীরুল মুমিনীন আলমুসতাযহিরের খাদেম। আমার শাসিত এলাকার দু' হাজারের অধিক মিম্বর হতে তার নামে খোতবা পাঠ করা হয়, আমার রাষ্ট্রের মুদ্রা তার নামেই তৈরি করা হয়।[৯১]

কিন্তু বাগদাদের আব্বাসী খলীফার সঙ্গে মিত্রতার এসব দলীল প্রদানের পরও এসব শাসকবর্গ শরীয়তের দোহাই দিতে লাগল! অথচ তাদের নিজেদেরই খেলাফত ও খলীফার সঙ্গে কোন মিত্রতা বা সম্পৃক্তি ছিল না। যারা নিজেরা ক্ষমতা লাভ করার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত মুসলমান ও মুসলিম ভূখণ্ডকে অপদস্থ করার মাধ্যমে, খৃস্টানদের হাতে মুসলিম ভূখণ্ড তুলে দেওয়ার মাধ্যমে, তাদেরকে উপঢৌকন ও জিযিয়া প্রদান এবং মুসলিম ভাইদের ধ্বংস করার জন্য তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করেছে, আজ তাদের মুখে শরীয়তের বুলি!

এই পরিস্থিতিতে ইউসুফ বিন তাশফীন বিভক্ত রাষ্ট্রগুলো জয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পর্যায়ক্রমে একের পর এক রাষ্ট্র জয় করতে লাগলেন। তিনি মাগরেব ও আন্দালুসের শাসনকার্যের অনুমোদনমূলক ফরমান লাভ করার উদ্দেশে বাগদাদে খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছে দরখাস্ত পাঠালেন। তার উদ্দেশ্য ছিল খলীফার ফরমান লাভ করার পাশাপাশি এসব শাসকবর্গের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের স্বপক্ষে শরয়ী দলীল লাভ করা।

এ উদ্দেশ্যে ফকীহ আবু মুহাম্মাদ আরাবী ও তার পুত্র আবু বকর ইবনুল আরাবী বাগদাদে পৌঁছলেন। সেখানে তারা তৎকালীন মুসলিম প্রাচ্যের ফকীহকুলের শিরোমণি ইমাম আবু হামিদ গাযালীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন এবং তাকে আন্দালুসের বিরাজমান পরিস্থিতি, ইউসুফ বিন তাশফীনের কীর্তি ও কর্মধারা, লড়াইয়ের ময়দানে ও দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধিতে তার অবদান, বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গের পারস্পরিক বিভেদ-হানাহানি, পাশ্ববর্তী শত্রুরাষ্ট্রের খৃস্টানদের সহায়তা গ্রহণ, মুশরিকদের প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশস্বরূপ ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে অভিযানে যোগ দিতে শাসকবর্গের অস্বীকৃতি ইত্যাদি সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলেন। এরপর ফকীহ ইবনুল আরাবী ইমাম গাযালীর কাছে আবেদন জানালেন, তিনি যেন এই বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি ফতোয়া লিখে তাকে

---

[৯১] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৪/৪১-৪৪।

Scanned with CamScanner

প্রদান করেন, যাতে এ সম্পর্কিত শরীয়তের বিধান উল্লেখ থাকবে; পাশাপাশি তিনি যেন খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছ থেকেও একটি ফরমান সংগ্রহ করে দেন।

তখন ইমাম গাযালী রহ. ইবনুল আরাবীর কাছ থেকে শোনা বিবরণের আলোকে বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের অবস্থান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ইউসুফ বিন তাশফীন যেসব অঞ্চল জয় করেছেন, সেসব অঞ্চলে তার শাসন-বৈধতার স্বপক্ষে খলীফার সরকারী ফরমান লাভের অধিকার সম্পর্কে একটি ফতোয়া লিখে দিলেন। এরপর ইমাম গাযালী চলে গেলেন।

পরবর্তী সময়ে ইমাম গাযালী নিজেই ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে একটি পত্র লিখলেন এবং তাতে ইবনুল আরাবী যেমন শুনিয়েছেন, তেমনই বিস্তারিতভাবে বিভক্ত শাসকবর্গের আচরণ, তাদের দুঃশাসনে আন্দালুসের দুর্দশা, পারস্পরিক হানাহানি ও লাঞ্ছনা ইত্যাদির কথা তুলে ধরলেন। পত্রে ইমাম গাযালী আরও উল্লেখ করলেন যে, তিনি বিভক্ত আন্দালুসের এসব নীতিহীন শাসকবর্গের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেছেন, ইবনুল আরাবী ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসনক্ষমতার বৈধতার স্বপক্ষে খলীফার ফরমান সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং ইবনুল আরাবী তাকে ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসনব্যবস্থার সমর্থনে ইরাক, পবিত্র ভূমি হেজাযসহ সবখানে বিস্তৃত প্রচারণা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এরপর দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ইবনুল আরাবী আলেকজান্দ্রিয়া অতিক্রমকালে আল্লামা আবু বকর তুরতুশীর কাছ থেকেও ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসন-বৈধতার স্বপক্ষে একটি পত্র সংগ্রহ করলেন। পত্রে আল্লামা তুরতুশী ইউসুফ বিন তাশফীনকে কোরআনের বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করার উপদেশ দিলেন।

দেশে ফেরার পথে ফকীহ ইবনুল আরাবী ৪৯৩ হিজরীর শুরুতে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন। এরপর তার পুত্র আবু বকর ইবনুল আরাবী সে বছরই ইমাম গাযালী ও আল্লামা তুরতুশীর পত্রদু'টি নিয়ে আন্দালুসে ফিরে আসেন। এছাড়াও তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন মুরাবিতী শাসকের পক্ষে খলীফা মুসতাযহিরের শাহী অনুমোদন-ফরমান।[৯২]

---

[৯২] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৮/৪৪৭, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/১৮৭-

Scanned with CamScanner

ইউসুফ বিন তাশফীন ও মাগরেব-আন্দালুস একক মুসলিম রাষ্ট্র

ইউসুফ বিন তাশফীনের আন্দালুসে প্রবেশ মোটেও সহজ ছিল না। বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গ এমনকি সেভিল-শাসক মু'তামিদও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। হ্যাঁ, সেই মু'তামিদ, যিনি যাল্লাকা যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইউসুফ বিন তাশফীনের পতাকাতলে আশ্রয় নেওয়ার সময়টুকু ব্যতীত কখনো কোথাও সামান্য মর্যাদাও লাভ করেননি। সেই মু'তামিদও দাঁড়ালেন ইউসুফ বিন তাশফীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে! কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীনের মতো ব্যক্তিত্বের সামনে লড়াইয়ের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব ও বীরত্ব তার কোথায়!

মুরাবিতী বাহিনী ও বিভক্ত শাসকবর্গের মধ্যকার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে আন্দালুসের সকল বিভক্ত রাষ্ট্র মুরাবিতী সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। ইউসুফ বিন তাশফীন পরিণত হন ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী উত্তর আন্দালুস থেকে শুরু করে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত এক সুবিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরে। এই একক রাষ্ট্রের নাম মুরাবিতী সাম্রাজ্য।

এই বয়োবৃদ্ধ মহান ইসলামী নেতা ৫০০ হিজরী পর্যন্ত মুরাবিতী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। অনন্যসাধারণ কর্ম-অবদানে সমৃদ্ধ এক দীর্ঘ জীবন শেষে এক শ' বছর বয়সে ৫০০ হিজরীতে (১১০৬ খৃস্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন।[৯৩] এরমধ্যে সাতচল্লিশ বছর তিনি অতিবাহিত করেছেন শাসনকার্যে। তার সুদক্ষ পরিচালনার কারণেই পরবর্তীতে মুরাবিতী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাত্র ষাট বছরের মাথায় মাগরেব-আন্দালুস সম্মিলিত রাষ্ট্র পরিণত হয় তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্রে।

১৮৮, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৭৩ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৪/৪১-৪৪।

[৯৩] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/৪৫, ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৫৬।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুরাবিতীদের অব্যাহত রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম

মুরাবিতীগণ আন্দালুসে প্রবেশ করার পর বিগত বছরগুলোতে খৃস্টানশক্তি মুসলিম আন্দালুসের যেসব ভূমি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। তারা এ উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে একাধিক ফ্রন্টে যুদ্ধ-তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ফলে একসময় মুরাবিতী সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তরে ফ্রান্সের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।[৯৪]

পাশাপাশি তারা পুনরায় টলেডোর নিয়ন্ত্রণ অর্জনেও সচেষ্ট হন। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তারা সফল হতে পারেননি। কারণ, পূর্বেও আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, টলেডো ছিল তৎকালীন আন্দালুসের সর্বাধিক সুরক্ষিত নগরীগুলোর একটি। অবশ্য মূল টলেডো নগরীর আশেপাশের অধিকাংশ শহরতলি ও গ্রাম মুসলিম বাহিনী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুরাবিতী অভিযান ও অব্যাহত বিজয়

ইউসুফ বিন তাশফীনের মৃত্যুর এক বছর পর এবং যাল্লাকার ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রায় বাইশ বছর পর ৫০১ হিজরীতে (১১০৭ খৃস্টাব্দে) আন্দালুসে মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে আরও একটি বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ উকলিসের যুদ্ধ (Battle of Uclés) নামে খ্যাত। ইউসুফ বিন তাশফীনের পুত্র আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসনামলে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইউসুফ বিন তাশফীনের আরেক পুত্র তামীম বিন ইউসুফ বিন তাশফীন আর ক্রুশেড বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ষষ্ঠ আলফোন্সোর পুত্র স্যাঞ্চো। এ যুদ্ধেও মুসলিম বাহিনী নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। নিহত হয় খৃস্টান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্যাঞ্চোসহ ২৩ হাজার সৈন্য।[৯৫] আন্দালুস-ইতিহাসে এ যুদ্ধকে 'দ্বিতীয় যাল্লাকা' নামে অভিহিত করা হয়।[৯৬]

---

[৯৪] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/৫৪, ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৬০।

[৯৫] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/৫০ ও ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৬০।

[৯৬] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, ৩/২৫৩।

Scanned with CamScanner

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ আলফোন্সোর এই পুত্র (স্যাঞ্চো) তার যে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল, সে পূর্বে মু'তামিদ বিন আব্বাদের পুত্র কর্ডোভার গভর্নর মামুনের দাসী ছিল। মামুন যখন মুরাবিতীদের হাতে পরাজিত হয় এবং মুরাবিতীগণ কর্ডোভা জয় করেন, তখন 'যায়েদা' নাম্নী এ দাসীটি তার দু' সন্তান অর্থাৎ মু'তামিদের দু' পৌত্রকে সঙ্গে নিয়ে টলেডোতে আলফোন্সোর কাছে পালিয়ে যায় এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে আলফোন্সো তাকে বিয়ে করলে তার গর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করে আলফোন্সোর এই সেনাপতি পুত্র স্যাঞ্চো। অত্যাচারী-স্বেচ্ছাচারীদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে!

উকলিসের যুদ্ধের সময় স্যাঞ্চোর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। আলফোন্সো তখন বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। তখন তার বয়স ছিল আশির উপরে। বার্ধক্যের ভারে নিস্তেজ আলফোন্সোর পক্ষে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান সম্ভবপর ছিল না বিধায় সেনাবাহিনীর মাঝে বীরত্ব ও চেতনা জাগিয়ে তুলতে তিনি তার কিশোর পুত্রকেই সেনাপতিরূপে প্রেরণ করেছিলেন।

এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পরও মুসলিম বাহিনীর বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে। ৫০৯ হিজরীতে (১১১৫ খৃস্টাব্দে) মুসলিম বাহিনী ইতঃপূর্বে বিভক্ত শাসকবর্গের আমলে হাতছাড়া হওয়া ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands) পুনরায় জয় করতে সক্ষম হয়। মুরাবিতী সাম্রাজ্যের পতাকাতলে আন্দালুসের বড় একটি অংশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।[৯৭]

আন্দালুসে মুরাবিতী শাসন প্রতিষ্ঠাকে তিনটি ধাপে বিভক্ত করা যায়।

১. নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে আন্দালুসে প্রবেশ। এ স্তর সমাপ্ত হয় যাল্লাকা বিজয়ের পরপরই মুরাবিতীদের প্রত্যাগমনের মাধ্যমে।

২. বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গের পারস্পরিক হানাহানি, বিদ্বেষ ও সংঘাতের কারণে সতকর্তামূলক স্তর। এসব শাসকগণ একক মুসলিম আন্দালুস গড়ার চিন্তা তো করেনইনি; উল্টো তাদের কেউ কেউ অন্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে খৃস্টানদের নৈকট্য অর্জনেও তৎপর ছিলেন।

৩. আন্দালুসকে মাগরেবের সঙ্গে একত্রিকরণের ধাপ। এ সময় মুরাবিতীগণ বিভক্ত শাসকবর্গের তামাশা-আচরণের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে আন্দালুসে আগমন করেছিলেন।[৯৮]

---

[৯৭] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৬২।

[৯৮] শাওকী আবু খলীল, *আয্যাল্লাকা*, পৃ : ৭২ ও সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুরাবিতীন*, পৃ : ১৩৬-১৩৭।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ আলফোন্সোর পরিণতি

আলফোন্সো তার একমাত্র পুত্র স্যাঞ্চোর মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পান এবং এর মাত্র বিশদিন পর ১১০৯ খৃস্টাব্দের ২৯ জুন (৫০২ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে) মৃত্যুবরণ করেন।[৯৯] তার মৃত্যুতে ক্যাস্টোলাবাসীর মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। আলফোন্সো তার চুয়াল্লিশ বছরের সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল শাসনামলে ক্যাস্টোলাকে কয়েক শতাব্দী ব্যাপৃত এক গৌরবময় অবস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। খৃস্টানসমাজ তাকে 'স্পেনের আলোকবর্তিকা ও লৌহবর্ম' উপাধি দিয়েছিল। তার শাসনামলে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র এমন শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছিল যে, পরবর্তী সময়ে কোন গৃহযুদ্ধ বা বিভক্তি তাকে দুর্বল করতে পারেনি।[১০০]

আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসনামলের কয়েকজন আলিম

১. কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ.

তার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনুল আরাবী[১০১] মুআ'ফিরী ইসবিলী আন্দালুসী মালেকী। তিনি ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে আন্দালুসেই শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পিতার সঙ্গে সফরে বের হন এবং পর্যায়ক্রমে বাগদাদ, দামেশক, বাইতুল মুকাদ্দাস, মক্কা ও মিশরে সমকালীন বড় বড় আলিমদের নিকট ইলম অর্জন করেন। এই দীর্ঘ ইলমী সফরের মাঝেই আলেকজান্দ্রিয়ায়

---

[৯৯] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ১৫৯ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/৫০।

[১০০] জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ১/১৪২।

[১০১] আন্দালুসের আরেকজন বিখ্যাত আলিম 'ইবনুল আরাবী' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হলেন বিখ্যাত সুফী আলিম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহ.। তার জন্ম ৫৬০ হিজরীতে আন্দালুসের মুরসিয়ায়, মৃত্যু ৬৩৮ হিজরীতে শামের দামেশকে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বিস্তারিত আলোচনার জন্য হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর কিতাব تنبيه الطربي في تنزية ابن عربي দেখা যেতে পারে। সূত্র: মুফতী তকী উসমানী, *জাহানে দীদাঁ*, পৃষ্ঠা: ২৮৭। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

অবস্থানকালে তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এরপর ৪৯১ হিজরীতে তিনি আন্দালুসে ফিরে আসেন।

তার প্রসিদ্ধ উসতাযগণের মধ্যে আছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালী রহ., ফকীহ আবু বকর শাশী রহ., সুসাহিত্যিক আল্লামা আবু যাকারিয়া তিবরীযী রহ., আল্লামা তুরতুশী রহ. প্রমুখ বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম।

তার মাধ্যমে আন্দালুসবাসী লাভ করেছে মুসলিম প্রাচ্যের ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার এবং উচ্চ সনদ। বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ অনেক আলিম তার শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কাযী ইয়ায রহ., আবু জাফর বিন বাযিশ রহ. প্রমুখ।[১০২]

বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইবনুল আরাবীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনাকর্ম হল,

- আহকামুল কোরআন (أحكام القرآن)
- আনওয়ারুল ফাজ্‌র ফিত তাফসীর (أنوار الفجر في التفسير) (আশি হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত তাফসীরগ্রন্থ)
- আননাসিখ ওয়াল মানসূখ (الناسخ والمنسوخ)
- আলক্বাবাস (القبس)
- শরহু মুআত্তা মালিক বিন আনাস (شرح موطأ مالك بن أنس)
- আ'রিযাতুল আহওয়াযী (عارضة الأحوذي) (সহীহ তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)।

ইবনে বাশকুওয়াল তার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> তিনি ছিলেন শাস্ত্রীয় ইমাম, হাদীসের জগতে হাফিয, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তাকে 'খিতামু উলামাইল আন্দালুস' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সকল শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইলমচর্চা ও ইলম প্রচারের অনুরাগী ছিলেন। সঠিক ও ভুল রেওয়ায়েত নির্ণয়ে তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির পরিচয় দিতেন। এ সবকিছুর পাশাপাশি তিনি আদাব ও আখলাক, বিনয় ও সদাচরণ, দয়াদ্রতা ও পরমতসহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইত্যাদি উন্নত মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাকে সেভিলের কাযী পদে নিয়োগ দেওয়া হলে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তার দৃঢ়তা, অনমনীয়তা ও শরয়ী বিধান বাস্তবায়ন-

---

[১০২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/৩০।

Scanned with CamScanner

গুণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা আন্দালুসবাসীকে উপকৃত করেন। অত্যাচারী ও অন্যায়কারীরা তার প্রভাবে সদা তটস্থ ও সন্ত্রস্ত থাকত। পরবর্তী সময়ে তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করা হলে তিনি ইলমের প্রচার-প্রসারের কাজে মনোযোগী হন এবং শিক্ষাদান ও লেখনীর কাজে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন।

৫৪৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (১১৪৮ খৃস্টাব্দে) তিনি মাগরেবে ইন্তেকাল করেন এবং ফেয নগরীতে সমাধিস্থ হন।[১০৩]

২. কাযী ইয়ায বিন মুসা বিন ইয়ায রহ.

তিনি ছিলেন একাধারে কাযী, শাস্ত্রজ্ঞ, মুজতাহিদ, ইমাম। জন্ম ও বসবাস মাগরেবের সিউটায় হলেও বংশগত দিক থেকে তিনি আন্দালুসী ছিলেন। ৪৭৬ হিজরীর মধ্য শাবানে (১০৮৩ খৃস্টাব্দে) তিনি সিউটায় জন্মগ্রহণ করেন।

তার পুত্র কাযী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আপন পিতার কীর্তিসমূহ উল্লেখ করে 'আততা'রীফ বিল কাযী ইয়ায' (التعريف بالقاضي عياض) নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক আলিমগণ এ গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আপন আপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

কাযী ইয়াযের ঊর্ধ্বতন পুরুষ আমরূন ছিলেন আন্দালুসের শ্রেষ্ঠতম হামিলুল কুরআনগণের একজন। তিনি এগারবার হজ্ব করেছেন এবং হাজিব আলমানসুর বিন আবু আমীরের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আন্দালুস ত্যাগ করে সিউটায় বসবাস করতে থাকেন। এখানেই তার পুত্র ইয়ায জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াযের পৌত্র (তথা তার পুত্র মুসার পুত্রই) হলেন আমাদের আলোচ্য কাযী আবুল ফযল ইয়ায।

তার পিতা ছিলেন হাফিযে কোরআন, তাফসীর ও উলূমুল কোরআনের বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ, তৎকালীন অন্যতম ইমামুল হাদীস, ইলমুল উসূল ও ইলমুল কালামে শাস্ত্রজ্ঞ, ফকীহ, মাসায়িলের হাফিয, নাহবী, সুসাহিত্যিক, কবি ও সুবক্তা।

কাযী ইয়ায ইলম অর্জনের জন্য প্রথমে আন্দালুস সফর করেন। তিনি সেখানে কর্ডোভা, মুরসিয়া ও অন্যান্য ইলমী অঙ্গনে ইলম অর্জন করেন।

---

[১০৩] ইবনে বাশকুওয়াল, *আসসিলাহ*, ২/৮৫৬।

Scanned with CamScanner

এরপর তিনি সিউটায় ফিরে আসেন এবং তখন থেকেই সিউটার শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের কাতারে গণ্য হতে থাকেন। অথচ তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর বা সামান্য বেশি। তিনি প্রথমে সিউটার উপদেষ্টার দায়িত্ব, এরপর কাযীর দায়িত্ব পালন করেন এবং সদাচরণ ও সুচারুরূপে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে প্রভূত প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর ৫৩১ হিজরীর সফর মাসের শুরুতে তিনি গ্রানাডায় চলে আসেন এবং সেখানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি টাডলার (Tadla) বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

কাযী ইবনে ইয়াযের উল্লেখযোগ্য রচনাকর্মের মধ্যে আছে,

- কিতাবুশ শিফা বি তা'রীফি হুক্বুকিল মুসতাফা (كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى)
- ইকমালুল মু'লিম (إكمال المعلم) (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)
- আলমুসতামবাতা আ'লাল কুতুবিল মুদাওওয়ানা ওয়াল মুখতালিতা (المستنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة)
- তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাক্বরীবুল মাসালিক লি মা'রিফাতি আ'লামি মাযহাবি মালিক (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك)
- আলই'লাম বি হুদূদি ক্বাওয়ায়িদিল ইসলাম (الإعلام بحدود قواعد الإسلام)
- আলইলমা' ফী যাবতির রিওয়ায়াতি ওয়া তাক্বয়ীদিস সিমা' (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع)

ইবনে বাশকুওয়াল লিখেছেন,

> তিনি প্রচুর হাদীস সংগ্রহ করেছেন। হাদীস সংগ্রহ ও মুখস্থ করার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল। ইলমের বিভিন্ন অঙ্গনে দক্ষতা, সুতীক্ষ্ণ মেধা ও বোধের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।[১০৪]

ফকীহ মুহাম্মাদ বিন হামাদা সাবতী তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> মাত্র আটাশ বছর বয়সে কাযী ইয়ায ইলমী বিতর্কের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন, পয়ত্রিশ বছর বয়সে বিচারকের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তিনি সাদাসিধা ছিলেন, তবে দুর্বল নয়। ন্যায়ের প্রশ্নে অটল-অবিচল ও কঠোর ছিলেন। সমকালীন সিউটায় তার চেয়ে অধিক গ্রন্থ রচনাকারী অন্য কেউ ছিল না। ইলমী অঙ্গনে তিনি যে

---

[১০৪] ইবনে বাশকুওয়াল, *আসসিলাহ*, ২/৬৬০-৬৬১।

Scanned with CamScanner

> উন্নত ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তা তৎকালীন অন্য কেউ অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এত মর্যাদা ও খ্যাতি লাভ করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন স্বভাব-বিনয়ী ও খওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত।[১০৫]

কাযী ইবনে খাল্লিকান *'ওয়াফাইয়াতুল আই'য়ান'* গ্রন্থে কাযী ইয়ায সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি তৎকালীন যুগে হাদীস, উলুমুল হাদীস, নাহু, ভাষাতত্ত্ব, কালামুল আরব, আইয়ামুল আরব, আনসাবুল আরব ইত্যাদি শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন।[১০৬]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আমীন তার *'আলমাজদুত তারিফ ওয়াত তালিদ'* (المجد الطارف والتالد)-গ্রন্থে কাযী ইয়ায রহ.-এর ইলমী মাকাম ও ইলমী অঙ্গনে তার অত্যুচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন,

> (একাডেমিক অঙ্গনে) কাযী ইয়াযের মর্যাদা ও অবস্থান ইমাম বুখারী ও ইমাম-চতুষ্টয়ের পর্যায়ের। ... খেয়াল করে দেখুন, হাদীস-শাস্ত্রবিদ, সীরাত রচয়িতা, ফকীহগণের যে কোন নির্ভরযোগ্য রচনাই আপনি অধ্যয়ন করবেন, তাতে কাযী ইয়াযের সূত্রে প্রচুর উদ্ধৃতি পাবেন। অথচ কাযী ইয়ায ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কেবল আন্দালুসেই সফর করেছিলেন; মুসলিম প্রাচ্যে তিনি কখনোই সফর করেননি।[১০৭]

কাযী ইয়ায রহ. ৫৪৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের নয় তারিখ মধ্যরাতে (১১৪৯ খৃস্টাব্দে) শুক্রবার মার্‌রাকিশে ইন্তেকাল করেন। নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বাবু ঈলানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।[১০৮]

---

[১০৫] দেখুন : যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ৪/৬৮।

[১০৬] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৩/৪৮৩।

[১০৭] আবদুল হাই আলকাত্তানী, *ফিহরিসুল ফাহারিস*, ২/৮০৪।

[১০৮] দেখুন : ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ৪/২২২।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অধঃগমন ও পতন

৫১২ হিজরীতে (১১১৮ খৃস্টাব্দে) মাগরেবে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের মূল প্রাণকেন্দ্রে এমন একটি বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়, যার নেতিবাচক প্রভাবে আন্দালুসে পরপর দু'টি যুদ্ধে মুরাবিতী বাহিনী পরাজিত হয়। একটি কুতুনদার যুদ্ধে, অপরটি কুলাইয়ার যুদ্ধে।

মুরাবিতী শক্তির অবসন্নতা ও পতন ... একটি প্রলম্বিত অধ্যায়

মাগরেবে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে বিদ্রোহের ঘটনা এবং এর পরপরই আন্দালুসে খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে উপর্যুপরি দু'টি যুদ্ধে মুরাবিতী বাহিনীর পরাজয়ের ঘটনার পর আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগা অতি স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত যে, শক্তিশালী ও সুমহান মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কেন বিদ্রোহ সংঘটিত হল?! এবং কেনই-বা এই পতন ও উপর্যুপরি পরাজয়ের ঘটনা ঘটল?!

এই ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য আমরা কিছুক্ষণের জন্য অতীতের সেই সময়কালে ফিরে যাব, যখন মুরাবিতী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ৪৪০ হিজরীতে (১০৪৮ খৃস্টাব্দে) মুরাবিতী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৫০৯ হিজরী (১১১৫ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা প্রায় সত্তর বছর মুরাবিতী সাম্রাজ্য যেভাবে একটানা বিজয়, সমৃদ্ধি ও উন্নতি, সম্পদ ও গনীমতের মুখ দেখেছিল; পৃথিবীর অবারিত ভূমি ও সম্পদ তাদের হাতে বিজিত হচ্ছিল; গৌরব ও মর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির যে অত্যুচ্চ স্তরে তারা উন্নীত হয়েছিল, এরপর স্বাভাবিক প্রত্যাশিত ঘটনা কী ঘটার ছিল? অতীত পৃথিবীর ইতিহাসের আলোকে এর পরবর্তী স্তরে কুদরতি ফয়সালাই-বা কী হওয়ার কথা?!

নিঃসন্দেহে এই ঘটনাপ্রবাহের পরবর্তী প্রত্যাশিত ও কুদরতি দাবি হল বিজিত সুবিশাল ভূমি ও সম্পদরাজির মোহে আচ্ছন্ন হওয়া এবং নতুন করে মুসলমানদের ভাঙন ও পতন।

Scanned with CamScanner

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আবু বকর বিন ওমর লামতুনী, ইউসুফ বিন তাশফীন ও তার গভর্নরদের মতো নির্মোহ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের হাতে অর্জিত অব্যাহত বিজয় এবং যাল্লাকার বিজয়ের মতো নুসরতে ইলাহীর প্রত্যক্ষ দর্শনের পরও মুসলমানদের এই পতন ও অধঃপতন কি যৌক্তিক ও সঙ্গত?!

তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, ইউসুফ বিন তাশফীনের মৃত্যু-পরবর্তী এই পতন ও অধঃপতনে আমরা অবাক হচ্ছি; অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাত-পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজে ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের নামে সর্বগ্রাসী যে অধঃপতন সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে আমরা অসম্ভব বা বিস্ময়কর ভাবছি না– এটাও কি কম বিস্ময়ের?! নিঃসন্দেহে ওয়াফাতে নবীর পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ফিতনার ঘটনা ইউসুফ বিন তাশফীন ও তার মতো অন্যদের বিদায়-পরবর্তী পতন ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষাদায়ক ও প্রভাবক; বিশেষত এ বিষয়টি যদি আমাদের জানা থাকে যে, আমাদের আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহ তথা মুরাবিতী সাম্রাজ্যের এই ভাঙন ও পতনের অন্তত সুস্পষ্ট কিছু কার্যকারণ রয়েছে।

মুরাবিতী সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতনের কয়েকটি কার্যকারণ

প্রকৃতপক্ষে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের এই পতন বিরল বা অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা কিংবা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ছিল না; বরং ইতিহাসের সুগঠিত ধারা ও চক্রের স্বাভাবিক রীতি মেনেই এ ঘটনা ঘটেছিল। এই অধঃগমন ও পতনের পেছনে অতি সুস্পষ্ট এমন কিছু কার্যকারণ সক্রিয় ছিল, যা পতনের অনেক পূর্ব থেকেই সক্রিয় ছিল। সংক্ষেপে আমরা সেসব কার্যকারণ এভাবে উল্লেখ করতে পারি।

১. অব্যাহত সামরিক তৎপরতা সত্ত্বেও পার্থিব মোহাচ্ছন্নতা

আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের শাসনামলে যদিও যুদ্ধ-তৎপরতা স্থগিত ছিল না; বরং স্বয়ং আমীর আলী বিন ইউসুফের নেতৃত্বেই খৃস্টানদের বিরুদ্ধে একাধিক ফ্রন্টে যুদ্ধ-তৎপরতা, অভিযান ও আক্রমণ অব্যাহত ছিল; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মুরাবিতী প্রশাসন পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর পিছনে এমন বড় একটি ভুল কার্যকর ছিল, মুরাবিতী সাম্রাজ্যের মুসলমানগণ অতি উদাসীনভাবে যা করে যাচ্ছিলেন। হায়! যদি আমরা এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতাম!

Scanned with CamScanner

একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে একই দুদর্শার শিকার না হতাম! ইতিহাস তো আমাদের এ শিক্ষাই নিতে বলে।

অত্যন্ত ভয়াবহ সেই ভুলটি হল, তারা তাদের পূর্ণ মনোযোগ ইসলামের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হতে ফিরিয়ে নিয়ে কেবল একটি বিশেষ দিককে সুসংহতকরণেই নিবদ্ধ করেছিলেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে হয় উপেক্ষা, নয়তো পরিত্যাগ করেছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আন্দালুস, মাগরেব ও আশেপাশের অঞ্চলে মুরাবিতীগণ বিজয়াভিযানের সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সুশাসন ও সুষম প্রশাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ থেকে পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন। ইসলামের স্বরাষ্ট্রনীতির কথা ভুলে গিয়ে তারা কেবল পররাষ্ট্রনীতি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

অথচ ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই ভারসাম্যপূর্ণ একটি ধর্ম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; যার মাঝে কোন দিককে প্রাধান্য দিয়ে অন্য দিককে উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে উপজীব্য করে শাসনকার্য পরিচালনার আদর্শ উদাহরণ তো আন্দালুসের ইতিহাসেই রয়েছে। আবদুর রহমান আননাসির যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার কথা স্মরণ করুন। বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ, অর্থনীতি ও প্রশাসননীতি, সভ্যতা ও ধর্মপালন– প্রতিটি ক্ষেত্রে আবদুর রহমান আননাসির ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন বলেই তার সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের আত্মিক-দৈহিক যাবতীয় প্রয়োজনের সফল ব্যবস্থাপক। আর এ কারণেই দীর্ঘ একটি সময় তার সাম্রাজ্য মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তদ্রূপ শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের হাত ধরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল। মুরাবিতী সাম্রাজ্যের সূচনাস্তরে আমরা দেখেছি জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে এবং পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থার যাবতীয় উপাদান ও কার্যকারণের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মুরাবিতী নেতৃবৃন্দের সমান মনোযোগ ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল উপযোগী প্রচেষ্টা, সময় ব্যয় এবং কর্মপরিচালনা। এ কারণেই মুরাবিতী রাষ্ট্রের পথিকৃৎ মহান ব্যক্তিগণ একদিকে যেমন গ্রহণ করেছেন অশ্বারোহী যোদ্ধা ও দুনিয়াবিমুখ আবিদ হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা, অপরদিকে নিয়েছেন সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ হওয়ারও দীক্ষা। একই সঙ্গে ইসলামের সঠিক ও মৌলিক মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নে সহায়তা

Scanned with CamScanner

করার পথ ও পন্থাও তারা শিখে নিয়েছেন সমান্তরালে। কিন্তু ৫০০ হিজরী-পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলের মুসলমানগণ তাদের পুরো শক্তি ব্যয় করেছেন লড়াইয়ের ময়দানে; পরিত্যাগ করেছেন অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, সঠিক সামাজিক শিক্ষাদান, সংস্কৃতির উন্নয়ন, ধর্মীয় শিক্ষার সার্বজনীন প্রসার ইত্যাদি সবকিছু। আর এটি ছিল মুরাবিতী সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো গর্হিত এক ভুল।

২. আলিমসমাজের উপস্থিতিতে অন্যায় ও পাপাচারের আধিক্য

আন্দালুস ও মাগরেব- মুরাবিতী সাম্রাজ্যের উভয় অংশেই অন্যায়-পাপাচার, গোনাহ ও অপরাধকর্ম ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আর এ সবকিছুই হয়েছিল সমকালীন বিদগ্ধ আলিমসমাজের উপস্থিতিতে। অবশ্য রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ও সম্পর্দের প্রাচুর্যের পরপরই গোনাহের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের একটি প্রাকৃতিক যোগসূত্র রয়েছে। কেননা, অধিকাংশ গোনাহের কাজ সম্পাদনের জন্যই প্রয়োজন অর্থ-সম্পদের। দুর্বল মনের অধিকারী যেসব মানুষ মুরাবিতী সাম্রাজ্যে (মাগরেবে) বসবাস করত, তারা বিভিন্ন গোনাহের চিন্তা লালন করলেও অর্থাভাবে তা করতে পারত না। কিন্তু বিশাল জগত যখন মুরাবিতীদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং অবারিত সম্পদরাজি তাদের হস্তগত হল, তখনই দুর্বল ও দুষ্ট আত্মাগুলো সক্রিয় হল এবং নানা বর্ণের বিচিত্র ধরনের ছোট-বড় অন্যায়-অনাচারে জড়িয়ে পড়তে লাগল।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, এমন কিছু সৎ মানুষের অস্তিত্বও মুরাবিতী সাম্রাজ্যে ছিল, যারা সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মোহাচ্ছন্ন হননি; বরং তারা ছিলেন নববী আদর্শ 'অভাবে সবর ও প্রাচুর্যে শোকর'-এর ধারক; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তারা ছিলেন সংখ্যায় অতি অল্প, সীমিত ব্যতিক্রম, তারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করতেন না। স্বাভাবিক রীতি হল, সম্পদ যখন অবারিত হয়ে যায়, তখন অধিকাংশ মানুষই এর মোহে আটকে যায় এবং গোনাহে জড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত নূহ আ.-এর ঘটনাপ্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন,

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا

الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۖ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾

তার সম্প্রদায়ের যে নেতৃবর্গ কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলতে

Scanned with CamScanner

লাগল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেসব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তো আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছি না; বরং আমাদের ধারণা, তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী। [সূরা হুদ : ২৭]

'যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন'– এ উক্তি দ্বারা নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের দুর্বল, সহজ-সরল ও দরিদ্র শ্রেণির জনগণ। তারাই নবী নূহ আ.-এর অনুসরণ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সকল নবী-রাসূলের ইতিহাসেই দেখা যায়, সমাজের এই শ্রেণিটিই তাদের আনুগত্য করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক দাঈ ও দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদের অনুসরণ এরাই নির্বিশেষে করবে। আর তাই গোনাহের প্রাদুর্ভাব হল সম্পদের প্রাচুর্যের প্রত্যক্ষ, প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সমকালীন আন্দালুস ও মাগরেব অঞ্চল জুড়ে অবস্থানরত অসংখ্য আলিম তখন কী করছিলেন? কোথায় ছিলেন তারা?! আসুন এবার এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর

১. বিজয়াভিযানের পতাকা আন্দোলিত থাকা সত্ত্বেও কীভাবে জনসাধারণ পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন হল?

২. প্রাজ্ঞ-বিদগ্ধ আলিমসমাজের উপস্থিতি সত্ত্বেও কীভাবে অন্যায়-অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল?

প্রকৃত বাস্তবতা হল, এই স্খলন ও পতনের দায় থেকে তৎকালীন আলিমসমাজ মোটেই মুক্ত ছিলেন না; বরং তাদের কাঁধেই এর দায়-দায়িত্বের বড় একটি অংশ বর্তায়। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই, আলিমসমাজ এ সময় নিমগ্ন ছিলেন দ্বীনের শাখাগত বিভিন্ন মাসআলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণায়; জ্ঞাতসারে উপেক্ষা করছিলেন দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদিকে। তারা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন কিছু বিষয় নিয়ে; কিন্তু পরিহার করেছিলেন তার চেয়েও অগ্রগণ্য ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়। বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় এবং উল্লেখযোগ্য কোন কল্যাণ নেই এমন অনেক বিষয়ে তারা কলম ধরেছিলেন, বিতর্ক-সভা সরগরম রেখেছিলেন এবং শাখাগত

Scanned with CamScanner

মাসআলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু একই সময় তারা এমন বিষয়াদিকে উপেক্ষা করেছিলেন, যা উপেক্ষা বা পরিহার করা কক্ষনো কোন ক্ষেত্রেই বৈধ নয়।

আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী রহ. লিখেছেন,

> আমীরুল মুসলিমীনের দরবারে ও সকাশে সেসব আলিমই উপস্থিত থাকতে পারতেন, যারা মালেকী মাযহাবের শাখাগত মাসআলাসমূহে সুগভীর জ্ঞান রাখতেন। ফলে সে যুগে মাযহাব-বিষয়ক গ্রন্থাদির বাজার সরগরম ছিল। এ দাবি পূরণেই কাজ করা হয়েছে, অন্য সব কিছু বলতে গেলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মাযহাবকেন্দ্রিক বিতর্ক-চর্চা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, এমনকি কোরআন-সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞানচর্চাও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।
>
> সমকালীন বিদগ্ধ আলিমসমাজের কেউ-ই কোরআন-সুন্নাহর খেদমতে পূর্ণ যত্নবান ছিলেন না। ইলমুল কালামের কোন বিষয় অধ্যয়ন বা আলোচনা করাকে সে যুগের কর্ণধারগণ কুফরী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমীরুল মুসলিমীনের দরবারের আলিমগণ ইলমুল কালামের সমালোচনা, ইলমুল কালামের পুরোধা মনীষীগণের নিন্দা এবং কারও মাঝে ইলমুল কালামের সামান্য সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলেও তাকে পরিহারের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তারা ইলমুল কালামকে বিদআত ও দ্বীনের নব-উদ্ভাবিত বিষয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।
>
> এই সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির অধিকাংশই আকীদাগত বিষয়ে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে আমীরুল মুসলিমীনের অন্তরে ইলমুল কালাম ও এর শাস্ত্রজ্ঞদের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি তার রাষ্ট্রে ইলমুল কালামের অধ্যয়ন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন এবং যার কাছে এ শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে, তাকে কঠিন শাস্তি প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করেন।
>
> আবু হামিদ গাযালীর গ্রন্থাদি যখন মাগরেবে পৌঁছয়, আমীরুল মুসলিমীন তা পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন; যার কাছে তার কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে, তাকে হত্যা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো কঠিন শাস্তি প্রদানের ফরমান জারী করেন এবং কঠোরতার সঙ্গে এই আইন বাস্তবায়ন করেন।[১০৯]

---

[১০৯] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৩৬।

Scanned with CamScanner

আমীর আলী বিন ইউসুফ ইমাম আবু হামিদ গাযালী রহ.-এর গ্রন্থাদি এই যুক্তিতে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যে, তা ইসলামের সঠিক ও বিশুদ্ধ চেতনার বিরোধী। অথচ ইমাম গাযালী উম্মাহর সেই ক্ষণজন্মা মনীষী, যাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধি প্রদান করা হয়েছে; যিনি ছিলেন সমকালীন যুগে মুসলিম প্রাচ্যের ফকীহকুলের শিরোমণি। আলী বিন ইউসুফ সেই গাযালীর কিতাব বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করেছিলেন, যিনি বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসে তার পিতার শাসন-অধিকারের শরয়ী বৈধতার ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং ইউসুফ বিন তাশফীন রহ. বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গকে অপসারণ ও মুরাবিতী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার এই ফতোয়ার উপরই নির্ভর করেছিলেন।

মৌলিক বিষয়াদির পরিবর্তে শাখাগত বিষয়াদি নিয়ে ওলামায়ে কেরামের নিমগ্নতার কুফল

দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি বাদ দিয়ে সে যুগের ওলামায়ে কেরাম নিমগ্ন ছিলেন শাখাগত বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণে। এ যেন গভীর সমুদ্র বাদ দিয়ে কোন শাখা নদী পাড়ি দিয়ে দূর গন্তব্যে পৌঁছার হাস্যকর প্রচেষ্টা! এভাবে কি পৌঁছা যায় গন্তব্যে? এ ধরনের প্রচেষ্টা কি কখনো কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ বয়ে আনে? আর তাই এই আত্মঘাতী কর্মপন্থার অবশ্যম্ভাবী, অবধারিত ও প্রাকৃতিক পরিণতি হিসেবে নেমে এসেছিল নিম্নোক্ত ভয়াবহ বিষয়গুলো।

ক. আলিমসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে অর্থহীন কলহ-বিবাদ

আলিমসমাজ যেমন জনসাধারণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুধাবন করেননি কিংবা করতে সক্ষম হননি, তেমনই সাধারণ জনগণও ওলামায়ে কেরামের সার্বক্ষণিক নিমগ্নতার বিষয়বস্তু জানতে পারেননি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানবজাতির মাঝে সবচে' জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তার আদর্শ লক্ষ করুন। তিনি এমন সর্বজনবোধ্য সহজ-সাবলীল ভাষায় কথা বলতেন যে, শিক্ষিত সাহাবী ও গোবেচারা বেদুঈন সকলেই নিশ্চিন্তে তার কথা বুঝতে পারত; উপলব্ধি করতে পারত নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সকলে সমানভাবে।

Scanned with CamScanner

খ. ওলামায়ে কেরামের সমাজবিচ্ছিন্নতা

দ্বীনের শাখাগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে গবেষণায় নিমগ্ন থাকায় ওলামায়ে কেরাম সমাজের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। সমাজে কী ঘটছে, সমাজের মানুষের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড কোন ধারায় কোন পথে আবর্তিত হচ্ছে, এ সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন না। তারা জানতেন না, সমাজ কোন বিপদে ও কোন অন্যায়ে আক্রান্ত এবং কোন প্রতিষেধকের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। ফলে দিনে দিনে জনসমাজ ও আলিমসমাজের মাঝের বিভেদ-গহ্বরটি গভীর ও বিস্তৃত হতে থাকে এবং মুরাবিতী আমলের শেষদিকে এক ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতার রূপ পরিগ্রহ করে।

মুরাবিতী রাষ্ট্রে দেদারসে মদের বিপণন এমনকি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই মদের উৎপাদন শুরু হল; কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করল না। যাকাত ছাড়াও জনগণের ওপর সুবিশাল অংকের করের বোঝা অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হল; কিন্তু আলিমগণ কেউ টুঁ শব্দটিও করলেন না। গভর্নরগণ জনসাধারণের ওপর জুলুম করতে লাগলেন; আলিমগণ কেউ কোন কথা বললেন না। প্রকাশ্যে নৃত্য ও বিনোদনের প্রদর্শনী চলল; বরং নারীগণ বেপর্দা নিজেদেরকে প্রদর্শন করতে লাগল; কিন্তু আলিমসমাজ বাধা দিলেন না। আল্লাহর শপথ! হিজরতে নববীর মাত্র পাঁচ শ' বছর পরের সেই সময়ে, মুরাবিতী সাম্রাজ্যের মতো শতভাগ ইসলামনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ ধরনের অবক্ষয় ও আলিমগণের নীরবতা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। মহিলারা বেপর্দা অবাধে ঘোরাফেরা করছে, আর আলিমগণ ব্যস্ত মুরজিয়া-মুআ'ত্তিলা মতবাদসহ বিভিন্ন নিষ্ফল বিষয়ের বিতর্কে এবং গর্হিত বিরোধ-বিসংবাদে। তারা মনে করতেন, মুসলিম সমাজের এখন এসব বিষয়েই নিমগ্ন থাকা কর্তব্য। অন্য সব কিছুই ছিল তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ।[১১০]

৩. কঠিন অর্থনৈতিক সংকট

মুরাবিতী শাসনকালের শেষাংশে ভাঙন ও পতনের আরও একটি কার্যকারণ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পদ ও ভূ-সম্পদের প্রাচুর্য, ইসলামী শিক্ষার বিশুদ্ধ

---

[১১০] আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ২৪১। আরও দেখুন হুসাইন মু'নিস কর্তৃক মাদ্রিদের আলমা'হাদুল মিসরী লিদদিরাসাতিল ইসলামিয়া-এর ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মুরাবিতী আমলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলীলপত্র।

Scanned with CamScanner

মর্মের অনুপস্থিতি, পাপাচার ও অন্যায় কর্মের আধিক্য, আলিমসমাজের চিন্তাগত স্থবিরতা ও সমাজবিচ্ছিন্নতা– এই সবকিছুর পর নেমে এসেছিল আরও ভয়াবহ এক সমস্যা– কঠিন অর্থনৈতিক সংকট।

৫৩২ হিজরীতে টানজা নগরীতে (Tangier) প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা সংঘটিত হয় এবং বাড়ি-ঘর, নিরাপত্তাপ্রাচীর সবকিছু বন্যার তোড়ে ভেসে যায়। প্রাণহানি ঘটে অসংখ্য মানুষের, মারা যায় প্রচুর গবাদি পশু।[১১১]

৫২৬ হিজরী হতে একটানা ৫৩১ হিজরী পর্যন্ত আন্দালুসের ফসলের ক্ষেতে চলে পঙ্গপালের ধ্বংসযজ্ঞ। এ কারণে ৫২৬ হিজরীতে কর্ডোভায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচুর মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দুর্মূল্যের বাজারে গমের মূল্য মুদপ্রতি[১১২] ১৫ দীনারে পৌঁছয়।[১১৩]

এরও পূর্বে ৫২৫ হিজরীতে কর্ডোভার শনের বাজার ও পার্শ্ববর্তী বস্ত্রের বাজারে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ৫৩৫ হিজরীতে ফেয নগরীর বাজারে আরেকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এবং একমাত্র তরি-তরকারির বাজার ছাড়া বস্ত্র, জুতা-মোজার বাজারসহ সব বাজার পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। রাতের প্রথম প্রহরে সংঘটিত এ দুর্ঘটনায় প্রচুর সম্পদ ধ্বংস হয়, দারিদ্র্যের শিকার হয় অসংখ্য মানুষ।[১১৪]

কোন কোন উৎসগ্রন্থে সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া এক দুর্ভিক্ষের আলোচনাও এসেছে, যার ফলে চাষযোগ্য ক্ষেত-খামার শুকিয়ে গিয়েছিল, ফল ও ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং প্রচুর গবাদি পশু মারা গিয়েছিল।[১১৫]

একশ্রেণির মানুষ মনে করেন, একই সময়ে পরপর সংঘটিত এ জাতীয় দুর্ঘটনা একান্তই আকস্মিক। কিন্তু আল্লাহর শপথ! এগুলো মোটেই আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়; বরং এটাই পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আল্লাহ তাআ'লার ঐশী ঘোষণার বাস্তব রূপ এবং সুন্নাতুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন রীতি। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

---

[১১১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/৯৬।

[১১২] 'মুদ' প্রাচীনকালে প্রচলিত একটি পরিমাপ একক। বর্তমান পরিমাপ অনুযায়ী এক মুদ প্রায় ৭৯৫.৬০ গ্রাম। (অনুবাদক)

[১১৩] ইবনুল কাত্তান আলমাররাকিশী, *নাযমুল জুমান*, পৃ : ২২৬-২৫২।

[১১৪] প্রাগুক্ত, পৃ : ২২২, ২৬৮।

[১১৫] দেখুন : সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুরাবিতীন*, পৃ : ২২৯।

Scanned with CamScanner

﴿ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَ

لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾

যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কল্যাণধারা উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তারা ক্রমাগত যা করে যাচ্ছিল, তার পরিণামে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। [সূরা আ'রাফ : ৯৬]

আরেক আয়াতে দেখুন আপন কওমকে উদ্দেশ্য করে নবী নূহ আ.-এর উপদেশবাণী,

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝ مَا لَكُمْ

لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴾

আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন। তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে বিলকুল ভয় পাও না? [সূরা নূহ : ১০-১৩]

বোঝা গেল, মুমিনগণ যখনই আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায়, কোরআনের বাতলে দেওয়া সুগঠিত পন্থাকে পরিত্যাগ করে, তখনই আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি বিপদে আক্রান্ত করেন। সুতরাং কখনো কোন দেশ বা সমাজে অর্থনৈতিক অঙ্গনে যদি নিম্নগামিতা ও পতন পরিলক্ষিত হয়, জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ হ্রাস পেতে থাকে, প্রতিমুহূর্ত সম্পদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও তারা জীবনধারণের ন্যূনতম অন্ন বা জীবিকানির্বাহের সম্মানজনক অর্থের ব্যবস্থা করতে না পারে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখুন, সেই দেশ ও সমাজে নিশ্চয়ই স্রষ্টার

Scanned with CamScanner

সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্কে কোন ভাটার সৃষ্টি হয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে সঠিক মানহাজ ও সরল পথ হতে বিচ্যুতি ঘটেছে। কেননা, তারা যদি তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের আনুগত্য করত, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের অন্ন ও রিযক-এ বরকত দান করতেন।

এসব ঘটনাপ্রবাহের পূর্বে ও পরে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপেই মুরাবিতী সাম্রাজ্যে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে একের পর এক কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের ঘটনা ঘটে। পূর্বে যেমন উল্লেখ করে এসেছি, ৫১৪ হিজরীতে (১১২০ খৃস্টাব্দে) কুতুনদা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বড় ধরনের পরাজয়ের শিকার হয়। এরপর ৫২৩ হিজরীতে (১১২৯ খৃস্টাব্দে) কুলাইয়া যুদ্ধেও মুসলিম বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[১১৬]

---

[১১৬] এ যুদ্ধদু'টির বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/২০৬ ও ইবনুল কাত্তান, *নাযমুল জুমান*, পৃ : ১৫২।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অষ্টম অধ্যায়
মুওয়াহহিদী শাসনামল

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও মুওয়াহহিদী আন্দোলনের অভ্যুদয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আবদুল মুমিন বিন আলী ও মুওয়াহহিদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
চির স্মরণীয় আরিকের যুদ্ধ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইকাব যুদ্ধ ... কঠিন পরাজয়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আন্দালুসের রাষ্ট্রসমূহের ধারাবাহিক পতন

সপ্তম পরিচ্ছেদ
মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত
ও মুওয়াহহিদী আন্দোলনের অভ্যুদয়

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও মুরাবিতী-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা

মুরাবিতী সাম্রাজ্য অতি দ্রুত গতিতে সুনিশ্চিত বিপর্যয় ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতনের দিকে এগিয়ে চলছিল। আর তাই তাদের অপসারণ এবং ক্ষমতার পালাবদলে তাদের পরিবর্তে ভিন্ন কোন শ্রেণির আগমন ছিল আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন বিধানের দাবি। বাস্তবেও তা-ই ঘটল। ৫১২ হিজরীতে (১১১৮ খৃস্টাব্দে) আমাজিগ (বার্বার) শাখা-গোত্র মাছ্‌মুদার মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত (Muhamed Ibn Tumart) নামক জনৈক ব্যক্তি মুরাবিতী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলেন। অবশ্য সংস্কার ও সংশোধনের নীতির ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত-এর গৃহীত পন্থা ছিল শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের গৃহীত পন্থার তুলনায় সম্পূর্ণই ভিন্ন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ৪৭৩ হিজরীতে (১০৮০ খৃস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন[১১৭] এবং মাছমুদা গোত্রের একটি দ্বীনী পরিবারে বেড়ে ওঠেন।[১১৮] নিজেকে তিনি নবী-দৌহিত্র হাসান বিন আলী বিন আবী তালিব রাযি.-এর বংশোদ্ভূত[১১৯] বলে দাবি করলেও ঐতিহাসিকগণের অগ্রগণ্য মত হল, তিনি প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বার্বার বংশোদ্ভূতই ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ৫০০ হিজরী (১১০৭ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত আপন পরিমণ্ডলেই বসবাস

---

[১১৭] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/২০১। ইবনুল আছীর লিখেছেন, 'মাহদী ৫১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আরেকটি মত হল, ৫৫ বছর বয়সে।' সুতরাং তার জন্মসন ৪৬৯ বা ৪৭৩ হিজরী। অবশ্য তার জন্মতারিখ নিয়ে আরো কিছু মত রয়েছে।

[১১৮] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৩৬।

[১১৯] আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ২৪৫ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৩৬। যাহাবী রহ. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (১৯/৫৩৯) গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি নিজেকে আলাবী-হাসানী দাবি করতেন এবং বলতেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী।

Scanned with CamScanner

করেন। তিনি ছিলেন ইলমের যথার্থ অনুরাগী। আর সে যুগের তালিবে ইলমদের রীতি ছিল, তারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশের প্রথিতযশা আলিমগণের কাছ থেকে ইলম অর্জনের জন্য ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করতেন।

এরই সূত্র ধরে মুহাম্মাদ বিন তুমার্তও ৫০০ হিজরীতে কর্ডোভা সফর করেন এবং সেখানকার আলিমগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর এতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি তার ইলমী সফর অব্যাহত রাখেন এবং মুসলিম প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। প্রথমে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় যান। এরপর যান মক্কায়। এ সময় তিনি পবিত্র হজ্বব্রতও পালন করেন এবং তৎকালীন মক্কার বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি গমন করেন বাগদাদে। সেখানে দীর্ঘ দশ বছর অবস্থান করে সমকালীন বাগদাদের নামকরা সকল ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। এটা সে সময়ের কথা, যখন বাগদাদ ছিল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, শিয়া, মু'তাযিলাসহ নানা মত ও পথের বিচিত্র সব স্রোতধারায় উত্তাল। মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত এদের সবার কাছ থেকেই অর্জন করেন বিভিন্নমুখী ইলম।

বাগদাদে দীর্ঘ দশ বছর ইলম অর্জন করার পরও মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত তার ইলমী সফর অব্যাহত রাখেন এবং কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী এরপর ইমাম আবু হামিদ গাযালী রহ. এর কাছ থেকেও ইলম অর্জন করেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এ বর্ণনাটি সঠিক নয়[১২০]। এরপর

---

[১২০] প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান এ দাবিকে খণ্ডন করে লিখেছেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক ঐতিহাসিক যে বর্ণনাটি বারবার উল্লেখ করেছেন, তার যথার্থতা কতটুকু, তা নিয়ে আসুন আমরা সামান্য আলোকপাত করি। প্রশ্ন হল- কোথায় কখন এ সাক্ষাৎ ঘটেছিল? কোন পরিস্থিতিতেই বা হয়েছিল এই সাক্ষাৎ? ইবনে তুমার্ত তলবে ইলমের উদ্দেশে ৫০০ বা ৫০১ হিজরীতে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন এবং একটি দীর্ঘ সময় আন্দালুসে এবং এরপর কিছু সময় মাহদিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়ায় কাটিয়েছিলেন। এরপর তিনি হজ্ব আদায় করার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। মক্কা থেকে তিনি বাগদাদ সফর করেন। সুতরাং প্রবল ধারণা এটাই যে, তিনি ৫০৪ বা ৫০৫ হিজরীর পূর্বে বাগদাদ পৌছেননি। অপরদিকে ইমাম গাযালী রহ. বাগদাদে মাদরাসা নিযামিয়াতে ৪৮৪ থেকে ৪৮৮ হিজরী (১০৯১-৯৫ খৃস্টাব্দ) সময়কালে অধ্যাপনা করেছেন। ৪৮৮ হিজরীতে তিনি আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ ত্যাগ করে ৪৯৯ হিজরী পর্যন্ত ব্যাপৃত দীর্ঘ সফরে বের হন। 'চিন্তার সন্ধানে ভ্রমণ' নামে খ্যাত এ সফরে তিনি দামেশক, বাইতুল মুকাদ্দাস, আলেকজান্দ্রিয়া, মক্কা ও মদীনা যিয়ারত করেন। সুতরাং স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এ বিষয়টি একেবারেই অসম্ভব যে, ৫০০ হিজরীতে মাতৃভূমি ত্যাগ করা ইবনে তুমার্ত তার ইলমী সফরের মাঝে ইমাম গাযালীর সঙ্গে বাগদাদ বা অন্য কোন শহরে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

এরপর এ সম্ভাবনাও মেনে নেওয়া যায় না যে, ইমাম গাযালী তার এ সফর শেষ করে বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের সময় এই সাক্ষাতের ঘটনা ঘটেছিল। কেননা, এ সময় ইমাম গাযালী রহ. অতি অল্প সময় বাগদাদে অবস্থান করেছিলেন এবং এরপরই নিশাপুর চলে গিয়েছিলেন। তিনি নিশাপুরে সুলতান মালিক শাহ-এর অনুরোধে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং কিছুদিন পর নিশাপুর ত্যাগ করে জন্মস্থান তুশ-এ চলে যান। ৫০৫ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে (১১১২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে) মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তুশেই অবস্থান করেন এবং ইবাদত ও লেখালেখির কাজে নিমগ্ন থাকেন।

এ আলোচনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম গাযালীর সঙ্গে ইবনে তুমার্তের সাক্ষাত-ঘটনার অসারতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়াও এই বানোয়াট গল্প বা কল্পকাহিনীর অসত্যতা আরও একটি বস্তুগত দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তা এই যে, এ দাবির বর্ণনায় এও বলা হয়ে থাকে যে, ইবনে তুমার্ত যখন ইমাম গাযালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাকে আন্দালুস ও মাগরেবে মুরাবিতী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তার কালজয়ী গ্রন্থ *'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন'* পুড়িয়ে ফেলার বিষয়টি অবহিত করেছিলেন, তখন ইমাম গাযালীর চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করতে থাকেন আর উপস্থিত তালিবে ইলমগণ আমীন আমীন বলতে থাকেন। তিনি দোয়ায় বলেন, হে আল্লাহ! তারা যেমন আমার কিতাবকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে, আপনি তাদের রাষ্ট্রকেও তেমনই ছিন্ন-ভিন্ন করে দিন। আমার রচনাকে যেমন তারা পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করেছে, তাদের সাম্রাজ্যকেও আপনি নিশ্চিহ্ন করে দিন। এরপর ইবনে তুমার্ত ইমাম গাযালীকে এই দোয়া করতে অনুরোধ করেন যে, তার মাধ্যমেই যেন মুরাবিতী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইমাম গাযালী তখন এই দোয়াও করেন।

এই ঘটনার সত্যতা মৌলিকভাবেই এ কারণে বাতিল হয়ে যায় যে, মুরাবিতী সরকার কর্তৃক ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাব পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত প্রথম প্রকাশ পায় ৫০৩ হিজরীতে আলী বিন ইউসুফের শাসনামলের শুরুর দিকে, যেমনটি ইবনুল কাত্তান রহ. উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম গাযালী রহ. শেষবার বাগদাদ ত্যাগ করে নিশাপুর যাওয়ার পর তার মৃত্যুর বছরখানেক পূর্বে এ ঘটনা ঘটে। তাহলে কোথায় কখন তার সঙ্গে ইবনে তুমার্তের সাক্ষাৎ ঘটল? কীভাবে আমরা কালের এই সুনিশ্চিত দূরত্ব সত্ত্বেও *'ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন'* গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত এই রটনাকে সত্যায়ন করব?

সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এটি একটি অবাস্তব ও অলীক কাহিনী। অত্যন্ত সুকৌশলে এ গল্পটি তৈরি করা হয়েছে, যেভাবে তৈরি করা হয়েছে আহলে বাইতের সঙ্গে তার রক্তগত সম্পৃক্তির দাবিটি। উদ্দেশ্য হল ইবনে তুমার্তের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে একটি আলোকিত বলয়ে নিয়ে আসা এবং তার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বকে দুর্বোধ্যতা ও পবিত্রতার উপাদানে উজ্জ্বল করা। এ ঘটনার জন্য ইমাম গাযালীকে বেছে নেওয়ার কারণ হল, সমকালীন মুসলিম বিশ্বে ইলমের অঙ্গনে বলুন কিংবা দ্বীন ও তাকওয়ার অঙ্গনে, সর্ববিবেচনায় ইমাম গাযালী ছিলেন সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তাই তার সঙ্গে সম্পৃক্তির অর্থই হচ্ছে, সম্পৃক্ত চরিত্রের মর্যাদা বেড়ে যাওয়া। বস্তুত এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের অনেকেই এই অলীক দাবিকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ইবনুল আছীর সুস্পষ্ট ভাষায় একে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন, সঠিক কথা হল, ইবনে তুমার্ত ইমাম গাযালীর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। ইবনে খালদূনও এ ঘটনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং একে ধারণানির্ভর বলে গণ্য করেছেন। লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ.ও একই মত পোষণ করেছেন। আধুনিক গবেষকগণও যেমন জার্মান প্রাচ্যবিদ এ. মুলার (A. Muller), প্রাচ্যবিদ ইগনাক গোল্ডজিহার (Ignác Goldziher) প্রমুখ এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করেছেন। এ সবকিছুর পাশাপাশি এ তথ্যটিও আশাকরি পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করবেন যে, ইবনে তুমার্ত তার ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ইমাম গাযালীর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মোটেও প্রভাবিত ছিলেন না। -মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৪/১৬১-৬৩।

Scanned with CamScanner

তিনি আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ৫১২ হিজরীতে (১১১৮ খৃস্টাব্দে) ফিরে আসেন আপন নীড় মাগরেবে। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন তার এই প্রত্যাবর্তনকালের বিবরণ দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,

> ইলমের টগবগে সমুদ্র ও প্রদীপ্ত তারকা হয়ে তিনি মাগরেবে প্রত্যাবর্তন করেন।[১২১]

অর্থাৎ ইসলামের নানামুখী ধারার চিন্তাধারা-সমৃদ্ধ বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা তিনি সমৃদ্ধ হন এবং বাস্তবেই সে যুগের মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট আলিমগণের কাতারে শামিল হন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে তার গৃহীত নীতি

ইরাক ও শাম থেকে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত কিছুদিন আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করে তার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালেই তিনি আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের মেহনত শুরু করেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য ও বিদগ্ধ আলিম, যেমনটি আমরা পূর্বে বলে এসেছি; কিন্তু সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের কর্মকাণ্ডে শুরু থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর পন্থা অবলম্বনকারী। এক্ষেত্রে তার কঠোরতা ছিল ভীতিকর পর্যায়ের। তাই তিনি যখন আমর-নাহীর কাজ আরম্ভ করলেন, মানুষ তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল এবং তাকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন গভর্নর তার কর্মকাণ্ডে শঙ্কিত হয়ে তাকে সেখান থেকে একপ্রকার তাড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি জাহাজে চড়ে মাতৃভূমি মাগরেবের পথ ধরলেন। জাহাজের মধ্যেও তিনি তার আমর-নাহীর কঠোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। জাহাজে মদপানে বাধা দিলেন এবং কোরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিলেন।

এসব বিষয়ে কঠোরতা করতে গিয়ে জাহাজের আরোহীদের সঙ্গে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। ক্রুদ্ধ আরোহীগণ তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। এরপর তিনি পুরো অর্ধদিন সাঁতার কেটে জাহাজের পাশে পাশে চলতে

---

[১২১] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৬।

Scanned with CamScanner

লাগলেন। অর্ধদিন শেষে তার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে আরোহীদের মনে দয়া জাগল এবং তারা তাকে জাহাজে তুলে নিল।

এ ঘটনার পর জাহাজের আরোহীদের হৃদয়ে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। মাগরেব ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতি মানুষের এই সম্মান বজায় ছিল।[১২২] এরপর তিনি গেলেন তিউনিসিয়ায়। পথে তিনি মাহদিয়া নামক একটি শহরে পৌছলেন। মাহদিয়ায় পথ চলার সময় তিনি একটি তালাবদ্ধ মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ মসজিদের রাস্তামুখী খিলানে বসে পথিকদের হালচাল দেখতে লাগলেন। যখনই তিনি গান-বাদ্যের সামগ্রী বা মদপাত্র নিয়ে কাউকে যেতে দেখছিলেন, তার কাছে গিয়ে হাত থেকে তা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলছিলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শহরবাসীর মুখে মুখে তার এই নাহী আনিল মুনকারের প্রচেষ্টার কথা ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ দলে দলে তার কাছে এসে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির গ্রন্থের দরস গ্রহণ করতে লাগল।[১২৩]

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সমাজের অন্যায়-অনাচারের আমূল পরিবর্তন চাচ্ছিলেন একমুহূর্তে-একসঙ্গে। তিনি সকল অপরাধের শিকড় মুহূর্তের মধ্যে উৎপাটন করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল, এটি সুন্নাতুল্লাহ ও জগতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন ধারার বিরোধী। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি তখন আমূল ও আকস্মিক পরিবর্তনের আহ্বান করেননি, চেষ্টাও করেননি। বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার ওপর পর্যায়ক্রমে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনি সে অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সুদ পরিত্যাগের আদেশ মানুষের অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার বিধানও পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। আরবের মানুষ ইতঃপূর্বে এ দু'টি বিষয়ের হারাম হওয়ার কথা জানত না।

খলীফায়ে রাশেদ ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.-ও এই তত্ত্বজ্ঞানটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন

---

[১২২] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ২৪৬।
[১২৩] আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৭৯।

Scanned with CamScanner

দামেশক ও তার আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-কাজ প্রচলিত ছিল। ওমর বিন আবদুল আযীযের পুত্র ন্যায়ের প্রশ্নে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি তার পিতার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সকল অন্যায়ের আমূল সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, তার পিতা ওমর বিন আবদুল আযীয এক্ষেত্রে 'ধীরে চল' নীতি অবলম্বন করেছেন। বিষয়টি পুত্রের কাছে কষ্টকর মনে হল। তাই তিনি তার পিতার কাছে গিয়ে বললেন, আব্বাজী! এখন তো আপনি সব ধরনের বিধান কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন। পুরো মুসলিম বিশ্বে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। সুতরাং আপনার কর্তব্য হল সমস্ত অন্যায়-অনাচারের আমূল সংস্কার করা এবং ইসলামকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করা। উত্তরে ওমর বিন আবদুল আযীয স্বীয় পুত্রকে যা বললেন, তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বললেন,

لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ جُمْلَةً وَاحِدَةً تَرَكُوْهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً

> বৎস! জনসাধারণকে আমি যদি এক মুহূর্তে (যাবতীয় অন্যায় ছেড়ে দিয়ে) পুরোপুরি ন্যায়ের পথে চলতে বাধ্য করি, তাহলে তারা একসঙ্গে পুরোপুরি ন্যায়ের পথ ছেড়ে দেবে।[১২৪]

কিন্তু মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত এই সুন্নাতুল্লাহ ও সুন্নাতে নববীর পথ অবলম্বন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন সবকিছুর আকস্মিক আমূল পরিবর্তন; তাও আবার অত্যন্ত কঠোর পদ্ধতিতে। অথচ আল্লাহ তাআ'লা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

> তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। [সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯]

যিনি ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমে মানবজগতে সমর্থিত, যিনি সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচে' সুগঠিত এবং সবচে' জ্ঞানী, সেই নবীজীকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আপনি যদি আল্লাহর পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও ক্রোধের সঙ্গে কাজ করতেন, তাহলে মানুষ আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তাহলে সাধারণ মানুষ যারা, তাদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের নীতি কেমন হওয়া উচিত?!

---

[১২৪] দেখুন : যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৬/৪১৯।

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও আবদুল মুমিন বিন আলী দুই বিদ্রোহী চিন্তকের সম্মিলন

বিজায়া (Béjaïa) এলাকায় অবস্থানকালে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করলেন। ইবনে তুমার্‌ত ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশে সফরের শুরুতে যে মনোবাঞ্ছা লালন করতেন, এ ব্যক্তিটিও একই মনোবাঞ্ছা লালন করছিলেন। তার নাম আবদুল মুমিন বিন আলী। প্রথম সাক্ষাতেই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তাকে তার মাতৃভূমি ত্যাগ ও বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে বিন আলী জানালেন, তিনি ইলম ও দ্বীন অন্বেষণ করছেন। তখন মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত বললেন, তুমি যা অন্বেষণ করছ, যা খুঁজে ফিরছ, তা আমার কাছেই আছে। এরপর থেকে আবদুল মুমিন বিন আলী তার সংস্পর্শে থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে লাগলেন। ইবনে তুমার্‌তের ইলমের গভীরতা ও বিশালতা আবদুল মুমিনকে অভিভূত করল। তারা উভয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এবং নিজেদের জীবনের গতিপথ এক করে নিলেন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের মৃত্যু পর্যন্ত উভয়ের একসঙ্গে পথচলা অব্যাহত ছিল; যার বিবরণ সামনে আসছে।[১২৫]

আবদুল মুমিন বিন আলী মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের কাছ থেকে ইলম অর্জন করার পাশাপাশি কঠোর পন্থায় দ্বীনের দাওয়াত প্রদান এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিও শিখে নিলেন। এরপর মাগরেব ভূমিতে উভয়ে একসঙ্গে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে আরও পাঁচজন ব্যক্তি যোগ দিল। ফলে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তসহ এই দাওয়াতী কাফেলার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল সাতজনে।[১২৬]

---

[১২৫] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ২৪৭, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ১/২২৭ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৮০। অবশ্য কারও কারও মতে আবদুল মুমিন বিন আলীর সঙ্গে ইবনে তুমার্‌তের সাক্ষাৎ হয়েছিল বিজায়া থেকে এক ফরসখ দূরে মিলালা নামক স্থানে। তৃতীয় আরেকটি মত হল, উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল ফানযারা নামক স্থানে। দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ১০০।

[১২৬] দেখুন : ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৪৯, যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*,

Scanned with CamScanner

এই অবস্থায় মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও তার সঙ্গীগণ উপলব্ধি করলেন যে, মুরাবিতী সাম্রাজ্যে অন্যায়-অনাচার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মদের প্রতি আসক্তি সারা দেশে এমনকি ইউসুফ বিন তাশফীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানী এবং ইসলামী বিশ্বের অন্যতম উপকূলীয় শহর মার্‌রাকিশে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দেখতে পেলেন, স্বয়ং গভর্নরগণ জনগণের ওপর জুলুম করছেন, জনগণের কাঁধে কঠিন করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন, অসহায় এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করছেন। তাঁরা আরও দেখতে পেলেন, সমাজে নারীদের বেপর্দা চলাফেরা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা ছড়িয়ে পড়েছে; বরং মানুষের পছন্দসই বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি স্বয়ং মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত একদিন দেখলেন, জনৈকা মহিলা একদল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেপর্দা পথে বেরিয়েছে। তাকে শাসকবর্গের মতো রাজকীয় প্রহরাও প্রদান করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন, এভাবে সৈন্যপ্রহরায় বেপর্দা পথচলা নারীটি স্বয়ং আমীরুল মুসলিমীন আলী বিন ইউসুফের ভগ্নি। তিনি তখন কঠিন ও কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেন; এমনকি কোন কোন উৎসগ্রন্থের ভাষ্যমতে, তিনি ও তার দাওয়াতী কাফেলার সদস্যগণ আমীর-ভগ্নির বাহনের মুখে আঘাত করে তাকে বাহনের পিঠ থেকে নামিয়ে দেন।[১২৭]

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও তার সংস্কার-চিন্তা

এই লাঞ্ছনাকর ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির সংস্কার ছিল অত্যাবশ্যক। আর এ চিন্তাই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে তার চিন্তাজগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তিনি তার দাওয়াতী কাফেলার ছয় সদস্যকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন এবং সবার সামনে তার সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করলেন।

তিনি তার পরিকল্পনা তুলে ধরতে গিয়ে বললেন, যেহেতু গোনাহ ও অন্যায়ের কাজ পুরো মুরাবিতী রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পাপাচারের সর্বগ্রাসী প্লাবন উঁচু টিলাকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে, সুতরাং এখন সমাধানের পথ একটিই; আর তা হল

১৯/৫৪৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/৮৩।

[১২৭] দেখুন : ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/২৩১ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৭।

Scanned with CamScanner

একেবারে গোড়া থেকে শুদ্ধি অভিযান চালানো। অর্থাৎ আমরা শাসকবর্গকে ক্ষমতার পদ থেকে অপসারণ করব। প্রথমে আলী বিন ইউসুফ ও তার গভর্নর-সেনাপতিদের দিয়ে শুরু করব, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করব। এরপর ক্ষমতা যখন আমাদের হাতে চলে আসবে, তখন আমরা কোরআন-সুন্নাহর দাবি অনুযায়ী রাষ্ট্রে সংস্কার ও পরিবর্তনে সচেষ্ট হব।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তার তারবিয়াত ও সংস্কারের পথ সংক্ষিপ্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন ইতঃপূর্বে যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বছরের পর বছর মানুষের মাঝে মেহনত করে মধ্য আফ্রিকায় সংস্কার ও পরিশুদ্ধির সুফল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তেমন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন আলী বিন ইউসুফ ও তার সঙ্গীদের অপসারণ করে প্রশাসন-ক্ষমতার অধিকারী হতে এবং এর মাধ্যমে ক্ষমতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আইনের শাসনের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দিতে ও দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে।

আমীরুল মুসলিমীন আলী বিন ইউসুফও শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় কাফিরশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। অবশ্য, দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে তিনি সীমালঙ্ঘন ও অমান্য করার অভিযোগে অভিযুক্তও ছিলেন, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। কিন্তু বৈধ শরয়ী শাসকের এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি কোনক্রমেই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও তার সঙ্গীদেরকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি দেয় না; তা তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক না কেন এবং তারা যতই উচ্চস্তরের সংযম ও অনাড়ম্বরতা, নির্মোহতা ও জ্ঞানের প্রসারতার অধিকারী হোন না কেন। বরং তাদের কর্তব্য ছিল, নতুন করে সবকিছুর সংস্কার ও সংশোধনে ব্রতী হওয়া এবং বৈধ শাসককে ইসলামের বিশুদ্ধ পথে ফিরে আসতে সহায়তা করা। তাদের কর্তব্য ছিল, মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামী তারবিয়াত প্রদান করা।

নববী জীবনের শুরুতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় তার দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রবল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন, তখন নবীজী কী সংস্কার-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করুন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত যে পরিকল্পনা

Scanned with CamScanner

করেছিলেন, নবীজী চাইলে সেই একই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি আলী বিন আবু তালিব, যুবাইর বিন আওয়াম, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ প্রমুখ সাহাবীদেরকে আদেশ করতে পারতেন, যাও, তোমরা প্রত্যেকে এক একজন কোরাইশ নেতাকে হত্যা করে এসো। এভাবে তিনি মক্কার শাসনভার নিজ হাতে তুলে নিয়ে সেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

কিন্তু যেহেতু এটি সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে 'সুন্নাতে ইলাহী' নয়, তাই নবীজী তার অনুসরণও করেননি। বরং তিনি বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে মানুষের তারবিয়াত করেছেন, তাদের আত্মা ও চিন্তার সংস্কার করেছেন। মক্কার তেরটি বছর নবীজী এই নীতিতেই দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে মদীনায় হিজরত করে সেখানেও বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত একই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে মানুষকে সংশোধন করেছেন। বদর ও তার পরবর্তী অনেকগুলো যুদ্ধের মাধ্যমে যখন মুমিনদের পথচলা মসৃণ হয়েছে এবং অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব উপদ্বীপে সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব ও প্রশাসন-দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন এবং এমন একটি অনন্যসাধারণ কাফেলা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যারা নবীজীর অবর্তমানে পুরো জগদ্বাসীর কাছে তার বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীন ও মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুখোমুখি অবস্থান

যাই হোক, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত রাষ্ট্রের আমূল সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই কঠোর নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয় ব্যতিরেকেই বলা যায় যে, তার এই চিন্তাধারা একই পরিস্থিতিতে গৃহীত নববী চিন্তাধারা তথা সঠিক ও অনুসৃত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

আমীরুল মুসলিমীন আলী বিন ইউসুফ মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও তার আন্দোলনের কথা জানতে পারলেন। কিন্তু সামান্য ক্রুদ্ধও না হয়ে তিনি প্রশান্ত বিবেক ও উদার মনের পরিচয় দিলেন এবং মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও মুরাবিতী সাম্রাজ্যের আলিমগণের মাঝে একটি বিতর্কসভা আয়োজনের পরিকল্পনা করলেন। খলীফার প্রাসাদেই বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হল। মুহাম্মাদ

Scanned with CamScanner

বিন তুমার্‌ত তার ছয় সঙ্গীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন; সাম্রাজ্যের আলিমগণও প্রধান বিচারপতি ও বিখ্যাত আলিম মালিক বিন উহাইবের নেতৃত্বে উপস্থিত হল। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে ইলমী বিতর্ক শুরু হল।

আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের এ ধরনের বিতর্ক আয়োজনের পরিকল্পনার দিকে তাকালে প্রথম দৃষ্টিতেই এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, তিনি কল্যাণ-চিন্তা ও সৎ গুণে ভরপুর একজন নীতিবান শাসক ছিলেন। তা-ই যদি না হত, তাহলে সামান্য চিন্তা করলেও অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, তিনি তো চাইলে এ ধরনের বিতর্ক-মজলিস আয়োজন করার পর মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তকে বন্দী করতে পারতেন, পারতেন তাকে হত্যা করতে কিংবা এ জাতীয় কঠিন কোন সিদ্ধান্ত নিতে। অজুহাত তো পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তার বৈধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং শাসনব্যবস্থা আমূল বদলে ফেলার ষড়যন্ত্র করছেন। আমীর আলী বিন ইউসুফের সততার বিষয়টি আরও জোরদার ও প্রতিষ্ঠিত হয় বিতর্কসভার শেষে তার গৃহীত সিদ্ধান্তে, যার বিবরণ সামনেই আসছে।

রাজদরবারে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভায় মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুরাবিতী সাম্রাজ্যের আলিমসমাজকে পুরোপুরি পরাভূত করলেন। কেননা, পূর্বে আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, তিনি তো ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর ইলমের অধিকারী বড় মাপের একজন আলিম; ইবনে খালদূন যাকে অভিহিত করেছেন 'ইলমের উত্তাল সাগর ও প্রদীপ্ত তারকা' বলে; জীবনের সুদীর্ঘ দশটি বছর যিনি বাগদাদে কাটিয়ে সমকালীন মু'তাযিলী জ্ঞানবোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে থেকে বিতর্কশাস্ত্রের দীক্ষা নিয়েছেন। তাই যেসব বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ ছিল, প্রতিটি বিষয়ে তিনি মুরাবিতী সাম্রাজ্যের ওলামায়ে কেরামকে যুক্তি-তর্কে পরাজিত করলেন। এমনকি খলীফা আলী বিন ইউসুফ যখন জানলেন যে, তার রাষ্ট্রে অন্যায়-অনাচার সীমাহীন বৃদ্ধি পেয়েছে; অথচ তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, অথবা জানলেও তা পরিবর্তন করতে পারছেন না, তখন এসব বিষয়ে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের মুখে ভয়ানক সব শাস্তির কথা শুনে তিনি ভয়ে বিতর্ক মজলিসেই কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু তার কান্না মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের মনে সামান্য দয়ার উদ্রেক করল না। তিনি ততোধিক কঠোর ও শাণিত ভাষায় আমীরুল মুসলিমীনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

মজলিসে উপস্থিত মুরাবিতী রাষ্ট্রের উযীরবৃন্দ ও আলিমসমাজ জানতেন যে, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মানুষকে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত

Scanned with CamScanner

করছেন। তাই প্রধান বিচারপতি মালিক বিন উহাইব খলীফাকে কানে কানে বললেন, আপনার উচিত এখনই এই লোককে বন্দী করে জেলে ভরা এবং এখন থেকেই কারাগারে তার অন্নের পেছনে প্রয়োজনে দৈনিক এক দীনার করে খরচ করা; নয়তো শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আপনার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করবেন; কিন্তু কোন লাভ হবে না। কিন্তু প্রধান উযীর আলী বিন ইউসুফকে এরূপ না করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত এখন আপনার মজলিসেই বসে আছে এবং তার কথা শ্রবণ করে আপনি কেঁদেছেন। এমতাবস্থায় তাকে গ্রেফতার করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না; বরং এর ফলে জনসাধারণের মাঝে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া তার পক্ষে আছে মাত্র ছয়জনের একটি ক্ষুদ্র দল; আর আপনি বিশাল মুরাবিতী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। সুতরাং এ লোককে আপনার ভয় কিসের?!

আলী বিন ইউসুফ প্রধান বিচারপতি ও প্রধান উযীর উভয়ের পরামর্শ তুলনা করে দেখলেন। তিনি ভাবলেন, কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত এই মহান আলিমকে গ্রেফতার করা হলে এবং কারাগারে আটকে রাখা হলে তিনি আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। তাছাড়া মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তো এখনও কল্যাণের পথেই আছেন। সবদিক বিবেচনা করে তিনি মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার আশা, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও তার দাওয়াতী কাফেলার সঙ্গীরা যদি শ্রেয়তর পন্থায় তাকে সহায়তা করেন, তাহলে তিনি আবার দেশকে সংশোধনের পথে নিয়ে আসতে পারবেন।[১২৮] কিন্তু ...!

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ও জামাআতুল মুওয়াহহিদীন

আমীর আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের প্রাসাদ থেকে বের হয়েই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত রাজধানী মার্‌রাকিশ ছেড়ে পাশের শহরে তার জনৈক বন্ধুর বাড়িতে উঠলেন। এর কিছুদিন পর তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে (এটলাস পর্বতমালার) এক গহীন পাহাড়ী এলাকায় চলে গেলেন এবং সেখানকার টিনমাল (Tinmal) নামক একটি গ্রামে আশ্রয় নিলেন। অল্প কয়েক বছর

---

[১২৮] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৫১, ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/২৩১ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৭।

Scanned with CamScanner

পরই এ জনপদ নতুন এক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গৃহীত হবে, যার প্রতিষ্ঠাতা হবেন এই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ।[১২৯]

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত ব্যক্তিজীবনে কঠোর সাধনা করতেন। তিনি তার যাযাবর জীবনে নিজের সঙ্গে একটি ছড়ি ও পানি পান করার জন্য চামড়ার ছোট একটি মশক ব্যতীত আর কিছুই রাখতেন না। আহার্যও গ্রহণ করতেন অতি অল্প। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অগাধ ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী। তার এসব গুণের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই ছোট এই জনপদের মানুষেরা তার পাশে জড়ো হয়ে গেল এবং তার নসীহত শুনতে লাগল। যেহেতু মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত অন্য সব এলাকার মতো এই জনপদেও পাপাচারের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার কর্থাবার্তায় প্রভাবিত হল। এরপর তিনি তার চারপাশে একটি দল গঠনে সচেষ্ট হলেন। প্রথমে একেবারেই ছোট্ট পরিসরে গড়ে ওঠা নবগঠিত এ দলটির নাম তিনি রাখলেন 'জামাআতুল মুওয়াহহিদীন' বা একত্ববাদীদের দল।[১৩০] এই নামকরণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল যে কতটা ভয়াবহ ছিল, তা আমরা কিছুদূর সামনে অগ্রসর হলেই জানতে পারব।

আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী টিনমালে ইবনে তুমার্‌তের দাওয়াতী কার্যক্রম ও মানুষের মাঝে তার তারবিয়াতী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখপূর্বক লিখেছেন,

> এখান থেকেই তার দাওয়াতী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এখানেই তার সমাধি অবস্থিত। তিনি যখন এখানে আগমন করেন, তখন মুছাদামা গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার পাশে জড়ো হয়। তিনি তাদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং কল্যাণের পথে আহ্বান করেন। প্রথম দিকে তিনি নেতৃত্ব বা শাসনক্ষমতা লাভের কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তিনি মুছাদামা গোত্রের মাতৃভাষায় আকীদা বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন সে ভাষার সমকালীন বিশুদ্ধভাষীদের একজন।
>
> মানুষ যখন মাতৃভাষায় এসব আকীদার কথা পাঠ করল এবং মর্ম উপলব্ধি করল, সবার মাঝে তার শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পেল, সবার অন্তরে

---

[১২৯] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৫০ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৪৫৫।

[১৩০] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৫১।

Scanned with CamScanner

তার ভালোবাসা সংক্রমিত হল এবং সবার দেহ-প্রাণে তার আনুগত্য মিশে গেল। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত যখন দেখলেন যে, এদের ওপর আস্থা রাখা যায়, তখন তিনি তাদেরকে তার আন্দোলনের কর্মী হওয়ার আহ্বান জানালেন। অবশ্য প্রথম দিকে তার আন্দোলন ছিল কেবল আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার-নির্ভর। তিনি তাদেরকে রক্তপাত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন।

এভাবেই চলল কিছুদিন। এরপর তিনি যাদের মেধা-মস্তিষ্ক সংশোধন করেছেন, তাদেরকে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করার এবং বিভিন্ন গোত্র-প্রধানদের তাদের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তার অনুসারীদের মাঝে ইমাম মাহদীর আলোচনা করা আরম্ভ করলেন এবং তাদেরকে ইমাম মাহদীর বিষয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী করে তুললেন। তিনি হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিক্ষিপ্ত ইমাম মাহদী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করে তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। তার অনুসারীদের মনে যখন ইমাম মাহদীর ফযীলত ও মর্যাদা, নসব ও বংশপরিচয় এবং বিবরণ ও গুণাবলি বদ্ধমূল হয়ে গেল, তখন তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করে বললেন, আমিই সেই প্রতিশ্রুত 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ'।

তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নিজের একটি বানোয়াট বংশতালিকা তৈরি করে তার অনুসারীদের মাঝে প্রচার করলেন এবং নিজেকে নিষ্কলুষ ও পাপমুক্ত দাবি করে ঘোষণা করলেন, 'আমি নিষ্পাপ মাহদী'। এ সম্পর্কে তিনি অনেক হাদীস প্রচার করতে লাগলেন। ফলে তার অনুসারীদের মনে এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মাহদী।

এরপর তিনি তার হাত প্রসারিত করে দিলে মানুষ দলে দলে তার হাতে বাইআত হতে লাগল। তিনি বললেন, নবীজীর হাতে তার সাহাবীগণ যেসব বিষয়ের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সেসব বিষয়ে বাইআত করে নিচ্ছি। এরপর তিনি তার অনুসারীদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি গ্রন্থ হল– আআ'যযু মা ইউত্বলাবু (সবচে' কাঙ্ক্ষিত সম্পদ) ও আ'কাইদু ফী উসূলিদ দীন (দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি

Scanned with CamScanner

সম্পর্কিত কিছু আকীদা-বিশ্বাস) । অধিকাংশ আকীদাগত বিষয়ে তিনি আকীদার ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ.-এর অনুসারী ছিলেন। তবে 'সিফাতে বারী তাআ'লা' বা আল্লাহর জন্য গুণাবলি সাব্যস্তকরণের মাসআলাসহ অল্প কিছু মাসআলায় তিনি মু'তাযিলীদের মতানুসারী ছিলেন এবং আল্লাহর জন্য গুণাবলি সাব্যস্তকরণকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি শিয়া মতবাদের কিছু কিছু বিশ্বাস অন্তরে লালন করতেন। তবে তা মানুষের সামনে কখনো প্রকাশ পায়নি।[১৩১]

এভাবে দিনে দিনে মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর তখনই প্রকাশ পেতে লাগল তার আকীদাগত মারাত্মক সব ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি। তিনি যেহেতু শাম, বাগদাদ, মক্কা, মিশরসহ সমকালীন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুন্নী, শিয়া, মু'তাযিলীসহ নানা স্রোতধারার অসংখ্য আলিম থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন, তাই তার থেকে বিভিন্নমুখী আকীদায় মিশ্রিত এক বিচিত্র মতধারা প্রকাশ পেল। তার এই বিচিত্র ও মিশ্রিত আকীদার কয়েকটি বিচ্যুতি লক্ষ করুন।

১. নিষ্কলুষতার দাবি

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র সর্বসম্মত মত হল, একমাত্র নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ নিষ্কলুষ ও পাপমুক্ত নন। তারা নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কারও জন্য 'ইসমাত' বা নিষ্কলুষতা সাব্যস্ত করাকে বৈধ মনে করেন না। এমনকি আবু বকর রাযি., ওমর রাযি., ওসমান রাযি., আলী রাযি.-সহ যেসব বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'হ নবীদের জন্য স্বতন্ত্র এই বিশেষণ সাব্যস্ত করেন না।[১৩২]

মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত নিজেকে নিষ্কলুষ দাবি করে মূলত ভ্রান্ত দ্বাদশ রাফেযী সম্প্রদায়ের মতাদর্শকেই অনুসরণ করেছেন, যারা নিজেদের ইমামদের সম্পর্কে নিষ্কলুষতার দাবি করে থাকে। দ্বাদশ রাফেযী সম্প্রদায়ের দাবি হল, তাদের ইমামগণ কবিরা গোনাহ, সগীরা গোনাহ এমনকি বিস্মৃতির ত্রুটি

---

[১৩১] আবদুল ওয়াহিদ মাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৫৪।

[১৩২] দেখুন : ইবনে তাইমিয়া, *মিনহাজু আহলিস সুন্নাহ*, ৭/৫৯।

Scanned with CamScanner

থেকেও পবিত্র। তারা আরও দাবি করে, ইমাম হচ্ছেন নবীর ন্যায়; তিনি অবশ্যই শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের দোষ-ত্রুটি ও পাপাচার থেকে পবিত্র হবেন এবং বিস্মৃতি ও অসতকর্তা থেকেও পবিত্র হবেন।[১৩৩]

অদ্রূপ মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে, তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বারংবার নিজেকে নিষ্কলুষ বলে দাবি করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি মারাত্মক আকীদাগত বিচ্যুতি। কেননা, নিজের ক্ষেত্রে বা অন্য কারও ক্ষেত্রে নিষ্কলুষ ও পাপমুক্ত বলে ঘোষণা করার অপরিহার্য দাবি হল তার প্রতিটি কথার প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যক হওয়া। সুতরাং মুখে নিজেকে নবী বলে দাবি করা না হলেও প্রকারান্তরে কিন্তু এর মাধ্যমে নবীসুলভ ক্ষমতার দাবি করা হচ্ছে।

২. মুরাবিতীদের প্রতি 'মুজাস্‌সিমা' হওয়ার অপবাদ আরোপ

মুরাবিতী সাম্রাজ্যের কর্ণধার ও আলিমগণ আল্লাহর জন্য আল্লাহর শান-উপযুক্ত সিফাত ও গুণাবলি সাব্যস্তকরণের মতবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত এক্ষেত্রে মু'তাযিলী চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্তকরণকে অস্বীকার করেন। এটি একটি দীর্ঘ ও তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় বিধায় আমরা এর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। সারকথা হল, যেহেতু মুরাবিতীগণ আল্লাহর জন্য সিফাত সাবস্তকরণে বিশ্বাসী ছিল, তাই মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত দাবি করলেন যে, মুরাবিতীরা 'মুজাসসিমা' বা 'দেহবাদী' সম্প্রদায়ভুক্ত। আর এ দাবির অনিবার্য দাবিরূপেই তিনি মুরাবিতীদের কাফির ঘোষণা করলেন এবং দাবি করলেন যে, আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীন, তার গভর্নর ও রাজদরবারের

---

[১৩৩]. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালী রহ. রচিত *'ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ'* (فضائح الباطنية), পৃ : ১৪২ এবং শিয়াদের ধর্মীয় নেতা খোমেনীর লিখিত *'আলহুকূমাতুল ইসলামিয়া'* (الحكومة الإسلامية), পৃ : ৫২। প্রসঙ্গত এক্ষেত্রে খোমেনীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করাও সঙ্গত হবে। তিনি বলেছেন, আমাদের ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় একটি আকীদা হল, আমাদের ইমামগণের এমন সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে, যা কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরেশতা বা প্রেরিত নবীও লাভ করতে পারেননি। আমাদের কাছে যেসব রেওয়ায়েত ও হাদীস বিদ্যমান আছে, তার দাবি হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাদের মহান ইমামগণ এই জগত সৃষ্টির পূর্বে নূর ছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে আপন আরশের পরিবেষ্টনকারীরূপে নির্বাচিত করেছিলেন এবং তাদের জন্য এমন নৈকট্য ও মর্যাদা রেখেছেন, যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

Scanned with CamScanner

আলিমগণ, তার প্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং যারা তাদের শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করে– সকলেই কাফির ।[১৩৪]

ভেবে দেখুন, মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের এই দাবির মর্ম ও উদ্দেশ্য কত ভয়াবহ! তিনি যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন, সেই রাষ্ট্রের শাসকবর্গকেই তথা গোটা মুরাবিতী সাম্রাজ্যকেই কাফির সাব্যস্ত করেছেন, যে মুরাবিতী সাম্রাজ্য তৎকালীন পুরো মাগরেব ও আন্দালুস জুড়ে বিস্তৃত ছিল ।

তিনি তার অনুসারীদের বলতেন, তোমরা তাওহীদ ও নির্ভেজাল একত্ববাদের শিক্ষায় মনোনিবেশ কর । কেননা, তাওহীদই হল তোমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি । সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার জন্য সাদৃশ্য, অংশীদারিত্ব, দিক, সীমা, আকার ইত্যাদি ত্রুটি সাব্যস্তকরণকে অস্বীকার কর । যে আল্লাহকে কোন দিক বা স্থানের প্রতি সম্বন্ধ করল, সে তো আল্লাহর জন্য দেহ-কায়া সাব্যস্ত করল । আর দেহ-কায়া সাব্যস্ত করার অর্থ আল্লাহকে মাখলুকের কাতারে গণ্য করা । আর আল্লাহকে মাখলুকের কাতারে গণ্যকারী ও প্রতিমাপূজারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ।[১৩৫]

নাম ও গুণাবলি সাব্যস্তকরণ মাসআলাতে মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত মু'তাযিলী চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য বা সাচুর্য সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা রাখে এমন যাবতীয় নাম-গুণাবলিসহ সবকিছুকে অস্বীকার করেছেন; এমনকি আল্লাহর জন্য সেসব নাম ও গুণাবলির সাবস্তকরণ কোরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত থাকলেও । এ কারণেই তিনি তার অনুসারীদের নাম রেখেছেন 'মুওয়াহহিদীন' । কেননা, তার ধারণামতে একমাত্র তারাই আল্লাহর জন্য সিফাতের অস্বীকৃতিপূর্বক একত্ববাদের বিশ্বাসধারী । তদ্রূপ তিনি তার অনুসারীদের 'মুমিনীন' বলে ডাকতেন এবং বলতেন, ভূপৃষ্ঠে তোমাদের মতো সঠিক অর্থে মুমিন আর কেউ নেই ।[১৩৬]

---

[১৩৪] দেখুন : যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৫৫০ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৭ ।

[১৩৫] ইবনে তুমার্ত, *আ'যযু মা ইউতলাবু*, পৃ : ২০৪ । (সূত্র: আলী সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুওয়াহহিদীন*, পৃ : ৪১)

[১৩৬] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৫৫ ।

Scanned with CamScanner

৩. মুরাবিতীদের হত্যা করার বৈধতা দান

মুওয়াহহিদীন ব্যতীত অন্যদের কাফির ঘোষণা করার অনিবার্য দাবিরূপে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুরাবিতীদের হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করেন এবং তার অনুসারীদের মুরাবিতীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মুরাবিতীদের হত্যায় কোন গোনাহ নেই; বরং তাদের হত্যা করলে প্রচুর সাওয়াব পাওয়া যাবে।[১৩৭] এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের চরিত্রের আরও একটি দিক প্রকাশিত হয়। রক্তপাতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শিথিল মনোভাবসম্পন্ন। এটি হল ভ্রান্ত খারেজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তার ইলম অর্জনের সফরে কিছু খারেজী আলিমের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুরাবিতী সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস করে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। এর জন্য যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি রাজী ছিলেন। তাই তিনি মুরাবিতীদের রক্ত-জান-মাল সকলের জন্য বৈধ ঘোষণা করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তার এই নীতি সকল পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাগ্রহণকে বৈধতা দান করেছিল। তাই তার দাবিকৃত মূলনীতির প্রতি যার বিশ্বাসের ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ হত, সে এমনকি তার অনুসারী হলেও তাকে হত্যা করতে তিনি সামান্য দ্বিধা করতেন না। ইবনে তুমার্‌ত তার এই হত্যাযজ্ঞের নাম দিয়েছিলেন 'পরিশুদ্ধি' বা 'বিচ্ছিন্নকরণ'। অর্থাৎ তার অনুসারীদের মধ্য থেকে কারা প্রকৃত ও খাঁটি অনুসারী এবং কারা চাটুকার, বিরোধী ও কপট বিশ্বাসী তা নির্ণয়পূর্বক বিচ্ছিন্নকরণ। নিজের দলকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে যাদের 'ঈমানের' ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ হত, তাদেরকেই তিনি নির্দ্বিধায় হত্যা করার আদেশ দিতেন।[১৩৮]

এটি একটি সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল মানুষের জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা। আর এই অপরাধী ইসলামের

---

[১৩৭] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬০ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৮।

[১৩৮] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৯/১৯৯ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৮।

Scanned with CamScanner

নামে যা করেছেন, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহর এমন বান্দাদের প্রতি অন্যায় সীমালঙ্ঘন, যাদের প্রাণের ওপর আঘাত হানা আল্লাহ তাআ'লা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তার এই কাজ শরীয়তের সুস্পষ্ট বিকৃতি এবং সজ্ঞানে করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا﴾

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গযব নাযিল করবেন ও তাকে লানত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। [সূরা নিসা : ৯৩]

হাফিয ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

যারা এই গর্হিত অপরাধ করবে, আলোচ্য আয়াত তাদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা এবং জোরদার ভীতিপ্রদর্শক। এ অপরাধকে একাধিক আয়াতে শিরকের মতো (অমোচনীয়) পাপের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ﴾

এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে বধ করে না। [সূরা ফুরকান : ৬৮]

আল্লাহ তাআ'লা আরও ইরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ... وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾

(তাদেরকে) বল, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা-কিছু হারাম করেছেন, আমি তা (তোমাদেরকে) পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না ... আর আল্লাহ

Scanned with CamScanner

যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর। [সূরা আনআম : ১৫১]

আর মানবহত্যার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস তো অনেক। তারই একটি হল,

«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»

পুরো পৃথিবীর পতনও একজন মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করা অপেক্ষা আল্লাহ তাআ'লার কাছে লঘুতর।[১৩৯]

(তাফসীরে ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতি শেষ হল)[১৪০]

মানবহত্যা অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ। যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলি ও মানবিক অনুভূতি-বিবর্জিত ব্যক্তিই কেবল একে বৈধ মনে করতে পারে।

ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. আপন আপন সনদে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِه الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

কোন মুসলমান ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, তিনটি কারণের কোন একটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) বিবাহিত ব্যাভিচারী, প্রাণের বদলে প্রাণ এবং আপন দ্বীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।[১৪১]

সাইয়েদ কুতুব রহ. লিখেছেন,

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা কেবল একটি মানবহত্যাই নয়; বরং তা মুসলমানদের মাঝে আল্লাহ তাআ'লা যে অতি প্রিয়, সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, তাকেও হত্যা করার

---

[১৩৯] *জামে' তিরমিযী*, হাদীস নং ১৩৯৫ ও *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ৩৯৮৭।

[১৪০] ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম*, ২/৩৭৬।

[১৪১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৮৪ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৬৭৬।

Scanned with CamScanner

নামান্তর। এ অন্যায় ঈমান ও আকীদাকে অবজ্ঞা ও পরিত্যাগ করারই নামান্তর। এ কারণেই (কোরআন-সুন্নাহর) অনেক স্থানে একে শিরকের অন্যায়ের সাথে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। (বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী ও রঈসুল মুফাসসিরীন) ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ অনেকের মতে, মানবহত্যার গোনাহের কোন তাওবা নেই। অবশ্য, অন্য অনেকে তাওবাকারী ঘাতকের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার অবকাশ প্রমাণে নিম্নোক্ত আয়াতের আশ্রয় নিয়েছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে-কোন বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। [সূরা নিসা : ৪৮]

এই দ্বিতীয় মত অবলম্বনকারীগণ হত্যা-অপরাধের শাস্তি প্রসঙ্গে আয়াতে বর্ণিত 'খুলূদ' বা চিরস্থায়িত্ববাচক শব্দকে রূপকার্থে 'দীর্ঘকাল অবস্থান' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। (সাহাবায়ে কেরামের মহান জামাত) যারা ইসলামের প্রথম শিক্ষাঙ্গনে (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সঠিক ইসলামী চেতনার) দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের চোখের সামনে এমন অনেক মুসলমানকে চলাফেরা করতে দেখেছেন, যারা ইসলামপূর্ব যুগে তাদের মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা বা ভাই-ভগ্নিকে হত্যা করেছিল। তাদের অনেকের মনেই তখন মানবিক স্বভাব-দাবি অনুযায়ী নানা ধরনের তিক্ততা তরঙ্গায়িত হত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাদের কেউ-ই তাদের নিকটজনের হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার কল্পনা-পরিকল্পনা করেননি। না এরূপ কোন পরিকল্পনা তারা একবারের জন্যও করেছেন, না কঠিন থেকে কঠিনতর ভাবাবেগ, মানসিক পীড়া ও তিক্ততার মুহূর্তেও এরূপ কোন চিন্তা তাদের মনে জাগ্রত হয়েছে। বরং হত্যা-চিন্তা দূরে থাক, ইসলামপ্রদত্ত তাদের সামান্য কোন হকও তারা হ্রাস করার চিন্তা করেননি।[১৪২]

[১৪২] সাইয়িদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, ২/৭৩৬।

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত নামের এই প্রতারক অপরাধী অন্যায় রক্তপাতের ন্যায় যে চরম গর্হিত অপরাধকে বৈধ ঘোষণা করেছেন, তা সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা আবারও ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় ফিরে আসছি।

এ তো গেল তার মুরাবিতী হত্যার বৈধতাদানের প্রসঙ্গ। আর তার 'পরিশুদ্ধি অভিযান' যা সম্পর্কে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ হল, এ অপরাধটি করার জন্য তিনি তার মতাদর্শের অনুসারী জনৈক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ বিন মুহসিন ওয়ানশারীশি-এর সহায়তা নিয়েছিলেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি এই ব্যক্তিকে 'বাশীর' বা বার্তাবাহক উপাধি দিয়েছিলেন। নিজের গোপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তিনি এই পাপিষ্ঠকে আদেশ করেছিলেন, সে যেন নিজের কোরআনের হাফিয ও ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী হওয়ার বিষয়টি গোপন করে এবং মানুষের সামনে নিজেকে এমন একজন পাগল হিসেবে উপস্থাপন করে, যার মুখ দিয়ে সারাদিন লালা ঝরে পড়ে।

হাফিয যাহাবী রহ. লিখেছেন,

> ৫১৯ হিজরীতে একদিন মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত জনতার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা তো জান যে, বাশীর (অর্থাৎ ওয়ানশারীশি) একজন নিরক্ষর মানুষ; এমনকি সে বাহনজন্তুর ওপর বসে থাকতেও পারে না। এখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে তোমাদের যাবতীয় সুপ্ত বিষয়ে অবগত করে তোমাদের জন্য বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআ'লার এক নিদর্শন। সে পুরো কোরআন মুখস্থ শোনাতে পারে, বাহনজন্তুতে চড়তে পারে। এরপর মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তাকে আদেশ করলেন, পড়। সে চারদিনে পুরো কোরআন শরীফ শুনিয়ে দিল। এরপর সে মানুষের সামনে ঘোড়ায় চড়ে দক্ষ হাতে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়ে দিল। মানুষ তার এই বিস্ময়কর দক্ষতা (!) দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল এবং নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে বাস্তবেই তাকে আল্লাহর এক নিদর্শন হিসেবে গণ্য করল। এরপর মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সবার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদু'টি তেলাওয়াত করলেন,
>
> ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾
>
> আর তা এই জন্য যে, আল্লাহ অপবিত্র (লোকদের)-কে পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেবেন। [সূরা আনফাল : ৩৭]

Scanned with CamScanner

﴿مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার; কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান। [সূরা আলে-ইমরান : ১১০]

এরপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ-প্রেরিত এই বার্তাবাহক ইলহামপ্রাপ্ত; সে তোমাদের সকলের মনের গোপন অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আর তোমাদের নবী বলেছেন, নিশ্চয়ই এই উম্মতের মাঝে কয়েকজন মুহাদ্দাস (যাদের অন্তরে সঠিক কথা ইলহাম হয়) ব্যক্তি আছেন; ওমর তাদের একজন[১৪৩]। আমাদের সঙ্গে এমন কিছু সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং তাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এরপর মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের নির্দেশে মুছাদামা গোত্র অধ্যুষিত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোষণা করা হল, যারা ইমাম (মাহদী)-এর আনুগত্য করে, তারা যেন চলে আসে। ঘোষণা শুনে তার অনুসারীরা ছুটে এল। তাদের সবাইকে 'বাশীর'-এর সম্মুখে পেশ করা হল। সে কিছু লোককে ডান দিকে যেতে বলল এবং তাদেরকে জান্নাতী বলে সাব্যস্ত করল; আর কিছু লোককে বাম পাশে যেতে বলল। এরপর সে বলল, এরা পূর্ণ মুমিন নয়; বরং সংশয়গ্রস্ত। এরপর সে তাদের মধ্য হতে কয়েকজনকে আলাদা করে বলল, এরা গতরাতে তাওবা করেছে। সুতরাং তাদেরকে ডানপাশের দলে পাঠানো হোক। লোকগুলোও স্বীকার করল যে, বাস্তবেই তারা গতরাতে তাওবা করেছে। ফলে উপস্থিত লোকদের 'বাশীর'-এর প্রতি বিস্ময়ের সীমা রইল না। এরপর বামপাশের লোকদের ছেড়ে দেওয়া হল। অন্যরাও জানত যে, তাদের পরিণতি হত্যা। তাই তাদের একজনও পালাল না, পালানোর চেষ্টাও করল না। এভাবে যখন অনেক লোক জমা হল, মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের নির্দেশে তাদের আত্মীয়স্বজনরাই

---

[১৪৩] হাদীসটির মূল পাঠ এই,

«لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، فَإِنَّه عُمَرُ»

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি মুহাদ্দাস হন, তবে সে ব্যক্তি ওমর। (*বুখারী শরীফ*, হাদীস নং ২৩৯৮)

Scanned with CamScanner

তাদেরকে হত্যা করল; এমনকি ভাই তার আপন ভাইকে হত্যা করতেও দ্বিধা করল না।[১৪৪]

ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর রহ. তার *'আলকামিল ফিত তারীখ'* গ্রন্থেও এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

ওয়ানশারীশি গোপনে নিয়মিত কোরআন পাঠ করত এবং মানুষের গোপন বিষয়াদি জানার চেষ্টা করত। কিন্তু জনসাধারণ কেউ তা জানত না। যখন তার বয়স উনিশ হল, এদিকে ইবনে তুমার্‌ত পাহাড়বাসী কিছু জনসাধারণের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তখন একদিন তিনি (মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত) ফজর নামাযের উদ্দেশে বের হলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তার মেহরাবের এক কোণে সুন্দর পোশাক পরিহিত ও সুগন্ধিতে সুবাসিত জনৈক ব্যক্তি বসে আছে। মাহদী (ইবনে তুমার্‌ত) তাকে না চেনার ভান করে বললেন, কে এখানে? উপস্থিত ওয়ানশারীশি উত্তর দিল, আমি আবু আবদুল্লাহ ওয়ানশারীশি। মাহদী তাকে বললেন, তোমাকে দেখে বেশ আশ্চর্য লাগছে! এরপর সে নামায পড়ল। নামাযের পর এলান করা হলে সকলে সমবেত হল। তখন মাহদী সবাইকে বললেন, এই লোক দাবি করছে যে, সে-ই ওয়ানশারীশি। তোমরা একটু যাচাই করে দেখ। সূর্যের আলোতে যখন চারদিক ফর্সা হল, সবাই তাকে চিনতে পারল। এরপর মাহদী তাকে বললেন, তোমার বিষয়টা কী, একটু খুলে বল। ওয়ানশারীশি উত্তর দিল, গতরাতে আমার কাছে আসমান থেকে একজন ফিরেশতা এসেছিলেন। তিনি আমার কলবকে ধৌত করেছেন এবং আমাকে কোরআন, (হাদীসগ্রন্থ) মুআত্তা ও অন্যান্য বিভিন্ন ইলম ও হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। এ কথা শুনে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সবার সামনে কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি বললেন, আমরা তোমাকে পরীক্ষা করব। উত্তরে ওয়ানশারীশি বলল, অবশ্যই করুন।

তাকে কোরআনের যেখান থেকেই প্রশ্ন করা হল, সে চমৎকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে সেখান থেকে পড়ে শোনাল। এরপর 'মুআত্তা মালিক'সহ ইলমুল ফিকহ ও ইলমুল উসূলের বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে প্রশ্ন করা হলে সে অনর্গল উত্তর দিয়ে দিল। মানুষ তার এই 'দক্ষতা' দেখে মুগ্ধ

[১৪৪] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৫৪৬।

Scanned with CamScanner

হয়ে গেল এবং তাকে 'বিশেষ কিছু' ভাবতে শুরু করল। এরপর মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সবাইকে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তো আমাকে এক নূর দান করেছেন; এর মাধ্যমে আমি আমার অনুসারীদের মধ্যে কারা জান্নাতী ও কারা জাহান্নামী, তা নির্ণয় করব। আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা জাহান্নামীদের হত্যা করবে এবং জান্নাতীদের ছেড়ে দেবে। আর অমুক স্থানে অবস্থিত কূপটিতে আল্লাহ তাআ'লা কয়েকজন ফিরেশতা প্রেরণ করেছেন; তারা আমার এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।

এরপর মাহদী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই কূপটির কাছে গেলেন। মাহদী কূপটির মুখের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথমে নামায পড়লেন। এরপর (উচ্চস্বরে) বললেন, হে আল্লাহর ফিরেশতাগণ! আবু আবদুল্লাহ ওয়ানশারীশি তো এমন এমন দাবি করছে। তখন কূপের ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ ভেসে এল, সে সত্য বলেছে।

বাস্তবে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত আগেই এ উদ্দেশ্যে তার বিশ্বস্ত কিছু লোককে কূপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। কূপ থেকে আওয়াজ ভেসে আসার পর মাহদী বললেন, এই কূপটি অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময়; এখানে আল্লাহর ফিরেশতাগণ অবতরণ করেছেন। সুতরাং এর মধ্যে কোন প্রকার ময়লা বা নাপাকী যেন না পড়তে পারে, এজন্য এর মুখ বন্ধ করে দেওয়াই কল্যাণকর হবে। তার কথা শোনামাত্র উপস্থিত জনগণ পূর্ণ উদ্যমে এই 'নেক কর্মে' ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মাটি ও পাথর ফেলে কূপের মুখ (মানুষের মুখ?!) চিরতরে বন্ধ করে দিল। এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তার এই গোপন দুরভিসন্ধি ফাঁস হওয়ার পথ বন্ধ করে এর সাক্ষীদেরকে চিরতরে শেষ করে দিলেন। এরপর পাহাড়বাসীদের মাঝে এলান করা হলে সবাই শুদ্ধি অভিযানের ময়দানে উপস্থিত হল। যাদের ব্যাপারে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের কোন রকম আশঙ্কা ছিল, তাদের কেউ সামনে আসলেই ওয়ানশারীশি বলত, সে জাহান্নামী। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাহাড় থেকে ফেলে মেরে ফেলা হত। আর সহজ-সরল যেসব যুবকের দিক থেকে ভবিষ্যতে কোন প্রকার অবাধ্যতার আশঙ্কা নেই, তাদেরকে দেখলে ওয়ানশারীশি বলত, এই ব্যক্তি জান্নাতী। তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। এভাবে সেই শুদ্ধি অভিযানে সত্তর হাজার মানুষকে হত্যা করা

Scanned with CamScanner

হয়েছিল। এর মাধ্যমে ইবনে তুমার্‌ত ভবিষ্যতের জন্য নিজের ও তার অনুসারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।[১৪৫]

দু' দু'জন ঐতিহাসিকের বরাতে জানা গেল নিজের অনুসারীদের সঙ্গে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের আচরণ কেমন ছিল। সুতরাং ভেবে দেখুন, মুরাবিতীদের সঙ্গে তার আচরণ কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারে?!

তার সম্পর্কে এ ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আরও অনেক ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তিনি মাঝে-মধ্যে গাইব ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী হওয়ার ভাবও প্রকাশ করতেন। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার এই দুঃসাহসের পেছনে বড় একটি শক্তি ছিল তার প্রচুর সহযোগী ও অনুসারীবৃন্দ; তেমনই তার প্রখর ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

ঐতিহাসিক মার্‌রাকিশী রহ. তার এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা তার এসব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

> আমার আস্থাভাজন জনৈক ব্যক্তি যিনি নিজে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তকে দেখেছেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত সাহাবায়ে কেরামের মতো মানুষকে মদপানের জন্য জুতা ও খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করতেন। তাকে দেখেছেন এমন আরেকজন আমাকে জানিয়েছেন, একবার তার সম্মুখে জনৈক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলে তিনি তার ওপর হদ প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন। তখন ইউসুফ বিন সুলাইমান নামক মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের জনৈক বিশিষ্ট সহযোগী দরখাস্ত পেশ করে বলল, (এ লোকটির ওপর হদ প্রয়োগ করার পূর্বে) যদি আমরা তাকে শাস্তি দিয়ে তার মুখ থেকে বের করতে পারি যে, সে কোথা থেকে মদ পান করেছে, তাহলে আমরা এ অপরাধকে সমূলে উৎপাটন করতে পারব। তার কথা শুনে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত না শোনার ভান করে চুপ করে রইলেন। সে আবারও একই কথা বললে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত এবারও কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার সে একই কথা বললে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তাকে উত্তর দিলেন, আচ্ছা, সে যদি বলে, আমি ইউসুফ বিন সুলাইমানের বাড়িতে মদপান করেছি, তাহলে

---

[১৪৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৯/১৯৮-১৯৯।

Scanned with CamScanner

আমরা কী করব? এ কথা শুনে ইউসুফ বিন সুলাইমান লজ্জা পেয়ে চুপ হয়ে গেল। পরে জানা গেল, ইউসুফ বিন সুলাইমানের ক্রীতদাসেরাই এই লোকটিকে মদ পান করিয়েছিল। এ কথা প্রকাশ পাওয়ার পর মানুষের মাঝে মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে গেল। এভাবে আরও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যেমন বলতেন, দেখা যেত, তেমনই ঘটেছে। এভাবেই চলছিল দিনকাল। দিনে দিনে তার অনুসারীদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর মুরাবিতীদের অবস্থা বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছিল; প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল। এভাবে মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের পরিকল্পনা যখন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছল, তখন তিনি তার অনুসারীদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। তারপর ...? তারপর হঠাৎ করে পরপারে পাড়ি জমালেন![১৪৬]

হাফিয যাহাবী রহ. *'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

আমার কাছে এ জনশ্রুতিও পৌঁছেছে যে, মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত ভগ্নপ্রায় কবরস্থানে কিছু লোককে লুকিয়ে রাখতেন। এরপর মানুষকে নিজের অলৌকিকত্বের প্রমাণ দেখাতেন। তিনি কবরস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতেন, হে মুর্দাগণ! উত্তর দাও। তখন কবর থেকে আওয়াজ ভেসে আসত, আপনিই নিষ্পাপ মাহদী। আপনি ...। এরপর তিনি নিজের এই ছল-চাতুরি চিরতরে গোপন করার জন্য তাদের ওপর কবর ধসিয়ে দিতেন এবং তারা সেখানেই মারা যেত।[১৪৭]

মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত ও তার মুওয়াহহিদী জামাত সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

নতুন দল গঠনের এই পথ পরিক্রমায় মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত তার বিরোধিতাকারী হাজারো মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন। এমনকি তার নিজ দলের লোকদেরকেও সামান্য অজুহাতে হত্যা করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। কেউ তার মতের বিরোধী হলে তার দৃষ্টিতে এর প্রতিষেধক ছিল একটাই– 'হত্যা'। তার মতো গভীর ও অগাধ ইলমের অধিকারী একজন

---

[১৪৬] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬০-২৬২।
[১৪৭] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৫৫১।

Scanned with CamScanner

ব্যক্তির এ ধরনের চরম গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া চরম বিস্ময়কর ও বিরল বিষয়। এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় এ ধরনের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার দাবি করা এবং নিজেকে প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী বলে ঘোষণা করা।

অবশ্য এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, তার এই দাবিকে সত্য বলে বিশ্বাস করত এমন লোকের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এর কারণ পূর্বেও আমরা বলে এসেছি যে, রাষ্ট্রের আলিমসমাজ জনসাধারণকে দ্বীনের মৌলিক আকীদা ও মৌলিক ইবাদত-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও তর্ক-বিতর্কে নিমগ্ন ছিলেন। ওলামায়ে কেরাম তাদের ও জনসাধারণের মাঝে অদৃশ্য এক প্রাচীর তৈরি করে রেখেছিলেন। মানুষ জানত না, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। ভালো-মন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা সাধারণ মানুষের ছিল না।

আর তাই দ্বীনের জ্ঞানশূন্য অজ্ঞ এসব মানুষ যখন মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের মতো বড় মাপের একজন আলিমের সন্ধান পেল; যিনি তাদেরকে সনদসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শোনাচ্ছেন, যিনি পুরো কোরআন শরীফ আত্মস্থ করেছেন, যিনি পূর্বসূরি মহান ব্যক্তিদের জীবনেতিহাস ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখেন, ফিকহের অগাধ জ্ঞান যার আছে– এ সবকিছু দেখে তারা প্রত্যেকেই তার প্রতিটি কথা ও লেখাকে অবনত মস্তকে মেনে নিল। সকলেই তার নিষ্পাপ হওয়ার দাবি বিশ্বাস করল, মেনে নিল মুরাবিতী হত্যার ফতোয়ার শরয়ী বৈধতা; বরং একে 'আজরে আযীম' লাভের কারণ বলে বিশ্বাস করল।

আর একই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে মুরাবিতী সম্প্রদায় বছরের পর বছর দেশের পর দেশ জয় করেছে, মাগরেব ও আন্দালুসে ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, এখন তাদের রাষ্ট্রে কিছু অন্যায়-পাপাচার ছড়িয়ে পড়ায় এবং তারা দ্বীনী শিক্ষার প্রসারের পরিবর্তে কেবল রণাঙ্গনে ব্যস্ত থাকায় আজ তাদেরকেই কাফির আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তাদের হত্যার বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুওয়াহহিদী জামাত কর্তৃক তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। 'মুওয়াহহিদী' নামটি যেন সদম্ভে ঘোষণা করছে যে, তারা ছাড়া আর সবাই কাফির, কেউ একত্ববাদী বা মুসলমান নয়।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুল মুমিন বিন আলী ও মুওয়াহহিদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মুরাবিতী-মুওয়াহহিদী দু' পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তার নিজের ও তার অনুসারী মুওয়াহহিদী জামাতের স্কন্ধে মুরাবিতীদের হত্যা করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। ইবনে খালদূন মুরাবিতী-মুওয়াহহিদী সংঘাতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের অনুসারীর সংখ্যা যখন পঞ্চাশে পৌঁছয়, তখন তিনি তাদের নাম রাখেন 'পঞ্চাশের নির্দশন'। সূস (Sous) নগরীর গভর্নর আবু বকর বিন মুহাম্মাদ লামতুনী তখন তাদের অবস্থানস্থল হারগায় অভিযান পরিচালনা করেন। মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের অনুসারীরা তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী হানতাতা ও টিনমাল গোত্রের সাহায্য কামনা করে। তাদের সাহায্য নিয়ে মুওয়াহহিদী জামাত লামতুনী সেনাদলের ওপর হামলা করে তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এর পূর্বেই তাদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ফলে ইবনে তুমার্‌তের সততার প্রতি তার অনুসারীদের বিশ্বাস আরও পোক্ত হয়। এরপর মানুষ দলে দলে তার দাওয়াতী আন্দোলনে শরীক হতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
>
> লামতুনী বাহিনী পরবর্তী সময়ে আরও একবার তাদের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করে। এরা 'লামতুনা হাশ্‌ম' নামে পরিচিত ছিল। সংবাদ পেয়ে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুছাদামা গোত্র হতে তার সকল অনুসারীদের সমবেত করেন এবং লামতুনী বাহিনীর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে বের হন। বাকীক নামক স্থানে উভয় দল মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে মুওয়াহহিদী বাহিনী লামতুনী বাহিনীকে পরাজিত করে এবং আগ্‌মাত পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। আগ্‌মাত

Scanned with CamScanner

> পৌঁছার পর আবু বকর বিন আলী বিন ইউসুফ ও ইবরাহীম বিন তাঈ'বাশিত-এর বাহিনীও লামতুনী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। মুওয়াহহিদী বাহিনী এই সম্মিলিত বাহিনীকেও পরাজিত করতে সক্ষম হয়।[১৪৮]

ইবনে তুমার্‌ত টিনমালকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী ও সুরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে বিভিন্ন সময় ঝটিকা বাহিনী পাঠিয়ে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি এর পাশ্ববর্তী এলাকাগুলোতেও তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হন।

সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা চলাকালে বিভিন্ন এলাকায় মুরাবিতীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। নয়টি স্থানে প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার মধ্যে সাতটিতেই মুওয়াহহিদী বাহিনী মুরাবিতীদের পরাজিত করে, পরাজিত হয় দু'টিতে।

মুওয়াহহিদী বাহিনীর সবচে' বড় পরাজয়ের ঘটনা ঘটে যখন তাদের ফিতনার আশঙ্কা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ সময় আমীর আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীন তাদের দমনের উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটান। আবদুল মুমিন বিন আলীর নেতৃত্বে মুওয়াহহিদী জামাতও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসে। যুদ্ধের মূল বিবরণটুকু আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশীর বর্ণনাতেই পাঠ করুন। তিনি লিখেছেন,

> ৫১৭ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত মুছাদামা গোত্রের সমন্বয়ে এক বিশাল বাহিনী গঠন করলেন। বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিল টিনমাল অঞ্চলের; এদের সঙ্গে সুস এলাকার অধিবাসীরাও যোগ দিয়েছিল। তিনি তার বাহিনীকে বললেন, যাও, মুরাবিতী নামধারী এসব ধর্মত্যাগী বিপথগামীদের উদ্দেশে রওয়ানা হও। এদেরকে অন্যায়ের মূলোৎপাটন, ন্যায়ের পুনরুজ্জীবন, বিদআত অপসারণ ও নিষ্পাপ ইমাম মাহদীর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের আহ্বান জানাও। যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাইয়ে পরিণত হবে। তোমরা যেসব অধিকার ভোগ কর, তারাও তা ভোগ করবে; তোমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায়, তাদের ওপরও তা বর্তাবে। আর যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়,

---

[১৪৮] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৮।

Scanned with CamScanner

তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা, সুন্নাহর দৃষ্টিতে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তোমাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।

এরপর তিনি আবদুল মুমিন বিন আলীকে বাহিনীর আমীর নির্ধারণ করলেন এবং বললেন, তোমরা হলে মুমিন আর এ হল তোমাদের আমীর। সেদিন থেকে আবদুল মুমিন মুওয়াহহিদী জামাতের মাঝে 'আমীরুল মুমিনীন' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মুওয়াহহিদী বাহিনী মার্‌রাকিশ নগরীর উদ্দেশে রওয়ানা হল। আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের পুত্র যুবাইয়ের নেতৃত্বে বিশাল মুরাবিতী বাহিনী তাদের মোকাবেলা করতে মার্‌রাকিশের নিকটবর্তী বুহাইরা নামক স্থানে সমবেত হল। লামতুনী বাহিনীও মুরাবিতী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে মুওয়াহহিদী বাহিনীর মুছাদামা গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ মুরাবিতী বাহিনীর কাছে দূত পাঠিয়ে ইবনে তুমার্‌তের আহ্বানে সাড়া দিতে দাওয়াত দিল। মুরাবিতী বাহিনী কঠোর ভাষায় এ আহ্বান প্রত্যাখান করল। এরপর মুওয়াহহিদী বাহিনীর প্রধান আবদুল মুমিন আমীরুল মুসলিমীন আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের দাওয়াতে সাড়া দিতে আহ্বান জানালেন। উত্তরে আলী বিন ইউসুফ তাকে বৃহত্তর মুসলিম জামাতের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং রক্তপাত ও ফিতনা সৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে বললেন। কিন্তু আবদুল মুমিন তার কথায় সামান্যও নিবৃত্ত হলেন না; বরং এতে মুরাবিতীদের প্রতি তার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল এবং মুরাবিতীদের দুর্বলতা ও পরাজয় তার সামনে সুনিশ্চিত মনে হল।

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে মুওয়াহহিদী বাহিনী পরাজিত হল এবং তাদের প্রচুর লোক হতাহত হল। আবুদল মুমিন তার কিছু সঙ্গীকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ ইবনে তুমার্‌তের কাছে পৌঁছলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল মুমিন কি বাঁচতে পারেনি? সংবাদদাতারা জানাল, হ্যাঁ, তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তখন মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত বললেন, 'তাহলে কিছুই খোয়া যায়নি'![১৪৯]

---

[১৪৯] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৫৯।

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা

প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের জীবন-ইতিহাস অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জটিল ও রহস্যঘেরা বর্ণনায় ভরপুর। জটিলতার পাশাপাশি তাতে পারস্পরিক অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যও প্রচুর। তাই কোন ঘটনাটি সত্য আর কোনটি বানোয়াট; কিংবা কোনটি আগের আর কোনটি পরের, তা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বিশেষত পূর্বতন যেসব ঐতিহাসিক তার সম্পর্কে লিখেছেন, তারা তার ও তার আমলে সংঘটিত ঘটনাবলির তারিখ নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেননি। অবশ্য করেননি না বলে করতে পারেননি বলাই শ্রেয়তর হবে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে অপারগ বিবেচনা করাই উচিত হবে। কেননা, যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন বা বলা ভালো স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় নিজেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন, সেগুলো যেন তাকে জানান না দিয়েই দ্রুত ধাবমান ছিল।

একে তো তার প্রাথমিক অপরিচিতি, একাকী চলা, নীরবতা ইত্যাদি ছিলই, পাশাপাশি তিনি যাযাবর জীবনের ন্যায় সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতেন। দুর্গম অথচ সুরক্ষিত এক পাহাড়ী এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও তিনি স্থির হননি। বরং ঐতিহাসিকদের কারও কারও মতে, যা অগ্রগণ্য মতও বটে, দুর্গম এক অঞ্চলে কিছুদিন (প্রায় তিনবছর) অবস্থান করার পর তিনি সে স্থানও ত্যাগ করেন এবং পূর্বের চেয়ে আরও দুর্গম ও সুরক্ষিত আরেকটি এলাকায় চলে যান। নতুন এ এলাকাটি ছিল সেখানকার অধিবাসী এবং তার ক্ষতি করতে পারে এমন সবার জন্যই বন্ধুর ও দুর্গম।

তিনি তার দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় এসব এলাকার অধিবাসীদের ওপর নির্ভর করতেন। অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, এসব এলাকার অধিবাসীদের দ্বীনী অবস্থা ও বুদ্ধি-বিবেক কোন স্তরের ছিল। বরং এর জন্য এ তথ্যটুকুই যথেষ্ট যে, তারা তার নিষ্কলুষতা ও মাহদী হওয়ার দাবি শ্রবণ করার পরও এবং 'পরিশুদ্ধিকরণ'-এর নামে তাদের মাঝে চরম গর্হিত হত্যাযজ্ঞ চালানো সত্ত্বেও তার অনুসরণ করত। অধিকন্তু পরিশুদ্ধিকরণের দিন তিনি এসব গোত্রের যেসব লোক কিছুটা বোধ-বিবেচনার অধিকারী ছিল, তাদের সবাইকে তার নিজের, দলের ও আন্দোলনের জন্য হুমকি বিবেচনা করে নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন। হত্যা করিয়েছিলেন তাদেরই আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে। সুতরাং কোথায় থাকবে বুদ্ধিমান লোক আর কারা হবে সচেতন?!

Scanned with CamScanner

বরং ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ তো এ তথ্যও উল্লেখ করেছেন যে, সেদিন যারা নিহত হয়েছিল, তারা এমনকি পালানোর চেষ্টাও করেনি; বরং নিজেদের আপনজনের হাতে নিহত হতে অপেক্ষা করেছে। অবশ্য কোন কোন গ্রন্থে ভিন্ন কথাও উল্লেখ আছে। কারও কারও মতে, যখনই কারও সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সে জাহান্নামী, তৎক্ষণাৎ তার উভয় হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। এরপর তাকে হত্যা করা হয়েছে। আবার কতক ভাষ্যমতে, কাউকে জাহান্নামী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ রকম বিভিন্ন ভাষ্য ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়।

আসল কথা হল, এসব সম্প্রদায়ের যেসব মানুষ বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন ছিল, তাদের কাছে দ্বীনী জ্ঞান ছিল না; কিন্তু এতটুকু বিচার-বুদ্ধি তাদের ছিল, যার কারণে ইবনে তুমার্তের দাবিকে অসত্য বলে নির্ধারণ করা যায়। তারপরও জাহালাত ও অজ্ঞতা তাদেরকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছিল যে, তাদের মাঝে দৃঢ়তা বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আর তাই এ তথ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, 'বাইযাক' নামে খ্যাত আবু বকর বিন আলী সানহাজী নামক ইবনে তুমার্তের জনৈক অনুসারী, যিনি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন এবং টিনমালে তার হাতে বাইআতগ্রহণকারী সপ্তম ব্যক্তি, তিনি ইবনে তুমার্তের জীবনী নিয়ে 'আখবারুল মাহদী ইবনে তুমার্ত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসের সময়কাল-তারিখ এমনকি বছরও উল্লেখ করেননি। ইবনে তুমার্তের বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনার তারিখ-বছরও তিনি উল্লেখ করেননি। অবশ্য গ্রন্থটিতে একেবারে শেষের দিকে ৫১৮ হিজরী থেকে ৫২৭ হিজরী পর্যন্ত সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার তারিখ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে তুমার্তের বিশিষ্ট অনুসারীদের একজন যখন তার জীবনেতিহাসে তারিখ উল্লেখ করেননি, তখন ঐতিহাসিকগণকে এ ধরনের জটিলতার স্বীকার হতে দেখে অপারগ বিবেচনা করাই যায়।

বুহাইরা বা উদ্যানের যুদ্ধ

৫২৪ হিজরীতে (১১৩০ খৃস্টাব্দে) বুহাইরা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুরাবিতী বাহিনী মুওয়াহহিদী বাহিনীকে পরাজিত করে এবং মুওয়াহহিদী বাহিনীর চল্লিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধ 'পরিশুদ্ধি অভিযান'-এর

Scanned with CamScanner

পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর যারা তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তাদের সবাইকে তিনি তাদেরই আত্মীয়স্বজনের হাতে হত্যা করিয়েছিলেন।

ইবনুল আছীর রহ. লিখেছেন,

> মাহদী -অর্থাৎ ইবনে তুমার্‌ত- চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এদের অধিকাংশই ছিল পদাতিক। তিনি ওয়ানশারীশিকে বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং আবদুল মুমিনকেও বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করলেন। মুওয়াহহিদী বাহিনী মার্‌রাকিশে পৌঁছে নগরী অবরোধ করল এবং নগরবাসীর বিচরণ সংকীর্ণ করে ফেলল। আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন আলী অবরুদ্ধ অবস্থায় মার্‌রাকিশেই ছিলেন। অবরোধের বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমীরুল মুসলিমীন পার্শ্ববর্তী সিজিলমাসা নগরীর গভর্নরের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হতে বললেন। বার্তা পাওয়ামাত্র সিজিলমাসা নগরীর গভর্নর দ্রুত প্রচুর সৈন্যসমাবেশ ঘটালেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা যখন মাহদী-বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, তখন অন্য দিক থেকে মার্‌রাকিশ নগরবাসীও বের হয়ে এল এবং উভয় দল মিলে মাহদী বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে মাহদীর অনুসারী প্রচুর সৈন্য নিহত হল। তাদের সেনাপতি ওয়ানশারীশিও যুদ্ধে নিহত হল। এরপর জীবিত সকলে আবদুল মুমিনকে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করল। পুরো দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। ঘোরতর যুদ্ধের কারণে আবদুল মুমিন বাধ্য হয়ে যুদ্ধ চলাকালে যোহর ও আসরের নামায যুদ্ধকালীন নামাযের পদ্ধতিতে আদায় করলেন। এর পূর্বে মাগরেবে কখনো যুদ্ধকালীন পদ্ধতির নামায পড়া হয়নি।
>
> মুরাবিতী বাহিনীর আধিক্য ও শক্তিমত্তা দেখে ভীত মুছাদামা গোষ্ঠী পালিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি বড় উদ্যানে আশ্রয় নিল। মাগরেব অঞ্চলে যেহেতু উদ্যানকে 'বুহাইরা' বলা হয়, তাই এ যুদ্ধ বুহাইরার যুদ্ধ এবং এ বছর বুহাইরার বছর নামে খ্যাতি লাভ করে।
>
> এক প্রান্ত থেকে মুরাবিতী বাহিনী তাদের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছিল। এরই মাঝে রাতের অন্ধকার নেমে এল। ততক্ষণে মুছাদামা গোষ্ঠীর অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়েছে। ওয়ানশারীশি নিহত

Scanned with CamScanner

হওয়ার পর আবদুল মুমিন তাকে দাফন করেছিলেন। পরবর্তীতে মুওয়াহহিদী বাহিনী মৃত সৈন্যদের মাঝে তার মৃতদেহ খুঁজে না পেয়ে বলাবলি করতে লাগল, তার মৃতদেহ ফিরেশতাগণ তুলে নিয়ে গেছে। রাত যখন গভীর হল, আবদুল মুমিন ও বেঁচে যাওয়া অন্যান্য সৈন্যরা পাহাড়ের দিকে চলে গেল।[১৫০]

কিন্তু এই পরাজয়ে ইবনে তুমার্তের উদ্যম মোটেও দুর্বল হয়নি। তিনি এতে সামান্যও হতোদ্যম হননি। যদিও এ পরাজয়কে কেন্দ্র করে তার সঙ্গীদের অনেকে তার মাহদী হওয়ার দাবি নিয়ে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে; কিন্তু তিনি তাদের অন্তরে নতুন করে আশা জাগিয়ে তুলতে ছল-চাতুরি ও মিথ্যার আশ্রয় নেন এবং তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তারাই সত্যের পথে আছে আর মুরাবিতীরা আছে ভ্রান্তির পথে। সুতরাং ভ্রান্ত মুরাবিতীরা অবশ্যই পরাজিত হবে।

মার্‌রাকিশী *'আলমু'জিব'* গ্রন্থে লিখেছেন,

পরাজিত বাহিনী যখন ইবনে তুমার্তের কাছে ফিরে এল, তিনি তাদের সামনে পরাজয়ের বিষয়টিকে তুচ্ছ করে তুলে ধরলেন এবং তাদের সামনে সাব্যস্ত করলেন যে, নিহতগণ সকলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। কেননা, তারা সকলে আল্লাহর দ্বীনের রক্ষায় জীবন দান করেছে; রাসূলের সুন্নাহকে বিজয়ী করার জন্য সংগ্রাম করেছে। ইবনে তুমার্তের এই প্রেরণাদায়ী বক্তব্য তার অনুসারীদেরকে নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তুলল এবং শত্রুর মোকাবেলায় প্রচণ্ড উদ্যমী করে তুলল। তখন থেকেই মুছাদামা গোত্রের লোকেরা মার্‌রাকিশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝটিকা হামলা চালাতে লাগল, নগরীর বিভিন্ন সামগ্রী ও সরকারী সম্পদ চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। ক্ষতি করার সুযোগ পাওয়ামাত্র তারা কাউকে ছাড় দিত না; বরং হত্যা কিংবা বন্দী করত। দলে দলে প্রচুর লোক তার আনুগত্য গ্রহণ করল। ইবনে তুমার্ত এ পুরোটা সময় নিজেকে কঠোর আত্মসংযম ও মিতব্যয়িতায় নিমগ্ন রেখেছিলেন এবং তার প্রথমদিকের আদর্শ বজায় রেখে আমলে-আচরণে

---

[১৫০] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৯/২০০।

Scanned with CamScanner

> সৎকর্মশীলদের সাদৃশ্য ও কঠোরভাবে শরয়ী হুদুদ প্রয়োগ জারী রেখেছিলেন।[১৫১]

বুহাইরার যুদ্ধের কিছুদিন পরই মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত আবদুল মুমিনকে তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেন এবং তার অনুসারীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর পরবর্তী নেতা আবদুল মুমিন বিন আলী নিজেই তাকে কাফনে আচ্ছাদিত করেন এবং জানাযাও তিনিই পড়ান। এরপর তাকে তার মসজিদে দাফন করা হয়।[১৫২]

এভাবেই শেষ হয় ইবনে তুমার্‌তের জীবন-অধ্যায়। বুহাইরা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে মুওয়াহহিদী বাহিনীর মারাত্মক পরাজয়ের কারণে তিনি জেনে যেতে পারেননি, কী হবে তার আন্দোলনের পরিণতি? অবশ্য এই পরাজয় সত্ত্বেও তিনি তার দাওয়াতী আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতাকে তার অনুসারীদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা তার প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখেছিল এবং তাকে মাহদী বলেই জেনেছিল। তাই তো নিজেদের পুত্রকে হত্যা করে হলেও তারা তার প্রতি নিজেদের আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিল। পরিশুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নকরণের নামে ঠাণ্ডা মাথায় সংঘটিত সেই হত্যাযজ্ঞের কথা চিন্তা করলে আজও শরীর কেঁপে ওঠে। ভাবা যায়, এতগুলো গোত্রের আপামর জনসাধারণ দ্বিধাহীন-নিরুদ্বেগ চিত্তে আপন আপন পুত্রদের হত্যা করছে!

ইবনে তুমার্‌তের অসিয়ত ও আবদুল মুমিনের বাইআত

মার্‌রাকিশী *'আলমু'জিব'* গ্রন্থে এক আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বে ইবনে তুমার্‌ত তার 'পঞ্চাশের দল' নামক বিভিন্ন গোত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ অনুসারীদের সমবেত করেন। এদের একত্র হওয়ার একমাত্র উৎস ছিল মুছাদামা পরিচয়। সবাই তার সামনে উপস্থিত হলে তিনি হেলান দিয়ে দাঁড়ান এবং প্রথমে আল্লাহর শানে যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা পাঠ করেন। এরপর নবীজীর নামে দুরূদ পাঠ করেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের

---

[১৫১] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬০-২৬২।

[১৫২] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২২৯।

Scanned with CamScanner

প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির আলোচনা করেন। এরপর তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃঢ়তা ও অটলতা, দায়িত্ব পালনে তাদের সুদৃঢ় সংকল্পের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার ও দুর্মুখদের সমালোচনার পরোয়া করেননি, ওমর রাযি. মদপানের কারণে নিজ পুত্রের ওপর শরয়ী হদ কার্যকর করেছিলেন এবং হকের প্রশ্নে সর্বদা অটল ছিলেন, এসব বিষয়ও তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন।

এরপর তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের এই মহান জামাত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআ'লা তাদের খ্যাতি আরও উজ্জ্বল করুন, তাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং নবীজীর উম্মতের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। তারা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন তো মানুষের দ্বারে এমন ফিতনা কড়া নাড়ছে, যা অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তিকেও হতবুদ্ধি ও দিশেহারা করে দেয়, জ্ঞানীকে বানিয়ে দেয় চাটুকার ও কৃত্রিম অজ্ঞ ব্যক্তি। ফলে আলিমগণ তাদের ইলম দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন না; বরং তারা ইলমকে বানিয়েছেন রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য অর্জন, পার্থিব সম্পদ উপার্জন ও সমাজের বিশিষ্টজনদের শুভদৃষ্টি ও করুণা-বৃষ্টি লাভের হাতিয়ার।

এরপর আল্লাহর শোকর যে, তিনি তোমাদের প্রতি আপন সমর্থন দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, সমকালীন পৃথিবীবাসীর মাঝে কেবল তোমাদেরকেই প্রকৃত একত্ববাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী বানিয়েছেন এবং তোমাদের কল্যাণে এমন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। তোমরা ছিলে পথহারা ও হেদায়েতহারা; ছিলে অন্ধ ও দৃষ্টিহারা; তোমরা ন্যায়-ইনসাফ চিনতে না; অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না। বিদআত তোমাদের মাঝে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, বাতিলের চাকচিক্য তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিল এবং শয়তান তোমাদের সম্মুখে এমন সব ভ্রান্তি ও মিথ্যাকে সুসজ্জিতরূপে তুলে ধরেছিল, যা উচ্চারণ করা হতেও আমি নিজের যবানকে মুক্ত রাখছি। এরপর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদেরকে তার মাধ্যমে গোমরাহীর পর হেদায়েত দান করেছেন, দৃষ্টিহীনতার পর দৃষ্টি দান করেছেন, তোমাদের বিভক্তিকে দূর করে একতার

Scanned with CamScanner

বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, লাঞ্ছনার পর সম্মান দান করেছেন এবং এসব বিপথগামীদের শাসন তোমাদের ওপর থেকে অপসারিত করেছেন। তাদের কৃতকর্ম ও অন্তরের দুরভিসন্ধির কারণে আল্লাহ্ অবশ্যই অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে তাদের ভূমি ও রাষ্ট্রের অধিকারী করবেন। আল্লাহ-ই তো বলেছেন, আর তোমার রব বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

সুতরাং নতুন করে তোমরা তোমাদের নিয়তকে এক আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ কর, কর্মে ও বচনে তার শোকর আদায় কর; যেন তিনি তোমাদের প্রচেষ্টাকে পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদের আমলকে কবুল করে নেন এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিস্তৃত করেন। আর বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, মত-পথের ভিন্নতা ইত্যাদি পরিহার করে শত্রুদের বিরুদ্ধে এক দলে পরিণত হও। যদি তোমরা এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পার, তাহলে মানুষ তোমাদেরকে ভয় ও শ্রদ্ধা করবে, দ্রুত তোমাদের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে ছুটে আসবে, তোমাদের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের হাতে সত্যকে বিজয়ী করবেন। আর যদি ঐক্যের শক্তিকে উপেক্ষা কর, তাহলে লাঞ্ছনা তোমাদের ঘিরে ফেলবে, হীনতা ব্যাপক হবে, সাধারণ মানুষ তোমাদের তুচ্ছজ্ঞান করবে আর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তোমাদের ছিনিয়ে নেবে।

সকল কাজে কঠোরতার সঙ্গে সহানুভূতি এবং তীব্রতার সঙ্গে নমনীয়তার মিশ্রণ ঘটাবে। সাথে সাথে এও জেনে রাখ যে, এ উম্মতের প্রথম অংশ যে পথে কল্যাণ ও বিশুদ্ধতা লাভ করেছে, সে পথ ছাড়া অন্য কোন পথে উম্মতের পরবর্তী অংশ কখনোই বিশুদ্ধতার সন্ধান পাবে না। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছি এবং তাকে তোমাদের আমীর নির্ধারণ করছি। তবে এর পূর্বে আমি রাত-দিন, দেশে-বিদেশে সর্বাবস্থায় তার অবস্থা যাচাই করেছি; তার বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থার পরীক্ষা নিয়েছি। সর্বক্ষেত্রে আমি তাকে দ্বীনের প্রতি অটল, আপন দায়িত্ব পালনে সচেতন পেয়েছি। আশা করি, তার প্রতি আমার যে সুধারণা, সে তার অমর্যাদা করবে না।

সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে আবদুল মুমিন। সুতরাং যতদিন সে আপন রবের

Scanned with CamScanner

প্রতি বাধ্য-অনুগত থাকবে, তোমরাও তার অনুগত থাকবে। সে যদি নিজের পথ বদলে ফেলে কিংবা সুপথ ত্যাগ করে অথবা কোন অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে শুনে রাখ, আল্লাহ এই মুওয়াহহিদী জামাতে সমূহ বরকত ও কল্যাণ রেখেছেন। তখন আল্লাহই এ জামাতের হেফাযত করবেন এবং তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা এ দলের নেতৃত্ব দান করবেন। আল্লাহ মুওয়াহহিদীদের সম্মানিত করুন।

মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সকলে আবদুল মুমিনের হাতে বাইআত হয়। ইবনে তুমার্ত সকলের জন্য দোয়া করেন এবং একে একে সবার মুখমণ্ডল ও বক্ষে হাত মুছে দেন। এটিই ছিল আবদুল মুমিনের আমীর হওয়ার প্রেক্ষাপট। এ অঙ্গীকার গ্রহণের অল্প কয়েকদিন পরেই ইবনে তুমার্ত ইন্তেকাল করেন আর মুছাদামা সম্প্রদায় তাদের নতুন নেতা আবদুল মুমিনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।[১৫৩]

মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা

৫৪১ হিজরীতে (১১৪৬ খৃস্টাব্দে) মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের প্রথম শাসক হলেন মুহাম্মাদ বিন তুমার্ত-এর শিষ্য ও দলের দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তথা মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মুমিন বিন আলী (৪৮৭-৫৫৮ হিজরী/১০৯৪-১১৬৩ ঈসায়ী)।

তার পুরো নাম আবদুল মুমিন বিন আলী বিন মাখলূফ বিন ইয়া'লা বিন মারওয়ান আবু মুহাম্মাদ আলকুমী। তিনি আমাজিগ শাখা-গোত্র কুমিয়া-এর সদস্য ছিলেন বিধায় বংশ-পরিচয়ে 'আলকুমী' ছিলেন। অবশ্য গুরু মুহাম্মাদ বিন তুমার্তের মতো তিনিও নিজেকে আরব বংশোদ্ভূত দাবি করতেন এবং মুযার গোত্রের প্রতি নিজেকে সম্বন্ধিত করতেন।[১৫৪] মরক্কোর তিলিম্সান (Tlemcen) নগরীর নিকটবর্তী তাজির্ত এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইলম অর্জনরত অবস্থায় বেড়ে ওঠেন। তার পিতা একজন মৃৎশিল্পী ছিলেন।[১৫৫]

---

[১৫৩] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬২-২৬৪।

[১৫৪] দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/১২৬, আবদুল ওয়াহিদ মার্রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৯৯।

[১৫৫] আবদুল ওয়াহিদ মার্রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/৯৯।

Scanned with CamScanner

আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী তার পরিচয়-বিবরণীতে লিখেছেন,

তিনি শ্বেতবর্ণ, মাংসল স্বাস্থ্য, কাজল-কালো কেশ, সুগঠিত গড়ন, নির্মল অবয়ব, সুউচ্চ কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ বাচনভঙ্গি, অলঙ্কারপূর্ণ বচনের অধিকারী ছিলেন। মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যে-ই তাকে দেখত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে ভালোবাসত। আমি জানতে পেরেছি, তাকে দেখলেই ইবনে তুমার্‌ত এই কবিতাপঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন,

تَكَامَلَتْ فِيْكَ أَخْلَاقٌ خُصِصْتَ بِهَا فَكُلُّنَا بِكَ مَسْرُوْرٌ وَمُغْتَبِطٌ
فَالسِّنُّ ضَاحِكَةٌ، وَالْكَفُّ مَانِحَةٌ وَالصَّدْرُ مُنْشَرِحٌ، وَالْوَجْهُ مُنْبَسِطٌ

তোমার মাঝে এমন সব চারিত্রিক গুণাবলি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে, যা কেবল তোমার সঙ্গেই স্বতন্ত্র। আর তাই আমরা সকলে তোমায় পেয়ে আনন্দিত ও ঈর্ষান্বিত।

(কত গুণ বলব তোমার!) দন্তরাজি সদা হাস্যোজ্জ্বল, হস্তযুগল উদার, চিত্ত প্রসারিত আর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল।[১৫৬]

আল্লামা যাহাবী রহ. *'আলই'বার'* গ্রন্থে এবং ইবনুল ই'মাদ রহ. *'শাযারাতুয যাহাব'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি (আবদুল মুমিন বিন আলী) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নেতা, অত্যন্ত প্রভাবশালী, উচ্চাভিলাষী, অত্যন্ত ধার্মিক, বহু চারিত্রিক গুণের অধিকারী, বিরল তুলনীয়। তিনি প্রতিদিন পবিত্র কোরআনের এক-সপ্তমাংশ তেলাওয়াত করতেন, রেশমী পোশাক পরিহার করতেন[১৫৭], সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন এবং এত গুরুত্বের সঙ্গে যুদ্ধাভিযান ও প্রশাসন পরিচালনা করতেন, যেন এর জন্যই তার জন্ম হয়েছে। উভয় ঐতিহাসিক তার এসব গুণাবলি উল্লেখ করার পর এমন একটি কথা বলেছেন, যা অনেক প্রশ্নবোধক চিহ্ন সৃষ্টি করে। তারা লিখেছেন, আর তিনি তার বিরোধী দলের প্রতি চরম পর্যায়ের নির্মম ও রক্তপাতকারী ছিলেন।[১৫৮]

---

[১৫৬] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬৬।

[১৫৭] আল্লামা যাহাবী ও ইবনুল ইমাদের বর্ণিত এ গুণ এ কথাই বোঝায় যে, সে যুগে রেশমী কাপড় পরিধান করা মানুষের রীতি ও পছন্দের বিষয় ছিল।

[১৫৮] ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, ৪/১৮৩ ও যাহাবী, *আলই'বার*, ৩/২৯।

Scanned with CamScanner

যিরিক্‌লী *'আলআ'লাম'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন জ্ঞানী, প্রত্যয়ী ও বিচক্ষণ, সফল বীর সেনানী, উদারহস্ত, সামান্য অপরাধেও কঠোর, প্রশাসনিক বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী, যুদ্ধ ও অভিযান-প্রিয়। উচ্চ ও মধ্য মাগরেব তার হাতে বিজিত হয়েছিল। তিনি সেভিল, কর্ডোভা, গ্রানাডা, আলজেরিয়া, মাহদিয়্যা, পশ্চিম তারাব্‌লুস এবং সকল আফ্রিকান দেশের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিলেন এবং নৌবহরসমূহ (স্কোয়াডন) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাগরেবে বসবাসকারী গোত্রসমূহের ওপর তিনিই সর্বপ্রথম কর আরোপ করেন।[১৫৯]

'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে ইবনে কাসীর রহ. অনুরূপ বিবরণ উল্লেখ করে লিখেছেন,

> তার আমলে যারা নামাযে যত্নবান থাকত না, তাদের হত্যা করা হত, মুয়াযযিনের আযানের পূর্বেই মানুষ মসজিদে ভীড় জমাত। ... কিন্তু তিনি রক্তপিপাসু ছিলেন; এমনকি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অপরাধেও কাউকে হত্যা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।[১৬০]

তার অসংখ্য সৎ গুণের মাঝে এই চরম অমার্জনীয় গুণটির উপস্থিতি ছিল নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌তের সাহচর্যের প্রভাব।

এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি ও নির্বিচারে রক্তপাতের পাশাপাশি মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত যখন জানতে পেরেছিলেন যে, তার অনুসারীগণ মুরাবিতীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের সম্পদ প্রাপ্তির লোভ করছে, তখন তিনি পুরো গনীমতের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। তার অনুসারীদের কারও তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে তিনি প্রথমে তাকে প্রহার করে এরপর তার কৈফিয়ত গ্রহণ করতেন। ফলে তার এই জামাত পরিণত হয়েছিল আমীরের অনুগত, দুনিয়াবিমুখ ও আবিদ জামাতে। কিন্তু এ সবকিছু ছিল নববী মানহাজের বিপরীতে। নবীজী তার সাহাবীদের অন্তর থেকে পার্থিব মোহ বিদূরিত করার জন্য গনীমতের সম্পদ জ্বালিয়ে দেননি; তাহাজ্জুদে শিথিলতা ও অলসতাকারীদের প্রহারও করেননি কিংবা এই জাতীয় কঠোর কোন পদ্ধতি ও বৈরাগ্যবাদের অনুসরণও করেননি।

---

[১৫৯] যিরিক্‌লী, *আলআ'লাম*, ৪/১৭০।

[১৬০] ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/৩০৬।

Scanned with CamScanner

এরপরও আমাদের প্রবল ধারণা এটাই যে, মুহাম্মাদ বিন তুমার্‌ত যে নিষ্পাপত্ব ও মাহদী হওয়ার দাবি করেছিলেন এবং তার অনুসারীগণ পরবর্তী সময়ে তার এই দাবির প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন, আবদুল মুমিন বিন আলী তাতে একমত ছিলেন না। আমাদের এই ধারণার ভিত্তি হল, আবদুল মুমিনের ন্যায় একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইবনে তুমার্‌তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইবনে তুমার্‌ত কিছুতেই হাদীসসমূহে উল্লিখিত সেই প্রতিশ্রুত মাহদী নন, যিনি সারা পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, যার অব্যবহিত পরেই ঘটবে ঈসা মাসীহের আগমন এবং বাস্তবায়িত হবে অন্যান্য বিভিন্ন নিদর্শন।

কিন্তু অপরদিকে এ কথাও ঠিক যে, আবদুল মুমিন বিন আলী এসব ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যানও করেননি। এর কারণ এই ছিল যে, মুওয়াহহিদী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ তখনও এই চিন্তাধারা ও বিশ্বাসই লালন করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি আশঙ্কা করছিলেন, তিনি যদি এই ঘোষণা করেন যে, ইবনে তুমার্‌তের এসব চিন্তাধারা শরীয়তবিরোধী, তাহলে মুওয়াহহিদী জামাতের এই জটিল সন্ধিক্ষণে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হবে এবং মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

আবদুল মুমিন বিন আলীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক

আল্লামা যাহাবী রহ. *'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'* গ্রন্থে আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, যাদের বর্ণনায় আমার আস্থা আছে এমন একাধিক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন, আবদুল মুমিন যখন মাগরেবের উপকণ্ঠে সিলা নগরীতে অবতরণ করেন এবং তৎসংলগ্ন নদী অতিক্রম করেন, তখন নদীর তীরে তার জন্য একটি তাঁবু টানানো হয়। সেনাবাহিনী এক এক গোত্র করে নদী পাড়ি দিয়ে তার কাছে উপস্থিত হতে থাকে। ... তিনি তখন সিজদায় পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করেন, তখন তার চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গিয়েছিল। ... এ সময় তিনি বলেন, আমি এমন তিন ব্যক্তির কথা জানি, যারা এতটা নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় এই শহর অতিক্রম করেছিলেন যে, তাদের কাছে একটি রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা এই নদীটি পার হওয়ার উদ্দেশে নদীর পাড়ে নৌকার মাঝির কাছে এসেছিলেন এবং তাদের

Scanned with CamScanner

তিনজনকে পার করে দেওয়ার বিনিময়ে তাদের একমাত্র সম্বল রুটিটি দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নৌকার মালিক বলেছিল, আমি এই রুটির বিনিময়ে কেবল দু'জনকে পার করতে পারব। তখন তিনজনের একজন, যে ছিল এক দৃঢ়-অবিচল ও সহিষ্ণু যুবক, সে অপর দু'জনকে বলেছিল, আপনারা আমার কাপড় নিয়ে নৌকায় পার হোন, আমি সাঁতরে পার হচ্ছি। এরপর যুবক সাঁতার কেটে নদী পাড়ি দিতে লাগল। যখনই সাঁতার কাটতে কাটতে তার দেহ ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ত, সে একটু বিশ্রাম করার জন্য নৌকার কাছে এসে নৌকায় হাত রাখত, আর নৌকার মাঝি তার হাতের দাঁড় দিয়ে তাকে আঘাত করে ব্যথা দিত এবং দূরে সরিয়ে দিত। এভাবে প্রচণ্ড কষ্ট করে সে যুবক সেদিন এই নদী পার হয়েছিল। উপস্থিত শ্রোতাগণ সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, সেদিনের সেই যুবকই তাদেরকে আজ সেই দাস্তান শোনাচ্ছেন আর তার সঙ্গীদু'জন ছিলেন ইবনে তুমার্‌ত ও আবদুল ওয়াহিদ শারক্বী।[১৬১]

আবদুল মুমিন বিন আলীর পুত্রসন্তানের সংখ্যা ছিল ষোলজন। তাদের নাম হল, (সবচে' বড় পুত্র ও ঘোষিত যুবরাজ) মুহাম্মাদ (অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাকে অপসারণ করা হয়েছিল), আলী, ওমর, ইউসুফ, ওসমান, সুলাইমান, ইয়াহইয়া, ইসমাঈল, হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, ঈসা, মুসা, ইবরাহীম ও ইয়াকুব।[১৬২]

কঠিন সংঘাত ও সশব্দ পতন!

পূর্বে উল্লিখিত বুহাইরা যুদ্ধের পর আবদুল মুমিন বিন আলী টিনমালে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পরেই ইবনে তুমার্‌ত ইন্তেকাল করেন এবং তার অবর্তমানে আবদুল মুমিনের নেতৃত্বের বাইআত সম্পন্ন হয়। তিনি টিনমালে অবস্থান করে মানুষের মন যোগাতে সচেষ্ট হন এবং মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতে থাকেন। আবদুল মুমিন বিন আলী ছিলেন উদার ও নির্ভীক যোদ্ধা এবং শত বিপদেও স্থির চিত্ত, অটল-অবিচল।

৫২৮ হিজরীতে আবদুল মুমিন বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটালেন এবং

---

[১৬১] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৯৬ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২/৩৭৩।

[১৬২] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬৬।

Scanned with CamScanner

সেনাবাহিনী নিয়ে টাডলায় পৌঁছলেন। সেখানে টাডলাবাসীর সঙ্গে আবদুল মুমিনের নেতৃত্বাধীন মুওয়াহহিদী বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। যুদ্ধে মুওয়াহহিদী বাহিনী জয়লাভ করল। আবদুল মুমিন তার বাহিনী নিয়ে জোরপূর্বক শহরে প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি পাহাড়ী অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে টাডলাসংলগ্ন শহরগুলোও জয় করলেন।

৫৩১ হিজরীতে মুরাবিতী রাষ্ট্রের শাসক আলী বিন ইউসুফের ওলিয়ে আ'হদ (ভাবী রাষ্ট্রপ্রধান) সায়র বিন আলী বিন ইউসুফ মৃত্যুবরণ করলেন। তাই আলী বিন ইউসুফ আন্দালুসে প্রশাসকের দায়িত্ব পালনরত তার আরেক পুত্র তাশফীনকে আন্দালুস থেকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে ওলিয়ে আ'হদ ঘোষণা করলেন। এরপর তিনি তাশফীনকে শক্তিশালী এক সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়ে আবদুল মুমিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করলেন। মুরাবিতী বাহিনী নিয়ে তাশফীন বিন আলী মরুভূমিতে চলতে লাগলেন এবং পাহাড়ে পাহাড়ে চলমান আবদুল মুমিন বিন আলীর বাহিনীর অনুসরণ করতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার উভয় বাহিনীর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হলেও বড় কোন সংঘাত বা যুদ্ধের ঘটনা ঘটল না।

৫৩৩ হিজরীর শীতকালে আবদুল মুমিন বিন আলী কারনাদা পাহাড়ে পৌঁছলেন এবং ঘন বৃক্ষ পরিবেষ্টিত শক্ত ও কঠিন এক ভূমিতে অবতরণ করলেন। তাশফীন বিন আলী তার বাহিনী নিয়ে অবস্থান নিলেন এর মুখোমুখি উদ্ভিদবিহীন এক সমতল ও নরম ভূমিতে। এরই মাঝে একটানা কয়েকদিন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হল। ফলে তাশফীন বিন আলী তার বাহিনী নিয়ে যেখানে অবস্থান করছিলেন, সে জায়গা কাদায় ভরে গেল এবং তাদের বাহন ঘোড়ার পা কাদায় আটকে গেল। ফলে সৈন্যরা হাঁটতে-চলতে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং পানি জমে পথ বন্ধ হয়ে গেল। পাশাপাশি তাশফীন ও তার সঙ্গীদের রসদ-সরবরাহ লাইনও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আগুনের প্রয়োজন হলে বাধ্য হয়ে তারা তাদের বর্শা দিয়ে আগুন জ্বালাতে লাগল। রসদের অভাবে মুরাবিতী বাহিনী ক্ষুধা-শীত ও সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হল।

অপরদিকে আবদুল মুমিন ও তার বাহিনীর অবস্থান যেহেতু পাহাড়ী শক্ত ও অমসৃণ ভূমিতে ছিল, তাই তারা এ জাতীয় কোন সমস্যার সম্মুখীন হল না এবং তাদের রসদ সরবরাহ-ব্যবস্থাও নিরবচ্ছিন্ন রইল। তাশফীন-বাহিনীর এই অবরুদ্ধ অবস্থাকে কাজে লাগাতে আবদুল মুমিন তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীর একটি অংশকে 'পঞ্চাশের নিদর্শন'-এর অন্যতম সদস্য আবু আবদুল্লাহ

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ বিন রুকূ-এর নেতৃত্বে তিলিমসান নগরীর অধিভুক্ত এলাকা ওয়াজরায় প্রেরণ করলেন। সংবাদ পেয়ে মুরাবিতী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিলিমসানের গভর্নর মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন ফানু একদল মুরাবিতী সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন। 'খান্দাকুল খামির' নামক স্থানে উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হল। যুদ্ধে মুওয়াহহিদী বাহিনী জয়লাভ করল এবং স্বয়ং গভর্নর মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়াসহ তার প্রচুর সৈন্য নিহত হল। মুওয়াহহিদী বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে আবারও পাহাড়ে অবস্থানরত মূল বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল। এরপর আবদুল মুমিন তার পুরো বাহিনী নিয়ে গামারা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেখানে বসবাসরত সকল গোত্র তার বশ্যতা স্বীকার করে নিল। তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন।

এভাবেই আবদুল মুমিন বিন আলী তার বাহিনী নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে চলতে লাগলেন আর তাশফীন তার বাহিনী নিয়ে মুওয়াহহিদী বাহিনীর সমান্তরালে মরুভূমিতে চলতে লাগলেন। এরই মধ্যে ৫৩৫ হিজরীতে রাজধানী মার্‌রাকিশ থেকে মুরাবিতী বাহিনীর কাছে আমীরুল মুসলিমীন আলী বিন ইউসুফের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। ফলে তার পুত্র তাশফীন সৈন্য প্রত্যাহার করে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে শাসনভার গ্রহণ করলেন। এ সংবাদে আবদুল মুমিনের মুরাবিতী রাষ্ট্রজয়ের প্রত্যাশা আরও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তিনি মরুভূমিতে নেমে না এসে তার বাহিনী নিয়ে পাহাড়েই পদচারণা অব্যাহত রাখলেন।

৫৩৮ হিজরীতে আবদুল মুমিন তার বাহিনী নিয়ে তিলিমসান নগরী দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। সংবাদ পেয়ে তাশফীন দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে আক্রান্ত এলাকায় পৌঁছলেন। উভয় পক্ষ ছাউনি ফেলে অবস্থান করতে লাগল; কিন্তু খণ্ড খণ্ড কিছু যুদ্ধ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সংঘাত হল না।

৫৩৯ হিজরীতে আবদুল মুমিন টাজরা পাহাড়ে চলে গেলেন এবং ওমর হিনতানীর নেতৃত্বে ওয়াহরান নগরীতে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। উক্ত বাহিনী আকস্মিক হামলা চালিয়ে ওয়াহরান নগরী দখল করে নিল। সংবাদ পেয়ে তাশফীন দ্রুত ওয়াহরানের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তাশফীনের আগমনের সংবাদ পেয়ে ওমর ওয়াহরান ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাশফীন সে বছর রমযানে ওয়াহরানের বাইরের দিকে সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করলেন। সে মাসেই তাশফীন সেখানে নিহত হলেন এবং তার লাশ শূলে চড়ানো হল।

Scanned with CamScanner

তাশফীনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেখানকার একটি টিলার ওপর ঘন উদ্যানে বেষ্টিত এক দুর্গে অবস্থান করছিলেন। দুর্গসংলগ্ন বাগানটি ছিল সব ধরনের ফল-ফলাদির গাছে পূর্ণ। ঘটনাক্রমে ওমর হিনতানী এই দুর্গ জয় করার জন্য একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। বাহিনীর সদস্যরা জানত না যে, এ দুর্গেই তাশফীন অবস্থান করছেন। তারা দুর্গ জয় করার জন্য দুর্গের দ্বারপথে আগুন ধরিয়ে দিল। শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে তাশফীন পালানোর উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চেপে বসলেন। কিন্তু তাকে বহনকারী ঘোড়াটি দুর্গের ভেতর থেকে প্রাচীরের বাইরে লাফ দিলে সরাসরি প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে পড়ে গেল এবং তাশফীন শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন। তারা তাকে জেরা করলে তিনি নিজের পরিচয় স্বীকার করলেন। তখন শত্রুবাহিনী তাকে আবদুল মুমিনের কাছে নিয়ে যাওয়ার মনস্থ করল। কিন্তু গুরুতর আহত তাশফীন কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন। এরপর তারা তাশফীনের মৃতদেহ শূলে চড়াল এবং দুর্গের ভেতরে থাকা সবাইকে হত্যা করল। তাশফীনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তার বাহিনী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং বিভক্ত অবস্থায় আত্মগোপন করল। মার্‌রাকিশে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার সহোদর ইসহাক বিন আলী বিন ইউসুফ।

তাশফীনের নিহত হওয়ার সংবাদ ওমর হিনতানী আবদুল মুমিনকে জানানোমাত্র তিনি পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে টাজরা থেকে সেদিনই চলে এলেন। তাশফীনের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল; তাদের কেউ কেউ ওয়াহরানেই আশ্রয় নিল। আবদুল মুমিন পৌঁছার পর তরবারির জোরে ওয়াহরানে প্রবেশ করলেন এবং অসংখ্য নাগরিককে হত্যা করলেন। এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে তাহিতী ও আকাদীরে গেলেন। আকাদীরবাসী নগরপ্রাচীর বন্ধ করে দিয়ে তাকে শহরে প্রবেশে বাধা দিল এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হল। অপরদিকে তাহিতীর গভর্নর ইয়াহইয়া ইবনুস সাহরাবিয়া মুওয়াহহিদী বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তার বাহিনী নিয়ে পালিয়ে ফেয শহরে চলে গেলেন। আবদুল মুমিন তাহিতী পৌঁছলে নগরবাসী দ্রুত তার আনুগত্য বরণে অগ্রসর হল; কিন্তু তিনি তাদের বশ্যতা গ্রহণ না করে তাদের নির্বিচারে হত্যা করলেন এবং শহরে প্রবেশ করে নতুন করে প্রশাসনের বিন্যাস করলেন। এরপর আকাদীর অবরোধ করার জন্য কিছু সৈন্য রেখে বাকিদেরকে নিয়ে তিনি ফেয শহরের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

Scanned with CamScanner

৫৪০ হিজরীতে আবদুল মুমিনের নেতৃত্বে মুওয়াহহিদী বাহিনী ফেয শহরে পৌছল। নগরীর উপকণ্ঠে পৌছেই মুওয়াহহিদী বাহিনী নগরী অবরোধ করল এবং একটানা নয় মাস অবরোধ অব্যাহত রাখল। তাহিতী থেকে পালিয়ে আসা ইয়াহইয়া ইবনুস সাহরাবিয়া ও তার বাহিনী শহরের অভ্যন্তরেই আটকা পড়ল। দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখার পরও কোন ফলাফল না আসায় আবদুল মুমিন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি শহরে প্রবাহিত একটি নদীতে বাইরে থেকে বাঁধ দিলেন। বাঁধে আটকা পড়া পানি বাড়তে বাড়তে যখন প্রবল স্রোতধারা তৈরি হল, তখন তিনি অকস্মাৎ বাঁধ খুলে দিলেন। ফলে পানির প্রচণ্ড চাপে নগরপ্রাচীর ভেঙে পড়ল এবং নদী-সংলগ্ন সব ভবন ও স্থাপনা পানির তোড়ে ভেসে গেল। এরপর তিনি শহরে প্রবেশে উদ্যত হলে শহরবাসী বাইরে বেরিয়ে এসে তার প্রতিরোধ করল। ফলে এবারও তিনি শহরে প্রবেশে ব্যর্থ হলেন।

এর পরক্ষণেই ফেয নগরীর গভর্নর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবদুল মুমিনের কাছে পত্র পাঠিয়ে ফেযবাসীর জন্য নিরাপত্তা কামনা করল। তিনি প্রস্তাবে সম্মত হলে তারা নগরপ্রাচীরের একটি দ্বার খুলে দিল। ৫৪০ হিজরীর শেষদিকে আবদুল মুমিন তার বাহিনী নিয়ে ফেয শহরে প্রবেশ করলেন। ইয়াহইয়া ইবনুস সাহরাবিয়া পালিয়ে টানজায় চলে গেলেন। আবদুল মুমিন ফেয নগরীর প্রশাসনও পুনঃবিন্যাস করলেন এবং এই ঘোষণা প্রচার করার আদেশ দিলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের কাছে যুদ্ধাস্ত্র রেখে দেবে, তার প্রাণ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। ঘোষণা প্রচার করতেই শহরবাসী সকলে আপন আপন অস্ত্র আবদুল মুমিনের কাছে সমর্পণ করল।

ফেয নগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ জয় করার পর আবদুল মুমিন মুরাবিতী সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং সবচে' বড় ও সমৃদ্ধ শহর মার্‌রাকিশ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তখন মার্‌রাকিশে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রয়াত শাসক তাশফীনের ভাই ইসহাক বিন আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীন। তিনি তখন ছিলেন নিতান্তই বালক। আবদুল মুমিন ৫৪১ হিজরীতে মার্‌রাকিশে পৌছলেন এবং শহরের পশ্চিম পাশে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর শিবির স্থাপন করলেন। তিনি সেখানেই তার ও তার সৈন্যদের জন্য একটি ক্ষুদ্র বসতি প্রতিষ্ঠা করলেন, নামাযের জন্য একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করলেন। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্‌রাকিশ নগরী, নগরবাসী ও নিজ সৈন্যদের ওপর নজর রাখার জন্য তিনি সেখানে একটি

Scanned with CamScanner

উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করলেন। এরপর দীর্ঘ এগার মাস মুওয়াহহিদী বাহিনী মার্‌রাকিশ নগরী অবরোধ করে রাখল। এ সময় মাঝে মধ্যেই উভয় বাহিনীর মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। মুরাবিতী সৈন্যগণ নগরী থেকে বেরিয়ে এসে মুওয়াহহিদী বাহিনীর ওপর হামলা চালাত। দীর্ঘদিনের অবস্থানের কারণে আবদুল মুমিনের বাহিনীর রসদের পরিমাণ দিনে দিনে কমে আসছিল। তাই তিনি দ্রুত এ সমস্যা হতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে মার্‌রাকিশবাসীকে দুর্বল করার জন্য একটি ফাঁদ পাতলেন।

একদিন তিনি তার সৈন্যদেরকে মার্‌রাকিশ হামলা করার নির্দেশ দিলেন। স্বভাবতই মুরাবিতী বাহিনী হামলা প্রতিরোধ করার জন্য শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বেশ কিছুদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুওয়াহহিদী বাহিনী হার মানল এবং পলায়নের উদ্দেশ্যে পিছু হটল। উজ্জীবিত মুরাবিতী বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে পাহাড়ের পাদদেশে আবদুল মুমিনের নবনির্মিত বসতি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেখানে আবার উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হল। এ সময় আবদুল মুমিনের পাহাড়ের ওপর নির্মিত শহরের বড় ধরনের ক্ষতি হল এবং বিভিন্ন স্থাপনা ভেঙে গেল।

আবদুল মুমিন নিজে পাহাড়ের ওপর স্থাপিত বিশেষ টাওয়ারের ওপর অবস্থান করে পুরো পরিস্থিতি অবলোকন করছিলেন। সেনাপতিদের তিনি পূর্বেই বলে রেখেছিলেন, তারা যেন পরাজয়ের ভান করে মুরাবিতী বাহিনীকে পাহাড়ে টেনে আনে। যখন পুরো মুরাবিতী বাহিনী পাহাড়ে চলে আসবে, তখন আবদুল মুমিন দামামা বাজানোর আদেশ দেবেন। আর দামামার আওয়াজ শোনামাত্র আত্মগোপন করে থাকা অন্য একদল সৈন্য বের হয়ে আসবে। এর ফলে মুরাবিতী বাহিনী চারদিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাবে এবং তখন তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা যাবে।

সে মতে যুদ্ধ যখন তীব্রতর হল, মুওয়াহহিদী বাহিনীর সেনাপতিরা চিৎকার করে আবদুল মুমিনকে দামামা বাজানোর আদেশ দিতে অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি বললেন, ধৈর্য ধর, এখনও সময় হয়নি। শহর থেকে ওদের সকল সৈন্য বের হয়ে আসুক। যখন মার্‌রাকিশবাসী অধিকাংশই শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল, তখন আবদুল মুমিন দামামা বাজানোর আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপনে থাকা সৈন্যরা বেরিয়ে এল এবং মুওয়াহহিদী বাহিনীর উভয় অংশ মিলে দু'দিক থেকে প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে মুরাবিতী বাহিনীকে পরাজিত করল। নিহত হল প্রচুর মুরাবিতী সৈন্য।

Scanned with CamScanner

এর ফলে শহরের অভ্যন্তরে মুরাবিতী বাহিনীর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। শাসক ইসহাক বিন আলী ছিলেন বয়সে একেবারেই নবীন। মূলত মুরাবিতী সাম্রাজ্যের প্রবীণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই তখন রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন। তাদেরই একজন আবদুল্লাহ বিন আবু বকর নিরাপত্তা চেয়ে আবদুল মুমিনের কাছে আশ্রয় নিলেন। তিনি আবদুল মুমিনকে মার্‌রাকিশ নগরীর নিরাপত্তার দুর্বলতা ও বিভিন্ন গোপন বিষয় জানিয়ে দিলেন। ফলে আবদুল মুমিনের মার্‌রাকিশ জয়ের স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল হল। তিনি অবরোধ আরও মজবুত করলেন এবং মিনজানিক ও বুরুজ[১৬৩] স্থাপন করলেন। একসময় মার্‌রাকিশবাসীর শক্তি ফুরিয়ে এল এবং ক্ষুধার তাড়নায় তারা তাদের বাহনজন্তু জবাই করে খেতে শুরু করল। এরপর একসময় তাও ফুরিয়ে গেল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা গেল প্রায় এক লক্ষ মানুষ। লাশের দুর্গন্ধে পুরো শহরের বাতাস দূষিত হয়ে গেল।

মার্‌রাকিশে কিছু ইউরোপীয় সৈন্যও ছিল। মুরাবিতীগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে এদের সাহায্য নিত। এবারও তারা ইউরোপীয় সৈন্যদের সাহায্য কামনা করল। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাক, দীর্ঘ অবরোধে দুর্দশাগ্রস্ত ইউরোপীয় সৈন্যরা আবদুল মুমিনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দিলে তারা 'বাবে আগ্‌মাত' নামক নগরীর একটি প্রাচীরদ্বার খুলে দিল। আবদুল মুমিন তার সৈন্যদের নিয়ে অস্ত্রের জোরে শহরে প্রবেশ করলেন এবং শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে নগরী দখল করে নিলেন। মুওয়াহহিদী বাহিনী যাকেই সামনে পেল, নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল। এভাবে হত্যা করতে করতে তারা আমীরুল মুসলিমীনের বাসভবনে পৌঁছে গেল এবং কিশোর আমীর ইসহাক বিন আলীসহ রাজপ্রাসাদে অবস্থানরত সকল মুরাবিতী আমীরদের বের করে নিয়ে এসে হত্যা করল।

কিশোর ইসহাক গ্রেফতার হওয়ার পর প্রাণের ভয়ে কাঁদছিলেন এবং আবদুল মুমিনের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছিলেন। তার পাশেই ছিলেন বন্দী আরেক আমীর সায়র ইবনুল হাজ্ব। সায়র ইবনুল হাজ্ব ছিলেন নির্ভীক-দুঃসাহসী এক মুরাবিতী বীর। তিনি ভীত ইসহাকের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে বললেন, কার জন্য কাঁদছ? তোমার পিতা-মাতার জন্য? পুরুষ মানুষের মতো ধৈর্য ধর।

---

১৬৩. কাষ্ঠনির্মিত ঘূর্ণায়মান এক ধরনের অনতিউচ্চ চূড়া বা মিনার, যার ওপর কামান রেখে গোলন্দাজ বাহিনী কামান দাগে। মধ্যযুগে বিভিন্ন শহর অবরোধকালে বুরুজ ব্যবহার করা হত। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

তুমি যার কাছে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছ, তার কাছে খোদার ভয়, দ্বীনের নীতি কিছুই নেই। উপস্থিত মুওয়াহহিদী সৈন্যরা তার এ কথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল এবং তাকে কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

এরপর বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও ইসহাককে সামনে আনা হল এবং তার শিরোচ্ছেদ করা হল। এর মাধ্যমেই অবসান ঘটল সত্তর বছর ব্যাপ্ত মুরাবিতী সাম্রাজ্যের।

এই সময়কালে চারজন শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তারা হলেন ইউসুফ বিন তাশফীন, আলী বিন ইউসুফ, তাশফীন বিন আলী এবং সবশেষে ৫৪২ হিজরীতে নিহত ইসহাক বিন আলী।

মার্‌রাকিশ জয় করার পর আবদুল মুমিন একেই নিজের আবাসস্থল এবং মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে নির্ধারণ করলেন। মার্‌রাকিশে প্রবেশ করার পর তার আদেশে নির্বিচারে নগরবাসীকে হত্যা করা হল। অনেকে পালিয়ে গেল কিংবা আত্মগোপন করল। সাতদিন পর আবদুল মুমিনের নির্দেশে ঘোষণা করা হল, যারা জীবিত আছে, তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হল। তখন জীবিত নাগরিকগণ বের হয়ে এল। এ সময় মুওয়াহহিদী সৈন্যরা তাদেরকে হত্যা করতে চাইলে আবদুল মুমিন তাদেরকে নিবৃত্ত করে বললেন, এরা বিভিন্ন পেশাজীবী কিংবা ব্যবসায়ী। এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদেরই স্বার্থে। এরপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং তাদের মাধ্যমেই পুরো শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য লাশ সরানো হল। আবদুল মুমিন রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং অপূর্ব কারুকার্য ও অলঙ্করণে সুসজ্জিত করলেন। তিনি ইউসুফ বিন তাশফীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[১৬৪]

আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী *'আলমু'জিব'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> ইবনে তুমার্‌তের মৃত্যুর পর আবদুল মুমিন একের পর এক নগরীতে অভিযান চালাতে লাগলেন এবং বিভিন্ন নগরী জোরপূর্বক দখল করতে লাগলেন। এভাবে বহু নগরী তার পদানত হল, নগরবাসী তার (তরবারির) বশ্যতা স্বীকার করে নিল।[১৬৫]

সামগ্রিক বিবেচনায় মুরাবিতী ও মুওয়াহহিদী বাহিনীর মধ্যে আটাশ বছর

---

[১৬৪] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/২০১।

[১৬৫] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৭০।

Scanned with CamScanner

ধরে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত মুসলমানের সংখ্যা কয়েক লক্ষেরও বেশি। এ সংঘাতের সূচনা ৫১২ হিজরীতে (১১১৮ খৃস্টাব্দে) আর সমাপ্তি ৫৪১ হিজরীতে (১১৪৬ খৃস্টাব্দে) মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মুরাবিতী সাম্রাজ্যের আদলে এবার আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হল মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য। কিন্তু উভয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথ-পরিক্রমায় কত পার্থক্য! মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল লক্ষ লক্ষ মুসলমানের লাশের উপর, এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে। এটাই ছিল ইবনে তুমার্‌ত ও তার অনুসারীদের গৃহীত নীতি! এটাই তাদের সংশোধন ও সংস্কারের পদ্ধতি!

মুরাবিতী রাষ্ট্রের পতন ও মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহ

৫৪১ হিজরীতে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের পতন, মুওয়াহহিদী শক্তির উত্থান এবং উভয় দলের মধ্যকার সংঘাতে কেবল আন্দালুস-ভূমিতে আশি হাজারেরও অধিক মুসলমানের মৃত্যু– এসব ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের পরম্পরায় মাগরেব ও আন্দালুস উভয় অঞ্চলে মারাত্মক কিছু ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে আমাদের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই কেবল আন্দালুসে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। মুরাবিতী সাম্রাজ্যের পতন ও মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের উত্থানের অনিবার্য ফসলরূপে আন্দালুসে যা ঘটেছিল তা নিম্নরূপ।

১. মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক বছর পর ৫৪২ হিজরীতে (১১৪৭ খৃস্টাব্দে) খৃস্টানশক্তির হাতে আলমারিয়ার পতন ঘটে। আলমারিয়া দক্ষিণ আন্দালুসে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি উপকূলীয় শহর। অর্থাৎ আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো থেকে এর অবস্থান অনেক দূরে। কিন্তু খৃস্টানশক্তি ফ্রান্সের সহায়তায় সমুদ্রপথে আলমারিয়া দখল করে নেয়। এ সময় খৃস্টান বাহিনীর প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন হাজারো মুসলমান; খৃস্টানশক্তি বন্দী করে নিয়ে যায় চৌদ্দ হাজারের বেশি মুসলিম তরুণীকে।[১৬৬] ঐতিহাসিক মাক্কারী তিলিমসানী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> শুমারী অনুযায়ী বন্দী মুসলিম নারীর সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার।[১৬৭]

---

[১৬৬] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/৩৪৭, আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৭৯, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৪৬৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/১১৮।

[১৬৭] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৪৬৩।

Scanned with CamScanner

২. এর একবছর পর অর্থাৎ ৫৪৩ হিজরীতে (১১৪৮ খৃস্টাব্দে) খৃস্টানশক্তির হাতে পতন ঘটে প্রথমে তুরতুশা ও পরে লারেডা নগরীর। এ দু'টি নগরী উত্তর-পূর্ব আন্দালুসের জারাগোযা রাষ্ট্রে অবস্থিত। ইতঃপূর্বে মুরাবিতীগণ জারাগোযা পুনরুদ্ধার করেছিলেন।[১৬৮]

৩. একই বছর পর্তুগাল রাষ্ট্র দক্ষিণে আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং মুসলিম ভূখণ্ডের বড় অংশ পর্তুগালের দখলে চলে যায়। পর্তুগিজরা ছিল হিংস্রতা, নির্দয়তা ও হামলা চালিয়ে ক্ষতি করার ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলিম আন্দালুসের সবচে' বড় শত্রু।[১৬৯]

৪. খৃস্টশক্তি আন্দালুসের সীমা অতিক্রম করে সুদূর মাগরেবেও হামলা চালাতে শুরু করে। ৫৪৩ হিজরীতেই তারা তিউনিসিয়া দখল করে নেয়।[১৭০]

প্রকৃতপক্ষে আটলান্টিকের ওপারে মাগরেব ভূমিতে মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ও ফিতনা পরিস্থিতির পরিণতি হিসেবে এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহ মোটেই অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভাব্য কিছু ছিল না।

---

[১৬৮] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/৩৫৭ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১১৮।

[১৬৯] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৪/৫২৬ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ১/২৫৭।

[১৭০] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/৩৫০ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৫/২০৩।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগ

মাগরেবে আবদুল মুমিন বিন আলীর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, আবদুল মুমিন বিন আলী ছিলেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব; সুউচ্চ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও চিন্তাধারার অধিকারী। আর তাই তিনি সুবিন্যস্ত কার্যকরী পন্থায় নবগঠিত নবীন মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও বিনির্মাণে কাজ শুরু করেন। তার গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হল:

১. তিনি প্রচুর মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশীর বর্ণনামতে তিনি আহলে ইলম ও জ্ঞানসেবীদের মূল্যায়ন করতেন, প্রাধান্য দিতেন, তাদের প্রতি হৃদ্যতা পোষণ করতেন এবং তাদের সঙ্গে উদার আচরণ করতেন। বিভিন্ন দেশের আলিম-ওলামাকে তিনি তার রাজধানীতে তার তত্ত্বাবধানে বসবাস করতে অনুরোধ জানাতেন। তিনি তাদের জন্য সরকারী কোষাগার হতে সম্মানজনক ভাতা প্রদানের নির্বাহী আদেশ জারী করতেন এবং তাদের মর্যাদাপ্রদান ও খ্যাতির প্রশংসায় যত্নবান থাকতেন। তালিবে ইলমদেরকে তিনি দু' ভাগে বিভক্ত করেছিলেন: মুওয়াহহিদী তালিবে ইলম ও বিদেশী তালিবে ইলম। এর পূর্বেই তিনি ইবনে তুমার্‌তের রাখা নামানুসারে মুছাদামা জনগোষ্ঠীর নাম পরিবর্তন করে 'মুওয়াহহিদীন' রেখেছিলেন। এর কারণ ছিল, সে যুগে অন্য কোন জাতি তাদের মতো আকীদাশাস্ত্র নিয়ে এত বেশি গবেষণা-অধ্যয়ন করত না।[১৭১]

২. আবদুল মুমিন বিন আলী সামরিক শিক্ষাকে সরকারী শিক্ষাদান-ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করেন। তিনি তার রাজপ্রাসাদেই রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষাদান এবং দক্ষ রাজনৈতিক ও প্রশাসক তৈরির লক্ষ্যে একটি সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এখানকার শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা তিনি

---

[১৭১] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৬৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১৪৫।

Scanned with CamScanner

নিজে গ্রহণ করতেন। এর মাধ্যমে তিনি মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও বিচক্ষণ সেনাপতিদের এক অনন্য প্রজন্ম গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হন। তিনি তাদেরকে সব ধরনের সামরিক শাস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। এমনকি সমুদ্র-যুদ্ধের কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাগরেবে তিনি একটি কৃত্রিম হ্রদও খনন করেছিলেন। মুওয়াহহিদী যোদ্ধাদের পরীক্ষাও তিনি নিজে নিতেন।[১৭২]

৩. আন্দালুসের খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি বড় বড় অনেকগুলো সমরাস্ত্র কারখানা ও অস্ত্রগুদাম প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৩]

কিন্তু এর পাশাপাশি এ তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আবদুল মুমিন বিন আলী ছিলেন সম্পূর্ণ একক ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থাৎ বর্তমানের পরিভাষায় তিনি ছিলেন একনায়ক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন পরামর্শের তোয়াক্কা না করে তিনি একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অধিকন্তু তিনি ছিলেন চরম রক্তপাতকারী ঠাণ্ডা মাথার একজন খুনী। সে যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাইযাকের (al-Baydhaq) জরিপ অনুযায়ী তিনি তরবারি ব্যবহারের মাধ্যমে জনমনে ভীতি সঞ্চার ও রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে কেবল তার শাসনামলের শুরুতেই হত্যা করেছিলেন ত্রিশ হাজারেরও অধিক মানুষকে।[১৭৪]

একবার জনৈক ব্যবসায়ীর কিছু সম্পদ চুরি হলে যে গোত্রের অধ্যুষিত এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে, তিনি সে গোত্রের সকল প্রবীণ ব্যক্তিকে সমবেত করলেন এবং তাদের এলাকা থেকে ব্যবসায়ীর অপহৃত মাল বের করলেন। এরপর তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। প্রবীণ ব্যক্তিগণ কান্নাকাটি ও অনুনয়-বিনয় করে বলল, আমীরুল মুমিনীন! অপরাধীদের অপরাধের কারণে সৎ লোকদেরও পাকড়াও করবেন? তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকে আপন আপন এলাকা থেকে সকল অপরাধীদের বের করে নিয়ে এসো। ভীত-সন্ত্রস্ত বৃদ্ধ মানুষগুলো তাদের পুত্র, ভাই, চাচাতো ভাইসহ অপরাধীদের নিয়ে এল। এভাবে প্রায় এক শ' লোককে সমবেত করা হলে তিনি তাদের আত্মীয়দেরকেই তাদের

---

[১৭২] অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ১৫০।

[১৭৩] আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/১৪৩।

[১৭৪] বাইযাক, *আখবারুল মাহদী ইবনে তুমারত*, পৃ : ৬৯।

Scanned with CamScanner

হত্যা করার দায়িত্ব দিলেন। তারা তা-ই করল। উক্ত ব্যবসায়ীর ভাষ্য হল, 'এসব নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন আমার প্রাণনাশ করতে পারে এই আশঙ্কায় এরপর আমি মাগরেব ছেড়ে সিকিল্লিয়ায় চলে গেলাম।'[১৭৫]

তিনি সেই কাব্যপঙ্‌ক্তিটিকেই নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যা তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন,

وَحَكِّمِ السَّيْفَ لَا تَعْبَأْ بِعَاقِبَةٍ ... وَخَلِّهَا سِيْرَةً تَبْقَى عَلَى الْحِقَبِ

فَمَا تُنَالُ بِغَيْرِ السَّيْفِ مَنْزِلَةٌ ... وَلَا تُرَدُّ صُدُوْرُ الْخَيْلِ بِالْكُتُبِ

পরিণতি-চিন্তার পরোয়া না করে তরবারিকেই গ্রহণ কর শাসকরূপে,
তরবারিকেই বেছে নাও জীবনাদর্শরূপে, বেঁচে থাকবে কাল-কালান্তরে।
তরবারি ছাড়া লাভ করা যায় না কোন খ্যাতি ও মর্যাদা, কিতাবের
জোরে প্রতিহত করা যায় না অশ্বারোহী শত্রুবাহিনীর অগ্রযাত্রা।[১৭৬]

আবদুল মুমিন বিন আলীর উল্লিখিত কর্মসূচী ও পদক্ষেপসমূহ ছিল মাগরেব ভূমিকে কেন্দ্র করে। কারণ, তখনও আন্দালুস-ভূমি তার বিবেচনাভুক্ত হয়নি। মার্‌রাকিশ দখলের পর কিংবা কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের বক্তব্য অনুযায়ী ফেয ও তিলিমসান নগরী জয়ের পর তিনি আন্দালুসে কিছু কিছু বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করেন, যেন ভবিষ্যতে আন্দালুস জয় করে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের সঙ্গে একীভূত করা যায়। তখন পর্যন্ত তার মূল কার্যক্রম ও পরিকল্পনা মাগরেবকেন্দ্রিকই ছিল। কেননা, তিনি প্রথম মুরাবিতী সমর্থক-অধ্যুষিত মাগরেব অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে চেয়েছিলেন আর মাগরেবই ছিল মুরাবিতী সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র।

আন্দালুসে আবদুল মুমিন বিন আলী

মাগরেবে মুওয়াহহিদী শক্তির মোকাবেলায় মুরাবিতী শক্তির পরাজয়ের পর মুওয়াহহিদী বাহিনী আন্দালুসেও মুরাবিতীদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং একে একে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা আন্দালুসের বিভিন্ন নগরী জয় করে নেয়। ৫৪৩ হিজরীতে (১১৪৮ খৃস্টাব্দে) মুওয়াহহিদী বাহিনী কর্তৃক মুসলিম আন্দালুসের অধিকাংশ অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর কাযী ইবনুল আরাবী আন্দালুস থেকে মাগরেবে উপস্থিত হয়ে আবদুল মুমিন বিন আলীর হাতে

---

[১৭৫] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৩৮/২৫৯।
[১৭৬] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ২৯৭।

Scanned with CamScanner

খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন এবং খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্দালুসবাসীর জন্য সাহায্য কামনা করেন। আবদুল মুমিন বিন আলীর হাতে কাযী ইবনুল আরাবীর বাইআত গ্রহণের ঘটনা থেকেও আমরা এ প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারি যে, আবদুল মুমিন বিন আলী তখন না ইবনে তুমার্তের নিষ্পাপত্ব ও মাহদী হওয়ার ভ্রান্ত দাবি বিশ্বাস করতেন, না ইবনে তুমার্ত ও তার কিছু অন্ধ অনুসারীর লালন করা এ জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ প্রচার করতেন।[১৭৭]

কাযী ইবনুল আরাবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবদুল মুমিন বিন আলী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং আন্দালুসের উদ্দেশে রওয়ানা হন। শুরু হয় খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ। তিনি মুসলিম আন্দালুসের অধিকাংশ বৃহৎ নগরী জয় করে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। এসব যুদ্ধে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের কিছু সমর্থকও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের সকলকে পরাজিত করেন। এটি ৫৪৫ হিজরীর (১১৫০ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[১৭৮]

তিনি খৃস্টানশক্তির হাত থেকে ৫৫২ হিজরীতে (১১৫৭ খৃস্টাব্দে) আলমারিয়া এবং ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খৃস্টাব্দে) তিউনিসিয়া পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১৭৯] এর কিছুদিন পর তিনি লিবিয়াকেও মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। উল্লেখ্য, লিবিয়া ইতঃপূর্বে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল না।[১৮০]

এর মাধ্যমে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য পূর্বের মুরাবিতী সাম্রাজ্যের চেয়েও বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারী হয়। কারণ, ইতোমধ্যে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের সকল এলাকা মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের দখলে তো চলেই এসেছে; অধিকন্তু অতিরিক্ত লিবিয়ার বিস্তৃত এলাকা প্রথমবারের মতো এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবদুল মুমিনের আমলে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সীমানা মিশরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। তার পরিকল্পনা ছিল, মুসলিম বিশ্বের সকল বিভক্ত অঞ্চলকে একীভূত করে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসা।

---

[১৭৭] দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৩৪, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ১৪৭ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১১৭।

[১৭৮] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ২৬৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১১৬।

[১৭৯] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৯/৪১৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১২২।

[১৮০] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৩৭।

Scanned with CamScanner

ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন (৫৩৩-৫৮০ হি./১১৩৮-১১৮৪ ঈ.)

৫৫৮ হিজরীতে (১১৬৩ খৃস্টাব্দে) আন্দালুসে পরিচালিত এক অভিযানে পথিমধ্যে সিলা সীমান্তচৌকিতে আবদুল মুমিন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তার লাশ টিনমালে নিয়ে আসা হয় এবং ইবনে তুমার্তের কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

তার মৃত্যুর পর প্রথমে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র মুহাম্মাদ; কিন্তু অনাচার ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনের কারণে তাকে অপসারণ করা হয় এবং আবদুল মুমিনের আরেক পুত্র ইউসুফকে শাসনভার প্রদান করা হয়। এ সময় ইউসুফ বিন আবদুল মুমিনের বয়স ছিল বাইশ বছর। ইউসুফ একজন বীর যোদ্ধা ও উদারমনা ছিলেন; অবশ্য পিতার মতো অত্যুচ্চ যুদ্ধদক্ষতা তার ছিল না।[১৮১]

যিরিক্‌লী *'আলআ'লাম'* গ্রন্থে তার পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন প্রত্যয়ী ও বিচক্ষণ, সাহসী বীর, প্রজানীতিতে সুদক্ষ। ফিকহের ভালো জ্ঞান রাখতেন। দর্শন ও হিকমতশাস্ত্রের প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে বড় বড় অনেক আলিমকে তার রাষ্ট্রে সমবেত করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ। জামে সেভিল নির্মাণ তার অন্যতম কীর্তি। ৫৬৭ হিজরীতে তিনি এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। মাগরেবে প্রচলিত ইউসুফী মুদ্রার নামকরণ তার নামেই করা হয়েছিল। তিনি ও তার পরবর্তী মুওয়াহহিদী শাসকগণ বিভিন্ন শাহী ফরমান ও চিঠি-পত্রের শুরুতে মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের প্রতীকরূপে লিখতেন,
>
> اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه (সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য)[১৮২]

ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন ৫৫৮ হিজরী হতে ৫৮০ হিজরী (১১৬৩-১১৮৫ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা বাইশ বছর সুবিশাল মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি আন্দালুস ও মাগরেবে প্রশাসন ও শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন এবং খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তার শাসনব্যবস্থা একটি মারাত্মক দোষে

---

[১৮১] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩০৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১৪৪।

[১৮২] যিরিক্‌লী, *আলআ'লাম*, ৮/২৪১।

Scanned with CamScanner

দুষ্ট ছিল। শুরা ও মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি একনায়কতন্ত্রকে নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তার পিতা ও ইবনে তুমার্তের প্রধান সহযোগী আবদুল মুমিন বিন আলীর শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রতিপালনেরই প্রভাব।

ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযানে পশ্চিম আন্দালুসের সান্তারিন শহরের নিকটে মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে একটি সিদ্ধান্তগত ভুল তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। আসুন, সে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা যাহাবী রহ.-এর যবানীতেই জেনে নিই।

৫৭৯ হিজরীতে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং পাহাড়বাসী, শহরবাসী, আরব বংশোদ্ভূত সবাইকে সেনাদলে শরীক হতে আহ্বান জানালেন। বাহিনী নিয়ে তিনি প্রথমে আন্দালুসের সেভিলে অবতরণ করলেন। এরপর সেখান থেকে আন্দালুসের পশ্চিমাংশে অবস্থিত সান্তারিনের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তাআ'লা এ ভূমিকে আবারও মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিন। খৃস্টান শাসক ইবনে রীক (প্রথম আলফোন্সো)-আল্লাহ তাকে অভিশম্পাত করুন- সান্তারিন দখল করে নিয়েছিল। আবু ইয়াকুব (ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন) সান্তারিনে পৌঁছেই নগরী অবরোধ করলেন এবং নগরপ্রাচীর-সংলগ্ন গাছ-পালা কেটে ফেললেন। দীর্ঘদিন অবরোধ অব্যাহত থাকার পর প্রচণ্ড শীত ও নদীপথের আধিক্যের কারণে মুসলিম বাহিনী নানাবিধ সমস্যায় পড়ে গেল। তারা আবু ইয়াকুবকে অভিযান স্থগিত রেখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করে বললেন, আমরা আগামীকাল প্রস্থান করব।

কিন্তু আবুল হাসান আলী বিন কাযী আবদুল্লাহ মালাক্বী নামক জনৈক খতীবের তর সইছিল না। তিনি সেদিনই তার তাঁবু গুটিয়ে ফেললেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তাই তাকে তাঁবু গুটাতে দেখে তার কর্মকেই সিদ্ধান্ত ভেবে আরও অনেকে আপন আপন তাঁবু গুটাতে শুরু করল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই (মুসলিম) বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য নদী পাড়ি দিয়ে অপর পারে চলে গেল। ভীড়ের আশঙ্কায় অনেকেই আগে আগে নদী পাড়ি দিতে চাইল এবং পুরো রাত মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের নদী পাড়ি দেওয়া অব্যাহত রইল। আবু ইয়াকুব এর কিছুই জানতেন না। খৃস্টানরা

Scanned with CamScanner

যখন তাদের গুপ্তচরদের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর প্রস্থান সম্পর্কে অবগত হল, তখন একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং মুসলিম ছাউনির ওপর হামলা চালাল। সামনের সারির সৈন্যদেরকে পরাভূত করে তারা আবু ইয়াকুবের শিবির পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আমীরুল মুমিনীনকে রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সৈনিক তার তাঁবুর দ্বারে শহীদ হলেন। ফলে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অক্ষত হয়ে পড়ল এবং শত্রুদলের একজন তার নাভির নিম্নদেশে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। এদিকে প্রস্থানরত মুসলিম বাহিনী খৃস্টান বাহিনীর হামলার সংবাদ পেয়ে দ্রুত ফিরে এসে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করল এবং খৃস্টান বাহিনী পরাজিত হয়ে শহরে ফিরে গেল। কিন্তু ক্ষতি যা করার, তা তো তারা করেই ফেলেছে। মুওয়াহহিদী বাহিনী গুরুতর আহত আবু ইয়াকুবকে পালকিতে নিয়ে নদী পার হল। এর দু'-তিন রাত পরেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।[১৮৩]

ইউসুফ বিন আবদুল মুমিনের আমলের কয়েকজন আন্দালুসী আলিম

১. ইবনুল আওয়াম আলইশবীলী রহ.

তার পুরো নাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ। তিনি ইবনুল আওয়াম আলইশবীলী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসে ইসলামী সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার অশান্তিপূর্ণ সময়কালের নাগরিক। বসবাস করতেন বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদরাজিতে সুশোভিত এবং শ্যামলতা ও কৃষিশাস্ত্রে সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত সেভিলের ওয়াদিল কাবীর অঞ্চলে।

ইবনুল আওয়াম কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইবনুল আওয়াম ও তার মতো আরও কিছু

---

[১৮৩] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৪০/৩২৩। আরও দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৩২।

Scanned with CamScanner

সুদক্ষ আন্দালুসী মুসলিম কৃষিবিদ আলিম যদি না হতেন, তাহলে নিশ্চিত করেই বলা যায়, খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপ সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছতে পারত না। মুসলিম-অমুসলিম কৃষিবিজ্ঞানীগণ নির্বিশেষে সকলেই মৃত্তিকাবিদ্যা, সার, চাষাবাদ, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ইবনুল আওয়ামের যুগান্তকারী বিভিন্ন আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং এসব গবেষণা সম্প্রতি বিদেশি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। তার প্রচুর অভিজ্ঞতা ও গবেষণাধর্মী দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল হিসেবে আরবগণ এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপের অধিবাসীগণ মাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, সারমিশ্রণ পদ্ধতি, চারা রোপণ-চাষাবাদ ও সেচের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে ইবনুল আওয়ামের রচিত অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন একটি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থটি কেবল কৃষিশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বসমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই মর্যাদা লাভ করেছে তা নয়; বরং আন্দালুস-ভূমিতে কৃত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে অর্জিত রসায়ন ও পদার্থশাস্ত্র সম্পর্কে তার আবিষ্কৃত নতুন নতুন সূত্র ও চিন্তাধারার আলোচনার কারণেও এর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। পূর্বতন কৃষিবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাসমূহকেও এতে সংক্ষেপে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটির মানসম্মত তাহকীক ও সম্পাদনা এখনও হয়নি।[১৮৪]

ইবনুল আওয়াম আঙুর গাছ প্রতিপালন সম্পর্কেও একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। 'উয়ূনুল হাকাইক ওয়া ঈযাহুদ দাক্বায়িক' (عيون الحقائق وإيضاح الدقائق) নামে এর হস্তলিখিত একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মহান আলিম ৫৮০ হিজরীতে (১১৮৫ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।[১৮৫]

২. ইবনে তুফাইল রহ.

বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে তুফাইলের পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন তুফাইল আলকাইসী। জন্ম ৪৯৪ হিজরীতে (১১১০ খৃস্টাব্দে)। তিনি দক্ষিণ আন্দালুসের 'আশ'

---

[১৮৪] দেখুন : মুহাম্মাদ আমীন ফারশূখ, *মাওসুআ'তু আ'বাকিরাতিল ইসলাম*, ৫/১৮৪।

[১৮৫] দেখুন : যিরিক্‌লী, *আলআ'লাম*, ৮/১৬৫।

Scanned with CamScanner

উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের কালজয়ী গ্রন্থ 'রিসালাতু হাই বিন ইয়াক্বযান' (رسالة حي بن يقظان) তার অমর কীর্তি।

লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব তার সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলিম, প্রাজ্ঞ দার্শনিক, মনীষীদের উক্তি ও মতামত সম্পর্কে জ্ঞানী, প্রাচ্যের দর্শনের বিশেষ অনুরাগী, গবেষক, দরবেশ, দক্ষ চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ফকীহ, সুসাহিত্যিক, গদ্য ও পদ্যের নিপুণ কারিগর; এককথায় সকল শাস্ত্রে সমান দক্ষ।[১৮৬]

মার্‌রাকিশী তার সম্বন্ধে *'আলমু'জিব'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> শেষ জীবনে তিনি সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে কেবল ইলমে ইলাহীতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তিনি শরীয়ত ও দর্শনের সামঞ্জস্যবিধানে যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় ক্ষেত্রে নববী আদর্শকে স্বশ্রদ্ধ অনুকরণ করতেন। অধিকন্তু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তার সমান দক্ষতা ছিল। এককথায় আবু বকর ছিলেন সমকালের এক অনন্য অবদান।[১৮৭]

আমীরুল মুমিনীন ইউসুফ বিন আলীর রাজদরবারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ ও প্রাজ্ঞ আলিমগণকে সমবেত করার দায়িত্ব ইবনে তুফাইল আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আলিমসমাজকে সম্মান ও তাযীম করা এবং তাদের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বপ্রদানের জন্য খলীফাকে উৎসাহিত করতেন। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও খ্যাতনামা দার্শনিক আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদকে তিনিই খলীফার দরবারে নিয়ে এসেছিলেন। এখান থেকেই ইবনে রুশদ খ্যাতি লাভ করেন এবং আপন মর্যাদার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হন।[১৮৮]

ইবনে তুফাইলের অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য মানসমৃদ্ধ কিছু কবিতা রয়েছে।[১৮৯] যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে তার রচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হল,

يَا بَاكِيًا فُرْقَةَ الْأَحْبَابِ عَنْ شَحَطٍ هَلَّا بَكَيْتَ فِرَاقَ الرُّوْحِ لِلْبَدَنِ؟!

نُوْرٌ تَرَدَّدَ فِيْ طِيْنٍ إِلَى أَجَلٍ فَانْحَازَ عُلْوًا وَخَلَّى الطِّيْنَ لِلْكَفَنِ

---

[১৮৬] লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আলআ'লাম*, ৮/১৬৫।

[১৮৭] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩১২।

[১৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩১৪।

[১৮৯] সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১/৪৬৩।

Scanned with CamScanner

মন! প্রিয়জনের বিরহ যাতনায় কাঁদছ! দেহপিঞ্জির হতে রূহপাখির বিচ্ছেদে তবে কাঁদনি কেন?!

রূহ নামের এক আলোকচ্ছটা মাটির পিঞ্জিরার মাঝে কিছুদিন বিচরণ করেছে, তারপর মাটির দেহকে কাফনের আচ্ছাদনে ফেলে রেখে দূর উচ্চতায় পাড়ি জমিয়েছে।

يَا شَدَّ مَا افْتَرَقَا مِنْ بَعْدِ مَا اعْتَلَقَا أَظُنُّهَا هُدْنَةً كَانَتْ عَلَى دَخَنٍ
إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ رِضَا اللهِ اجْتِمَاعُهُمَا فَيَا لَهَا صَفْقَةً تَمَّتْ عَلَى غَبَنٍ

দেহ-আত্মার প্রগাঢ় ভালোবাসার পর এই হঠাৎ বিচ্ছেদ কতই না কষ্টের! হায়! আমি তো এ মৌনতাকে ভেবেছিলাম প্রশান্তির নীরবতা, ভেজা কাষ্ঠখণ্ডের ধোঁয়ার মতো!

দেহ-আত্মার এই ক'দিনের একত্রবাস যদি না হয়ে থাকে আল্লাহর তরে, তবে ভুল সবই ভুল, এ যে প্রবঞ্চনার চুক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়![১৯০]

ইবনে তুফাইল ৮৭ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি ৫৮১ হিজরীতে (১১৮৫ খৃস্টাব্দে) মার্‌রাকিশে ইন্তেকাল করেন। তার জানাযায় খলীফা ইয়াকুব আলমানসুর উপস্থিত ছিলেন।[১৯১]

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদী ও মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ

ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন বিন আলীর তিরোধানের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ইয়াকুব বিন ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন[১৯২]। তাকে 'আলমানসুর' উপাধি প্রদান করা হয়। তার এক পুত্রের নাম ইউসুফ ছিল বিধায় তিনি আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদী নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইবনে খাল্লিকান তার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন বিন আলী আলকাইসী আলকুমী মাগরেবের শাসক। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী, তামাটে বর্ণের, সুদর্শন চেহারাবিশিষ্ট, চওড়া মুখ ও কাজল-কালো আয়তলোচন বিশিষ্ট, মাংসল শরীরের

---

[১৯০] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩১৩-৩১৪।

[১৯১] সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১/৪৬৩।

[১৯২] জন্ম ৫৫৪ হিজরী মোতাবেক ১১৬০ খৃস্টাব্দে, মৃত্যু ৫৯৫ হিজরী মোতাবেক ১১৯৯ খৃস্টাব্দে।

Scanned with CamScanner

অধিকারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট অলঙ্কারপূর্ণ সত্যভাষী, সঠিক ধারণা পোষণকারী, প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ। তিনি তার পিতার শাসনামলে উযীরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাই তখন থেকেই তিনি সকল বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বাবধান এবং গভর্নর ও সরকারী কর্মকতাদের পরিচালনা করার গুণ অর্জন করেছিলেন। তার এই অভিজ্ঞতা তাকে প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে জানতে সহায়তা করেছে। পিতার মৃত্যুর পর মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং আবদুল মুমিনের পরিবার একসঙ্গে বসে তাকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করে। এরপর সকলে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে এবং তার নেতৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে। তার পিতা ও পিতামহের ন্যায় জনগণ তাকেও আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকতে থাকে এবং তাকে 'আলমানসুর' উপাধি প্রদান করে। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। এর ফলে তার রাজত্ব ও শাসনব্যবস্থার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হিলালী পতাকা উড্ডীন করেন, সমাজে ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধর্মীয় বিষয়াদি, তাকওয়া ও আল্লাহভীতি, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করেন এবং সাধারণ জনগণের পাশাপাশি নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মাঝেও হুদূদ ও শরয়ী দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তার শাসনামলে রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং বিভিন্ন মহান অভিযানে বিজয় অর্জিত হয়।

পিতার মৃত্যুর সময় তিনি তার পাশেই ছিলেন। আর তাই শুরু থেকেই তিনি সুদক্ষ হস্তে প্রশাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি আন্দালুসের ঘাঁটিসমূহ সুবিন্যস্ত করেন এবং যাবতীয় সমস্যা দূরীভূত করেন। তিনি যোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন ঘাঁটির কেন্দ্রে মোতায়েন করেন এবং মাত্র দু' মাসে ঘাঁটিগুলোর সকল প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি নামাযে সূরা ফাতেহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করার আদেশ জারী করেন এবং ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় এ বিধান জারী করার অনুরোধ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। কোন কোন সম্প্রদায় তার প্রস্তাব মেনে নেয়, আবার কেউ কেউ বিরোধিতাও করে।[১৯৩]

---

[১৯৩] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/৩-৪।

Scanned with CamScanner

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানুসর মুওয়াহহিদী ৫৮০ হিজরী হতে ৫৯৫ হিজরী (১১৮৪-১১৯৯ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা পনের বছর মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচে' শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব; বরং পুরো মুসলিম ইতিহাসেরই অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যে তার শাসনামলকে 'স্বর্ণযুগ' বলে গণ্য করা হয়। তার চরিত্রের প্রশংসনীয় দু'টি মানবিক উপাদানের মাধ্যমে আমরা আন্দালুসে তার কর্ম-আদর্শকে অনুধাবন করতে পারি।

১. ব্যক্তি আলমানসুর মুওয়াহহিদী

ব্যক্তিগুণের বিবেচনায় আবু ইউসুফকে গণ্য করা যায় আন্দালুসের মহান শাসক আবদুর রহমান আদদাখিল ও তার পরবর্তী আবদুর রহমান আননাসিরের মতো মহান শাসকবর্গের কাতারে। তারা এমন সুবিশাল কর্মযজ্ঞের আঞ্জাম দিয়েছেন, যা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অনেক শাসকও পারেননি। আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানুসর মুওয়াহহিদী মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।[১৯৪] এ বয়সেই তিনি চমৎকারভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন, খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ইসলামের পতাকা সমুন্নত করেন, সমাজে ন্যায়ের নিক্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উৎকৃষ্টতর ও কল্যাণকর পন্থায় আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মুনকার, ওয়ায-নসীহত ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানুসর মুওয়াহহিদী তার পূর্ববর্তী মুওয়াহহিদী শাসকবর্গের ধারাকে অনেকটা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্থির ও প্রশান্তভাব, ন্যায়পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা ছিল তার অন্যতম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। এমনকি তিনি পথচলার সময় দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অসহায় নারী ও দুর্বলদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।[১৯৫] পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তিনি নিজেই ইমামতি করতেন[১৯৬]। তিনি দুনিয়াবিরাগী ছিলেন; মোটা ও অমসৃণ পশমী

---

[১৯৪] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ১৭০ ও ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২১৭। অন্যান্য বর্ণনায় আছে, তখন তার বয়স ছিল ৩২ বছর। দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ মাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৩৬, যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩১২ ও *তারীখুল ইসলাম*, ৪২/২১৩।

[১৯৫] দেখুন : যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৪২/২২৫ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১৯৯।

[১৯৬] অবশ্য পরবর্তীতে তিনি ইমামতি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর কারণ এই ছিল যে, ঘটনাক্রমে

Scanned with CamScanner

কাপড় পরিধান করতেন। তিনি তার পরিবার-নিকটআত্মীয়সহ সমাজের সর্বস্তরে শরয়ী হুদুদ ও শাস্তি-আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন। ফলে রাষ্ট্রের পরিস্থিতি ছিল স্থিতিশীল আর একের পর এক বিজয়াভিযান রাষ্ট্রকে করেছিল সমৃদ্ধ।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানুসর মুওয়াহহিদীর এসব পদক্ষেপ রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নীত করেছিল। তিনি মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন[১৯৭] এবং দর্শনের গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।[১৯৮] চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রকৌশল-বিদ্যার প্রতি তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মুরাবিতী আমলের শেষাংশ ও মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের শুরুতে ব্যাপক প্রচলন লাভ করা নিষ্ফল ইলমী বিতর্ক ও মোনাযারার প্রথা তিনি বাতিল ঘোষণা করেন।[১৯৯] তিনি আলিমদের জন্য মঞ্জুরীর পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তার শাসনামলে সৎ-ধার্মিক ও হাদীসশাস্ত্রে নিমগ্ন ব্যক্তিদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানসেবী ব্যক্তিরাই তার আমলে সরকারের আনুকূল্য লাভ করত। তার কাছে এবং জনসাধারণের কাছে আলিম-ওলামার মর্যাদা ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের সৎ ও গুণী ব্যক্তিদের তিনি তার দরবারে আহ্বান জানাতেন এবং মাঝে মধ্যে তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে দোয়া চাইতেন। তার সঙ্গে কেউ সম্পর্ক স্থাপন চাইলে তিনি তার সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন।[২০০] তিনি নিজে ছিলেন ইবনে হায্ম যাহেরীর মতবাদের প্রতি অনুরক্ত। তাই তিনি মাযহাবের শাখাগত মাসআলা সংক্রান্ত কিতাবাদি জ্বালিয়ে দেন এবং সবাইকে কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ-গ্রন্থের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেন।[২০১]

একদিন তিনি আসর নামাযের সময় মসজিদে উপস্থিত হতে দেরী করে ফেলেন। ততক্ষণে আসরের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হওয়ার উপক্রম। উপস্থিত মুসল্লীগণ বসে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি উপস্থিত হয়ে প্রথমে নামায পড়ালেন। এরপর উপস্থিত জনসাধারণকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে বললেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমাদের নামায কেবল আমার জন্য; নয়তো আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কেন তোমাদের একজনকে নামায পড়ানোর জন্য সামনে বাড়িয়ে দিলে না? নবীজীর অনুপস্থিতিতে একদিন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে সাহাবায়ে কেরাম কি আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি.-কে ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর করেননি? হেদায়েতের চেরাগ অনুসরণীয় জামাত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কি তোমাদের কোন আদর্শ নেই? এ কারণেই তিনি এরপর থেকে ইমামতি ছেড়ে দেন। দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৬১ ও যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৪২/২১৯।

[১৯৭] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ১৭৩।

[১৯৮] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ মাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৮৫ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩১৭।

[১৯৯] আবদুল ওয়াহিদ মাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৫৪।

[২০০] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৫৪।

[২০১] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৫৫।

Scanned with CamScanner

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানুসর মুওয়াহহিদী তার রাষ্ট্রের সভ্যতা ও নাগরিক-ব্যবস্থার উন্নয়নেও যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তিনি তার পিতা ইউসুফের প্রণয়নকৃত নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী রাবাত শহরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন এবং এর নাম রাখেন 'রিবাতুল ফাতহ' (বিজয় চৌকি)।[২০২] রাবাত (Rabat)[২০৩] নগরীতেই তিনি এক সুবিশাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী এ হাসপাতালের বিবরণ দিতে গিয়ে একে চোখ ধাঁধানো বিস্ময় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> তিনি (আবু ইউসুফ আলমানুসর) মার্‌রাকিশ নগরীতে এমন একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমার ধারণামতে পুরো পৃথিবীতে এর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি প্রথমে শহরের সবচে' মনোরম, সমতল, প্রশস্ত ও বিস্তৃত একটি ময়দান নির্বাচন করেন। এরপর তিনি প্রকৌশলী ও স্থপতিদেরকে তার চাহিদা ও পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেন এবং সর্বাধুনিক নকশা অনুযায়ী এর ভবনগুলো নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ স্থপতিগণ তার নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবনার চেয়েও সুন্দর নকশায় বিচিত্র ও চমৎকার কারুকার্যমণ্ডিত হাসপাতালটি নির্মাণ করে। এরপর তিনি সেখানে সব ধরনের সুগন্ধি ও ফলজ গাছের চারা রোপণ করার নির্দেশ দেন। তিনি হাসপাতালের প্রতিটি ভবনের প্রতিটি কক্ষে পৌছার জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করেন। হাসপাতাল-সীমানার মধ্যস্থলে নির্মাণ করা হয় অতিরিক্ত আরও চারটি জলাশয়, যার একটি ছিল শ্বেত মার্বেল পাথরের তৈরি। এরপর তিনি হাসপাতালের রোগীদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের পশম ও উল (Wool), শন ও লিনেন (Lenen), রেশম ও চামড়ার তৈরি বর্ণনাতীত হরেক রকমের শয্যার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। রোগীদের আহার ও হাসপাতালের অন্যান্য বিশেষ ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সরকারী কোষাগার হতে দৈনিক ত্রিশ দীনার মঞ্জুর করেন। ঔষধের খরচ ছিল এই হিসাবের

---

[২০২] আবদুল ওয়াহিদ মাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৪১ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩১৩।

[২০৩] মাগরেবের আঞ্চলিক উচ্চারণে 'রিবাত' শব্দটিকে রাবাত উচ্চারণ করা হত। এ কারণেই বর্তমান মরক্কোর রাজধানী এই নগরীটি 'রাবাত' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

বাইরে। রোগীদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের পানীয়, তেল, সুরমা-কাজল ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য তিনি একদল দক্ষ ভেষজবিজ্ঞানীকে নিয়োগ দেন এবং ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রোগীদের পরিধানের জন্য হাসপাতালটিতে রাত-দিন, শীত-গ্রীষ্মের জন্য স্বতন্ত্র পোশাক ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে সেবাগ্রহণকারী কোন রোগী যখন সুস্থ হয়ে যেত, তখন সে দরিদ্র হলে তাকে পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বনির্ভর ও নিজের কাজ নিজে করার মতো সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সময়কালের জন্য ভাতা প্রদান করা হত; আর রোগী স্বচ্ছল ব্যক্তি হলে তাকে তার প্রদত্ত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হত। হাসপাতালটি ধনী-দরিদ্র সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। মার্‌রাকিশ নগরীর নবআগন্তুক কেউ অসুস্থ হলে তাকেও হাসপাতালে নিয়ে আসা হত এবং সুস্থ হওয়া (বা মৃত্যুবরণ করা) পর্যন্ত চিকিৎসা প্রদান করা হত। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর ঘোড়ায় আরোহণ করে হাসপাতালটি পরিদর্শন করতেন। তিনি রোগীদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের কী অবস্থা? কেমন আছেন? পরিবারের প্রধান ব্যক্তির সংবাদ কী?-এ জাতীয় বিভিন্ন বিষয়। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে আসতেন। আমৃত্যু তার এই অভ্যাস জারী ছিল।[২০৪]

তিনি নিজে জনগণের যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতেন এবং প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতেন। তিনি উদারহস্ত ও অকুণ্ঠব্যয়ী ছিলেন। একবার ঈদের দিন তিনি দরিদ্রদের মাঝে সত্তর হাজারের অধিক বকরী বিতরণ করেছিলেন।[২০৫]

২. ইবনে তুমার্‌তের ভ্রান্ত দাবিসমূহ হতে আলমানসুর মুওয়াহহিদীর দায়মুক্তি ঘোষণা

আলমানুসর মুওয়াহহিদীর এই দায়মুক্তির বিষয়টি তার পুত্র ও পরবর্তী খলীফা মামুনের বক্তব্য দ্বারা প্রতিভাত হয়। মামুন যখন ইবনে তুমার্‌তের মাহদী হওয়ার দাবিকে বাতিল ঘোষণা করেছিলেন[২০৬] এবং এ সংক্রান্ত

---

[২০৪] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৬৪।

[২০৫] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩১৭।

[২০৬]. আলমানসুর-পুত্র ও পরবর্তী মুওয়াহহিদী খলীফা মামুন ৬২৬ হিজরীতে ইবনে তুমার্‌তের মাহদী-

Scanned with CamScanner

রাজকীয় প্রথাসমূহ (যেমন ইবনে তুমার্তের নামের সঙ্গে ইমাম মাহদী যোগ করা, খোতবায় মাহদী হিসেবে তার নাম পাঠ করা, তার গ্রন্থাদিকে মাহদী-রচিত গ্রন্থ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি) বিলোপ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এখন আমরা যে শাহী ফরমান ঘোষণা করছি, আমাদের সর্দার আলমানসুর রহ.-ও এই ঘোষণা প্রচারের মনস্থ করেছিলেন। আমরা আজ উম্মাহর যে ফাটলকে মেরামত করছি, তিনিও এ ফাটল মেরামত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তি তাকে প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ দেয়নি। তাই আমাদের বিশ্বাস, তিনি তার প্রতিপালকের কাছে গমন করেছেন সদিচ্ছা ও নিষ্ঠাপূর্ণ নমনীয়তা নিয়ে। ওলামায়ে কেরামের মতে ইসমাত ও নিষ্পাপত্ব যখন সাহাবায়ে কেরামের জন্যই প্রমাণিত নয়, সুতরাং এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কী করে নিষ্পাপ হওয়ার আকীদা রাখা যাবে, যিনি জানেন না যে, (কাল কেয়ামতের দিন) কোন হাতে তিনি আপন আমলনামা গ্রহণ করবেন?[২০৭]

আলমানসুর মুওয়াহহিদীর দরবার সবসময় আলিম-ওলামা, সৎ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ভরপুর থাকত। আল্লামা যাহাবী রহ. *'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> তিনি কোরআন ও হাদীসের দক্ষ হাফিয ছিলেন; পাশাপাশি তিনি ফিকহ নিয়েও আলোচনা ও ইলমী পর্যালোচনায় অংশ নিতেন। তিনি

দাবি বাতিল ঘোষণা করেছিলেন এবং এই মর্মে শাহী ফরমান জারী করেছিলেন যে, সকলে যেন জেনে রাখে, আমরা মিথ্যাকে ছুঁড়ে ফেলেছি এবং সত্যকে প্রকাশ করেছি। ঈসা বিন মারইয়ামের যমানায় আগত মাহদী ছাড়া আর কোন মাহদী নেই। মায়ের কোলে কথা বলার কারণে মাহদী নাম রাখা সুস্পষ্ট বিদআত, আমরা তা অপনোদন করেছি। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এ বিশ্বাসে অটল থাকতে সাহায্য করুন। আর আমরা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'ইসমাত' শব্দের ব্যবহার দূর করেছি, যার নিষ্পাপত্ব প্রমাণিত নয়। আমরা এ সংক্রান্ত শাহী প্রথাসমূহও বাতিল ঘোষণা করলাম। আজ থেকে এ দাবি অপ্রমাণিত, বিলুপ্ত ঘোষিত হল। আর এখন আমরা যে শাহী ফরমান ঘোষণা করছি, আমাদের সর্দার আলমানসুর রহ.-ও এই ঘোষণা প্রচারের মনস্থ করেছিলেন। আমরা আজ উম্মাহর যে ফাটলকে মেরামত করছি, তিনিও এ ফাটল মেরামত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তি তাকে প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ দেয়নি। তাই আমাদের বিশ্বাস, তিনি তার প্রতিপালকের কাছে গমন করেছেন সদিচ্ছা ও নিষ্ঠাপূর্ণ নমনীয়তা নিয়ে। ওলামায়ে কেরামের মতে ইসমাত ও নিষ্পাপত্ব যখন সাহাবায়ে কেরামের জন্যই প্রমাণিত নয়, সুতরাং এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কী করে নিষ্পাপ হওয়ার আকীদা রাখা যাবে, যিনি জানেন না যে, (কাল কেয়ামতের দিন) কোন হাতে নিজ আমলনামা গ্রহণ করবেন? ... এরপর মামুন সমগ্র মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রে খোতবা থেকে ইমাম মাহদীর আলোচনা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন, বার্তা-ফরমান, রাষ্ট্রীয় মুদ্রা থেকে তার নাম মুছে ফেলেন এবং নামাযের পর মাহদীর নামে শ্লোগান দেওয়ার প্রথা বন্ধ করে দেন। এছাড়াও এ জাতীয় অন্য যেসব পন্থা মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে চালু ছিল, তিনি সেগুলো বিলোপ করেন।

[২০৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ২৮৬-২৮৭।

Scanned with CamScanner

> বিশুদ্ধভাষী ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সবসময় দুনিয়াবিরাগী ও আলিমগণের ন্যায় সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। তারপরও তার রাজকীয় জালাল ও প্রতাপ একটুও হ্রাস পেত না।[২০৮]

ইবনে তুমার্তের কোরআন-সুন্নাহবিরোধী চিন্তাধারাকে অস্বীকৃতি জানানোয় নিশ্চিতকরেই আলমানসুর মুওয়াহহিদী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'হ ও সৎ-সংশোধিত জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর যুগে যুগে আল্লাহ তাআ'লা এ জামাত দ্বারাই তার দ্বীনের বিজয় ও শক্তিশালীকরণ এবং তার প্রিয় বান্দাদের সম্মান, ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা বাস্তবায়ন করে থাকেন। ঐতিহাসিক মার্‌রাকিশী এমন একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা আলমানসুর মুওয়াহহিদীর এই দায়মুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

> আমি একদিন শায়খে সালেহ আবুল আব্বাস আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন মুতাররিফ আলমিরীর সঙ্গে হারাম শরীফে হাজরে আসওয়াদের পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন আবু ইউসুফ আমাকে বলেছেন, হে আবুল আব্বাস! তুমি আল্লাহর দরবারে আমার পক্ষ হয়ে সাক্ষী দিও যে, আমি ইসমাতের (অর্থাৎ ইবনে তুমার্তের নিষ্পাপ হওয়ার) আকীদা পোষণ করি না। আরেকদিন আমি (আবুল আব্বাস) ইমামের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়, এমন একটি কাজ করার জন্য আমীরুল মুমিনীনের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে বললেন, আবুল আব্বাস! কোথায় ইমাম?! কীসের ইমাম?![২০৯]

মার্‌রাকিশী রহ. আরও লিখেছেন,

> আন্দালুস উপদ্বীপের জাইয়ান নগরীর অধিবাসী জনৈক শায়খের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সেখানকার একটি প্রসিদ্ধ পরিবারের সদস্য। তার নাম আবু বকর বিন হানী। আমি যখন তার সাক্ষাৎ লাভ করি, তখন তিনি একেবারেই বয়োবৃদ্ধ। তিনি আমাকে শুনিয়েছেন, আমীরুল মুমিনীন -অর্থাৎ আলমানসুর মুওয়াহহিদী- যখন আযফুনাশ ও তার বাহিনীকে পরাজিত করে আরিকের যুদ্ধক্ষেত্র

---

[২০৮] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩১৬।

[২০৯] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৬৯।

Scanned with CamScanner

থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। যেহেতু আমি ছিলাম ভিনদেশী, তাই সেখানকার অধিবাসীগণ আমাকে তার সঙ্গে আগে কথা বলার সুযোগ করে দিল। আমি তার সামনে উপস্থিত হলে তিনি তার রীতি অনুযায়ী আমাকে আমাদের এলাকার অবস্থা, সরকারী প্রশাসনে কর্মরত গভর্নর, কর্মকর্তা ও বিচারকদের হাল-হাকীকত জিজ্ঞেস করলেন। তার এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর তিনি আমাকে আমার নিজের অবস্থাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করলাম। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ইলমে দ্বীন শেখার জন্য কী কী কিতাব অধ্যয়ন করেছ? উত্তরে আমি বললাম, ইমাম (অর্থাৎ ইবনে তুমার্‌ত)-এর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছি। এ কথা শোনামাত্র তিনি আমার দিকে ক্রোধভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কোন তালিবে ইলম এ ধরনের কথা বলতে পারে?! তোমার তো বলা উচিত ছিল, আমি কোরআন পড়েছি, কিছু সুন্নাহ পড়েছি। এরপর যা ইচ্ছে, বলতে।[২১০]

তিনি জনগণের কথা শোনার জন্য সাধারণ বৈঠকের ব্যবস্থা করতেন। সমাজের ছোট-বড় কারও সেখানে প্রবেশে বাধা ছিল না। একবার দু'জন ব্যক্তি মাত্র অর্ধ দিরহামের একটি বিচার নিয়ে তার দরবারে উপস্থিত হল। তিনি প্রথমে তাদের মোকাদ্দমার সমাধান করলেন। এরপর তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশপ্রধান উযীর আবু ইয়াহইয়াকে আদেশ করলেন এদের দু'জনকে অতি সামান্য শিষ্টাচারমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য। এরপর তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, বল, এ ধরনের অতি সাধারণ বিষয়ের সমাধান করার জন্য রাষ্ট্রে কি কোন বিচারক নিযুক্ত করা হয়নি?

অবশ্য এ ধরনের ঘটনাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মানুষের বিশেষ বিশেষ সমস্যাদি সমাধানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে মজলিস আয়োজন করতে, যেন সেসব বিষয়ের সমাধানও হয়ে যায়, যেগুলোর সমাধান তিনি ছাড়া অন্য কেউ করবেন না।

তিনি বাজারের তত্ত্বাবধায়ক, নগরীর প্রবীণ ও গণমান্য ব্যক্তিদের প্রতিমাসে দু'বার তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের কাছ

---

[২১০] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৬৯।

Scanned with CamScanner

থেকে তিনি বাজারের হাল-হাকীকত, পণ্যের আমদানি ও মূল্য, তাদের গভর্নরদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। দূরের কোন শহর থেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিনিধিদল তার দরবারে আগমন করলে প্রথমেই তিনি তাদেরকে সেই শহরের গভর্নর, প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কাযীদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। তারা যদি তাদের প্রশংসা করত, তখন তিনি বলতেন, মনে রেখো, তোমাদের এই সাক্ষ্য সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই অসত্য কিছু না বলে। এ ধরনের মজলিসে মাঝে মধ্যে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন,

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতারূপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। [সূরা নিসা : ১৩৫][২১১]

আলমানসুর মুওয়াহহিদী ও আন্দালুস রাষ্ট্র

মাগরেবের মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যে গৃহীত এসব ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর আন্দালুসের পরিস্থিতি সুদৃঢ়করণেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি মুসলিম আন্দালুসের সীমান্তশহরগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা মজবুত করেন। সীমান্তশহরগুলোতে খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করতেন। তৎকালীন মুসলিম আন্দালুসের সবচে' বড় শত্রু ছিল পর্তুগাল রাষ্ট্র। এর পরেই ছিল ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র। আন্দালুসে তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ।

বনু গানিয়ার মোকাবেলা

বনু গানিয়া মূলত মাছূফা গোত্রের মুহাম্মাদ বিন আলীর বংশধরদের বলা হয়। ইবনে তুমার্তের আত্মপ্রকাশের পূর্বে তৎকালীন মুরাবিতী খলীফা আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফীন মুহাম্মাদ বিন আলী ও তার ভাই

---

[২১১] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৬১-৩৬২।

Scanned with CamScanner

ইয়াহইয়াকে আন্দালুসে পাঠিয়েছিলেন। গানিয়া তাদের দু' ভাইয়ের মায়ের নাম। পুরুষদেরকে তাদের মায়ের নামের দিকে সম্বন্ধ করে আহ্বান করা মাগরেব অঞ্চলের একটি বহুল প্রচলিত রীতি। এ রীতির অনুসরণেই মূলত তাদেরকে বনু গানিয়া বলে ডাকা হত।[২১২] এর কিছুদিন পর মুওয়াহহিদী চিন্তাধারার আন্দোলন ও বিকাশ শুরু হয় এবং মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অবস্থান দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে থাকে। ততদিনে এক ভাই ইয়াহইয়া মৃত্যুবরণ করেছেন। অপর ভাই মুহাম্মাদ বিন আলী তখন মূল আন্দালুস উপদ্বীপ ছেড়ে ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জে চলে যান এবং সেখানেই নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলে ইবনে মারদানিশের অবস্থান তার এই পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছিল এবং বনু গানিয়াকে মুওয়াহহিদী সরকারের প্রভাব থেকে রক্ষা করছিল। কেননা, ইবনে মারদানিশের কারণে সে অঞ্চলে মুওয়াহহিদী সরকার প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। পরবর্তী সময়ে যখন পূর্ব আন্দালুস মুওয়াহহিদী সরকারের পদানত হয়, তখন বনু গানিয়ার তৎকালীন প্রধান ইসহাক বিন মুহাম্মাদ বিন গানিয়া মুওয়াহহিদী সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলেন এবং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অর্জিত গনীমত সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদেরকে বিভিন্ন সময়ে হাদিয়া হিসেবে মুওয়াহহিদী সরকারের কাছে পাঠাতে লাগলেন। মুওয়াহহিদী সরকারও প্রথমদিকে ব্যালেরিক উপদ্বীপের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এর গুরুত্ব অনুধাবন করায় মুওয়াহহিদী সরকার উক্ত অঞ্চলটি নিজেদের অধীনে আনতে সচেষ্ট হয় এবং ইসহাক বিন মুহাম্মাদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানায়। কিন্তু ইসহাক তার সাধ্য অনুযায়ী করছি-করব বলে টালবাহানা ও বিলম্ব করতে থাকেন। এরপর বার্তার কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই এক যুদ্ধে ইসহাক শহীদ হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র আলী বিন ইসহাক।

এর কিছুদিন পরই খলীফা ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন সান্তারিনের অভিযানে শহীদ হন। এর ফলে বনু গানিয়া মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রথমবারের মতো সুস্পষ্ট ভাষায় মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের কাছে নতি স্বীকার না

---

[২১২] এ রীতির প্রয়োগ মুরাবিতী বড় বড় নেতাদের নামের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যেমন, দাউদ বিন আয়েশা।

Scanned with CamScanner

করার কথা ঘোষণা করে। বনু গানিয়া মুওয়াহহিদী খলীফার আকস্মিক মৃত্যু-ঘটনার সুফল ভোগ করতে আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে বিজাইয়া (বর্তমান আলজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি এলাকা)-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। কিছুদিন পর ৫৮০ হিজরীতে আলমানসুর ইয়াকুব বিন ইউসুফ-এর শাসনামলের শুরুতে উভয় মিত্র মিলে নৌবহর নিয়ে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যে হামলা চালিয়ে কিছু এলাকা দখল করে নেয়। এখান থেকেই আন্দালুস ও মাগরেবে শুরু হয় মুওয়াহহিদী সরকার ও বনু গানিয়ার মধ্যে সংঘাতের এক দীর্ঘ ইতিহাস।

৫৮৫ হিজরীতে (১১৮৯ খৃস্টাব্দে) আলমানসুর আবু ইয়াকুব বনু গানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জের তিনটি দ্বীপ হতে দু'টি দখল করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি মাগরেব অঞ্চলে তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। বনু গানিয়ার এই বিরুদ্ধাচরণের কারণে আন্দালুসে মুওয়াহহিদী সরকারের ক্ষমতা বহুলাংশে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর আন্দালুস ও মাগরেবে বনু গানিয়ার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় পর্তুগালের শাসক একে কাজে লাগাতে মনস্থ করেন এবং এ কারণে সৃষ্ট স্বাভাবিক দুর্বলতার ফল ভোগ করতে সচেষ্ট হন। তিনি জার্মানি ও ইংল্যান্ডের স্থল ও নৌবাহিনীর সহায়তা নিয়ে মুসলিম আন্দালুসের একটি শহর অবরোধ করে তা দখল করে নেন এবং সেখানকার মুসলিম নাগরিকদের নগরী থেকে বিতাড়িত করেন। অধিকৃত শহরে তিনি যথেচ্ছা ধ্বংসযজ্ঞ চালান। এরপর তিনি তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে দক্ষিণ আন্দালুসের গুরুত্বপূর্ণ নগরী সেভিলের পশ্চিমে পৌঁছে যান।[২১৩] ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুরের যুদ্ধনীতি

তৃতীয় মুওয়াহহিদী খলীফা আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুরের পনের বছরের শাসনামলকে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলে গণ্য করা হয়। তার আমলে ঐক্য ও একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাগরেব রাজনৈতিক উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়েছিল। কিন্তু এ স্বর্ণযুগ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত;

---

[২১৩] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৫৬ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুওয়াহহিদীন*, পৃ : ৭৯।

Scanned with CamScanner

মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রচুর সম্পদে সমৃদ্ধ ও সুবিশাল পরিধিবিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে যা মোটেই খাপ খায় না। কেননা, মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের শাসকগণ এমন সুবিশাল ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র শাসন করতেন, যাকে আব্বাসী খেলাফতের প্রতাপ-যুগের শাসনভূমির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাদের অধীনে ছিল একই সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ে সক্ষম অসংখ্য সৈন্য, যা ইসলামী ইতিহাসের অনেক রাষ্ট্রেরই ছিল না। মুওয়াহহিদী সেনাবাহিনীতে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত ছিল মাগরেবের মুছাদামা গোত্র, এরপর সানহাজা, যিনাতাসহ অন্যান্য গোত্র, যারা মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব-ভীতির কারণে ধীরে ধীরে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এরপর তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরব বিশ্বের মুসলিম যুবকদের এক বিশাল কাফেলা, যারা সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের হিলালী পতাকাতলে সমবেত হতে মাগরেবে ছুটে এসেছিল। এদের সঙ্গে সমরদক্ষতায় কুশলী আন্দালুসের বাহিনী তো ছিলই। কিন্তু এত সামরিক শক্তি এবং এই বিশালতা সত্ত্বেও মুওয়াহহিদী বাহিনী ছিল সর্বদা দ্বিধা-বিভক্ত। সেনাবাহিনী পরিচালিত হত খলীফার একক ও কঠোর নিয়ন্ত্রণে এবং একান্ত শাহী পরিকল্পনায়, যা সেনাবাহিনীর শক্তিকে বহুলাংশে দুর্বল করে ফেলেছিল। আবু ইউসুফ ইয়াকুব ছিলেন হাতেগোনা সেসব মুওয়াহহিদী শাসকদের একজন, যারা সঠিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বের মাধ্যমে এ শক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সুদৃঢ় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। আর তাই তার এই ঈমানী চেতনা সংক্রমিত হয়েছিল তাঁর সামরিক বাহিনীর সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যেও। তার শাসনামলে মুওয়াহহিদী বাহিনী পরিণত হয়েছিল এক বৃহৎ যুদ্ধশক্তিতে।[২১৪]

---

[২১৪] হুসাইন মু'নিস, *মাআ'লিমু তারীখিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস*, পৃ : ২২৩-২২৪।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
চির স্মরণীয় আরিকের যুদ্ধ
(Battle of Alarcos)

বনু গানিয়ার বিদ্রোহ দমন করার পর আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদী আন্দালুস অঞ্চলে খৃস্টানশক্তির লোভাতুর দৃষ্টিপাত চিরতরে বন্ধ করা এবং পুরো অঞ্চলে অতীতের ন্যায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি পুনরায় ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তিনি প্রথমেই উপলব্ধি করলেন, এতদঞ্চলের খৃস্টানশক্তিগুলোর মধ্যে তার জন্য সবচে' বড় হুমকি হল ক্যাস্টোলা ও পর্তুগাল রাষ্ট্র। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ক্যাস্টোলার শাসকের পাঠানো একটি বার্তা হাতে পেলেন। বার্তায় ক্যাস্টোলা-নৃপতি মুওয়াহহিদী সরকারের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; বরং এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ না থেকে যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, এমনকি সে শত্রু ক্যাস্টোলা-শাসকের সহধর্মী হলেও আবু ইউসুফকে মিত্র হিসেবে সহায়তা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। বার্তা পাওয়ার পর প্রত্যুত্তরে আবু ইউসুফ জানালেন যে, তিনি ক্যাস্টোলা-নৃপতির প্রস্তাব নিয়ে স্থির চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তেখারা করার পর যেহেতু তা ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, তাই তাতে সাড়া দিতে সম্মত হয়েছেন এবং শান্তিপ্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

৫৮৫ হিজরীতে পর্তুগাল-শাসক আলফোন্সো হেন্‌রিকেয মুসলিম আন্দালুসে হামলা চালান। আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন,

> অভিশপ্ত বাতরু বিন রিক[২১৫] আন্দালুসের শাল্‌ব নগরী দখল করার অভিপ্রায়ে তার বাহিনী নিয়ে সেখানে অবতরণ করল। ইউরোপীয়

---

[২১৫] পর্তুগালের শাসক আলফোন্সো হেনরিকেযকে তৎকালীন আরবগণ এ নামেই ডাকত।

Scanned with CamScanner

> শক্তি নৌপথে বাত্সা[২১৬] ও শাওনা[২১৭] বাহন দিয়ে তাদের সহায়তা করেছিল। সে তাদেরকে এই মর্মে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছিল যে, শাল্ব নগরী জয় করতে পারলে সে কেবল নগরীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, যুদ্ধলব্ধ সকল গৃহবন্দী সহায়তা-বিনিময় হিসেবে ইউরোপীয় শক্তিকে প্রদান করা হবে। তারা তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাকে সামরিক সহায়তা প্রদান করল। এরপর খৃস্টান বাহিনী স্থল ও জলপথে শাল্ব নগরীতে প্রবেশ করল এবং নগরী দখল করে নিল। চুক্তি মোতাবেক অভিশপ্ত ইবনে রীক নগরীর দখল বুঝে নিল আর বন্দীদের তুলে দিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইউরোপীয় শক্তির হাতে। সংবাদ পেয়ে আমীরুল মুমিনীন দ্রুত যুদ্ধ প্রস্তুতি নিলেন এবং বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পৌঁছলেন। তার এবারের অভিযানের লক্ষ্য ছিল কেবল শাল্ব নগরী। তিনি সেখানে অবতরণ করলে খৃস্টান বাহিনী প্রতিরোধ-চিন্তা বাদ দিয়ে শাল্ব ও আশেপাশের এলাকা ছেড়ে পালাল। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন তাদের পলায়নেই তুষ্ট না হয়ে পর্তুগালে হামলা চালালেন এবং 'তুর্শ' নামক তাদের বড় একটি দুর্গ দখল করে নিলেন।[২১৮]

ক্যাস্টোলার সঙ্গে শান্তিচুক্তি ও পর্তুগালের বিপক্ষে এই শক্তিশালী জয়ের পর ইয়াকুব আলমানসুর মাগরেবে তার রাজধানী মার্‌রাকিশে ফিরে এলেন। বাকি রয়ে গেল একটি খৃস্টানশক্তি, যারা তখনও আলমানসুরের সঙ্গে সন্ধি করেনি। এ শক্তিটিই আন্দালুসে তার পরবর্তী আগমন ও যুদ্ধের কারণ হয়েছিল।

এর পাঁচ বছরেরও কম সময় পর সন্ধি না করা সেই খৃস্টান দলটি

---

[২১৬] এক ধরনের বড় নৌযান। ইসলামী আমলের সূচনালগ্ন থেকেই আরব মুসলমানগণ এর সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং বিভিন্ন সামুদ্রিক যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক পরিবহন কাজে তা ব্যবহার করত। এতে চল্লিশটি পাল ব্যবহার করা হত এবং এক একটি নৌযানে আড়াই হাজারের অধিক মানুষের স্থান সঙ্কুলান হত। (মুসতাফা আবদুল কারীম খতীব, *মু'জামুল মুসতালাহাত ওয়াল আলক্বাবুত তারীখিয়্যাহ*, পৃ : ৮১)।

[২১৭] সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এক ধরনের জাহাজ। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান জাতি এর সঙ্গে পরিচিত ছিল। ইসলামী যুগে আরবরাও তা ব্যবহার করেছে। এ জাহাজটি পালের হাওয়ায় চলে; দাঁড়ের সংখ্যা প্রায় একশতটি। বিশেষ ধরনের কামান দাগানোর বুরুজ দ্বারা জাহাজগুলো সজ্জিত থাকত। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত প্রায় দেড়শত যোদ্ধার এ ধরনের জাহাজে স্থান সঙ্কুলান হত। (প্রাগুক্ত, পৃ : ২৮৭)।

[২১৮] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৫৬, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, পৃ : ২০৪-২১২ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৪।

Scanned with CamScanner

ইউরোপীয় সৈনিকদের সমন্বয়ে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালাল এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে সম্পদ লুট করার পাশাপাশি মুসলিম নারী-পুরুষদের বন্দী করে নিয়ে গেল। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাল।[২১৯] এদিকে ক্যাস্টোলা-শাসক অষ্টম আলফোন্সোর সঙ্গে আবু ইয়াকুব মানসুরের শান্তিচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনিও এই খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন। আলফোন্সো মুসলিম আন্দালুসের সবগুলো সীমান্তশহরে শান্তিচুক্তি শেষ হওয়ার হুমকি পাঠাতে লাগলেন। আলমানসুর তখন মাগরেবে বনু গানিয়াসহ অন্যান্য বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহদমন-যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। হুমকি পাঠানোর পরপরই আলফোন্সো তার সেনাপতিদের পাঠিয়ে আন্দালুসের বিভিন্ন প্রান্তে হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে লাগলেন। আলমানসুরের ইচ্ছা ছিল প্রথমে বিদ্রোহীদের দমন-অভিযান সমাপ্ত করে এরপর আন্দালুসে খৃস্টানদের দফা-রফা করা। কিন্তু তার কাছে আন্দালুসবাসীর পক্ষ থেকে একের পর এক পত্র আসতে লাগল, যাতে খৃস্টান বাহিনীর চরম অত্যাচার ও আন্দালুসবাসীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার বিবরণ ছিল। তখন আমীরুল মুমিনীন তার ইচ্ছা পরিবর্তন করলেন এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করতে লাগলেন।[২২০]

এর কয়েক বছর পূর্বে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এক অভূতপূর্ব বিজয়ের আনন্দ-সুবাসে মাতোয়ারা হয়েছিলেন। ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খৃস্টাব্দে) সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী অমর হিত্তীন প্রান্তরে ক্রুশেড বাহিনীকে পরাজিত করে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সেই বিজয়ের বার্তা বয়ে এনেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান আলোচিত প্রেক্ষাপটের মাত্র সাত বছর পূর্বের ঘটনা এটি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো মাগরেবের মুসলমান জনসাধারণও এই বিজয়-আনন্দে উদ্বেলিত ছিল এবং তাদের তামান্না ও ইচ্ছা ছিল, মুসলিম প্রতীচ্যে তারাও প্রাচ্যের বিজয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। বিশেষত আবু ইউসুফ ইয়াকুব তাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর তাই সকলেই প্রতিযোগিতা করে যোগ দিয়েছিল ক্রুশেড বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ঈমানী দায়িত্ব পালনের কাফেলায়।

---

[২১৯] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ১০/২৩৭ ও ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৭/৮।
[২২০] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৫/১৯৭।

Scanned with CamScanner

﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

এটাই এমন জিনিস, লুব্ধজনদের উচিত এর প্রতি অগ্রগামী হয়ে লোভ প্রকাশ করা । [সূরা তাতফীফ : ২৬]

আলমানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী গোষ্ঠীগুলোকে দমন করার জন্য পূর্ব থেকেই একটি বাহিনী প্রস্তুত ছিল । কিন্তু লক্ষ্য ও গতিপথ যখন বদলে গেল, দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা এই কাফেলায় যোগ দিতে লাগল । ৫৯০ হিজরীতে (১১৯৪ খৃস্টাব্দে) শুরু হল এই নফীরে আম বা নির্বিশেষে সকলে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান । একবছর পর ৫৯১ হিজরীতে মাগরেব ও সাহারা থেকে মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হল এবং খৃস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে অবতরণ করল; আর ক'দিন পরই যেখানে সংঘটিত হতে যাচ্ছে সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ, ইতিহাস যা যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে ।[২২১]

ঐতিহাসিক আরিকের যুদ্ধ

'আরিক' রাবাহ দুর্গ হতে উত্তর-পশ্চিমে বিশ কিলোমিটার দূরে ওয়াদিয়ে আনা নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত এক দুর্গের নাম । বর্তমানে এর অবস্থান আধুনিক স্পেনের কিউডাড রিয়াল (Ciudad Real) নগরীর পশ্চিমে স্ট্যা মারিয়া ডি অ্যালারকোস (Sta Maria de Alarcos)-অঞ্চলে । তৎকালে আরিক ছিল আন্দালুস ও ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের সীমান্তরেখায় অবস্থিত একটি এলাকা ।[২২২]

৫৯১ হিজরীর শাবান মাসের নয় তারিখে (১১৯৫ খৃস্টাব্দে) ক্যাস্টোলা ও আন্দালুস রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত দক্ষিণ টলেডোর সেই বিশাল দুর্গের নিকটে মুসলিম বাহিনী খৃস্টান বাহিনীর মুখোমুখি হয় ।[২২৩] অষ্টম আলফোন্সো লিওন ও নাফার রাষ্ট্র হতে সহায়তা গ্রহণ করার পর তার বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন এবং তার নেতৃত্বাধীন খৃস্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার । খৃস্টান বাহিনীর পক্ষে একদল ইহুদিও জড়ো হয়েছিল, যাদের

---

[২২১] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৫৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায় পৃ : ২১৭ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৫ ।

[২২২] শাওকী আবু খলীল, *আরিক*, পৃ : ৫৪ ।

[২২৩] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ১০/২৩৭ ও ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৬ ।

Scanned with CamScanner

মতলব ছিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে খৃস্টানদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ইউরোপের বাজারে প্রচুর মুনাফার বিনিময়ে বিক্রি করা।[২২৪]

অপরদিকে আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুরও বিশাল বাহিনী সমবেত করেছিলেন। বিশেষত ৫৮৩ হিজরীতে মুসলিম প্রাচ্যের হিত্তীন প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের পর মাগরেব ও আন্দালুস উভয় অংশের অধিবাসীদের অন্তরে সমভাবে যে ধর্মীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে মুসলিম বাহিনীর সদস্যসংখ্যা দুই লাখে পৌঁছেছিল।[২২৫]

যুদ্ধ সূচনা ও মুওয়াহহিদী ইতিহাসে নতুন ধারার আবির্ভাব

আরিক অঞ্চলে পৌঁছার পর যুদ্ধ সূচনার পূর্বে আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মতামত গ্রহণের জন্য একটি পরামর্শসভা আহ্বান করলেন। তার এই পদক্ষেপ ছিল তার পূর্ববর্তী সকল মুওয়াহহিদী শাসক ও সেনাপতির রীতি বিরোধী। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা সকলেই ছিলেন একনায়কতন্ত্রের অনুসারী। আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর এক্ষেত্রে নববী মানহাজ ও আদর্শ অনুসরণ করলেন। পরামর্শসভায় আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর সকলের পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে শ্রবণ করলেন। এমনকি তিনি আন্দালুসী সেনাপতি আবু আবদুল্লাহ বিন সানাদীদ-এর মতামতকেও গ্রহণ করলেন। অথচ আবু আবদুল্লাহ মাগরেবের কোন বার্বার গোত্রভুক্ত ছিলেন না। এটি ছিল মুওয়াহহিদী ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা। কারণ, এর পূর্বে অন্যান্য শাসকগণ কেবল মাগরেবের বাহিনীর ওপরই নির্ভর করতেন। কিন্তু আবু ইউসুফ আলমানসুর মরুভূমি থেকে আগত মাগরেবী ও বার্বার বাহিনীর সঙ্গে আন্দালুসী শক্তিকেও একত্র করলেন।[২২৬]

প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন

ইউসুফ বিন তাশফীনের ঐতিহাসিক কীর্তি যাল্লাকার যুদ্ধের পরিকল্পনার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য বজায় রেখে আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর তার

---

[২২৪] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ১০/২৩৭, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৫, ৪/১৮২-১৮৩, ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৫/২১৩ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/৮৪।

[২২৫] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩১৯।

[২২৬] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/১৭৮।

Scanned with CamScanner

বাহিনীকে দু' ভাগে বিভক্ত করলেন। এক অংশকে ময়দানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখলেন; অপর অংশকে পার্শ্ববর্তী এক টিলার আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। তিনি নিজে ছিলেন দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে। এরপর তিনি পুরো বাহিনীর জন্য তার প্রধান উযীর আবু ইয়াহইয়া বিন আবু হাফ্সকে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত করলেন; আর আবু আবদুল্লাহ বিন সানাদীদকে নির্বাচন করলেন আন্দালুসী অংশের সেনাপতি হিসেবে। তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ ছিল, আন্দালুসীদের জন্য যদি কোন মাগরেবী বা বার্বার সেনাপতিকে প্রধান নির্বাচন করা হয়, তাহলে তাদের অন্তরে হয়তো সুপ্ত ক্রোধের আগুন প্রজ্বলিত হবে এবং তাদের যুদ্ধস্পৃহায় ভাটা পড়বে।[২২৭]

এরপর নিয়মিত মুওয়াহহিদী বাহিনী ও আন্দালুসী সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত প্রথম অংশের প্রধান সেনাপতি আবু ইয়াহইয়া পুরো বাহিনীকে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে যুদ্ধ-পরিকল্পনায় পূর্ণতা আনলেন। তিনি আন্দালুসী বাহিনীকে দক্ষিণ বাহুতে রাখলেন; যিনানা, মুছাদামা, আরব ও অন্যান্য মাগরেবী গোত্রের সৈন্যদেরকে রাখলেন বাম বাহুতে; স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা, মিশরী মামলুক ও তিরন্দায বাহিনীকে রাখলেন অগ্রবর্তী বাহিনীতে আর নিজে হিনতানা গোত্রসহ অবস্থান নিলেন কেন্দ্রীয় অংশে।[২২৮]

সেনাবিন্যাস ও যুদ্ধ-পরিকল্পনা সমাপ্ত হওয়ার পর মুওয়াহহিদী আমীর পুরো মুসলিম বাহিনীর সকলের কাছে একটি বার্তা পাঠালেন। বার্তায় তিনি বললেন, আমীর তোমাদেরকে বলছে যে, তোমরা তাকে ক্ষমা করে দিও। কারণ, এটি হল ক্ষমা করার স্থান। তোমরা পরস্পরও একে অপরকে ক্ষমা করে দাও। আর আপন আপন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নাও, নিয়তকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নাও।

তার এই বার্তা শোনার পর সবার মাঝে কান্নার রোল বয়ে গেল। মুখলিস আমীরুল মুমিনীনের বার্তা শুনে সবাই যেন নতুন করে শাহাদাতের চেতনায় উজ্জীবিত হল। সবাই বুঝতে পারল, এ হচ্ছে বিদায় ও বিচ্ছেদের সময়।

প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ

যুদ্ধক্ষেত্রে খৃস্টান বাহিনীর অবস্থান ছিল একটি বড় টিলার ওপরে। তাই মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হচ্ছিল সেই টিলার নিম্ন এলাকায় অবস্থান করে।

---

[২২৭] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৪।

[২২৮] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/১৮৯।

Scanned with CamScanner

কিন্তু এই প্রতিকূলতা মুসলিম বাহিনীর লড়াই-স্পৃহায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পাড়ল না। যুদ্ধ শুরু হল। ক্যাস্টোলা বাহিনী বাধভাঙা সর্বগ্রাসী জোয়ারের মতো টিলা বেয়ে নেমে এল।

মূল যুদ্ধের ধারা-বর্ণনার ভার আমরা না হয় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবি যারআ'-এর স্কন্ধেই অর্পণ করি! তিনি লিখেছেন,

> শত্রুবাহিনীর সাত থেকে আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বড় অংশ সামনে অগ্রসর হল। এদের সকলে ঝকমকে-সুগঠিত লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীর দিকে ধেয়ে এল। খৃস্টান বাহিনী অগ্রসর হতেই মুসলিম বাহিনীর সৈনিকগণের বর্শার আঘাতে তাদের অশ্বগুলো ধরাশায়ী হতে লাগল। এই হঠাৎ প্রতিরোধে তারা কিছুটা পিছু হটল। এরপর তারা আবার হামলা করতে অগ্রসর হল। বাধার সম্মুখীন হয়ে আবার তারা পিছু হটল। এরপর তৃতীয়বার তারা হামলার জন্য প্রস্তুতি নিল। আন্দালুসী আমীর ইবনে সানাদীদ ও আরবী সেনাপতি চিৎকার করে মুসলিম বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। তারা চিৎকার করে বলছিলেন, হে মুসলিম সৈনিক-দল! দৃঢ়পদ থাক। আল্লাহ তাআ'লা খালিস সংকল্পের দ্বারা তোমাদের পদযুগল অটল রাখুন।
>
> এরপর খৃস্টান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রে হামলা চালাল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রে অবস্থানরত বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি আবু ইয়াহইয়া। আবু ইয়াহইয়াকেই তারা আমীরুল মুমিনীন ভেবেছিল। আবু ইয়াহইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং প্রচণ্ড ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে খৃস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করতে লাগলেন। লড়তে লড়তে তিনি ও তার সঙ্গী হিনতানা গোত্র ও স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাগণের অনেকে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআ'লা যাকে ইচ্ছা, তাকেই শাহাদাতের মর্যাদা দান করে থাকেন। মুসলিম বাহিনী দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে গেল। যুদ্ধের প্রচ-তায়, অশ্বের ছোটাছুটিতে ধুলোয় ধূসরিত ময়দান যেন দিনের বেলাও রাতের অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, আরব, মিশরী মামলুক বাহিনী ও তীরন্দায বাহিনী এবার অগ্রসর হল এবং চতুর্দিক থেকে খৃস্টান বাহিনীকে ঘিরে ধরল। সেনাপতি ইবনে সানাদীদ আন্দালুসী বাহিনী নিয়ে হামলা করলেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিল

Scanned with CamScanner

যিনাতা, মুছাদামা, গিমারা ও অন্যান্য বার্বার গোত্রও। সবাই মিলে সেই টিলায় হামলা চালাল, যেখানে খৃস্টান বাহিনীর প্রধান অষ্টম আলফোন্সো তার বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিলেন। আলফোন্সোর সঙ্গে উপস্থিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষের অধিক।

মুসলিম বাহিনী টিলা বেয়ে উঠতে লাগল এবং খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। পুরো টিলা জুড়ে সৃষ্টি হল এক কঠিন পরিস্থিতি। খৃস্টান বাহিনীর যে অংশটি প্রথমবার মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে অগ্রসর হয়েছিল, তারা সকলে নিহত হল। প্রায় দশ হাজার সৈন্যের এ বাহিনীটি ছিল অভিশপ্ত আলফোন্সোর বিশেষ নির্বাচিত বাহিনী। গির্জার পাদ্রীগণ তাদের জন্য শুভকামনা করে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাদের শরীরে খৃস্টধর্মের বিশেষ পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এ বাহিনীর সকলে ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করেছিল যে, মুসলিম বাহিনীর একজন সৈন্য বাকি থাকা পর্যন্তও তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে না। আল্লাহ তাআ'লা আপন ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং তার সৈনিকদের বিজয় দান করেছেন।

খৃস্টান বাহিনী যখন প্রবল আক্রমণের শিকার হল এবং ধ্বংস ও বিনাশের ছায়া দেখতে পেল, তখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের পথ ধরল। সকলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য সেই টিলার দিকে ছুটল, যেখানে আলফোন্সো অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তারা দেখতে পেল, মুসলিম বাহিনী তাদের ও টিলার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাধ্য হয়ে তারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে পিছু হটতে চাইল। কিন্তু সেদিক থেকে তাদের দিকে আরব, স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক, হানতানা গোত্র, মিশরী মামলুক গোত্র ও তিরন্দায বাহিনীর সৈন্যগণ ধেয়ে এল এবং বর্শার আঘাতে তাদের ইহলীলা চিরতরে সাঙ্গ করে দিল। এ বাহিনীর বিনাশে আলফোন্সোর মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। কারণ, এরাই ছিল তার মূল ভরসা। একদল আরব অশ্বারোহী যোদ্ধা দ্রুত ছুটে গিয়ে আমীরুল মুমিনীনকে সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহ তাআ'লা শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দামামা বাজানো হল, মুসলিম বাহিনীর পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল। কালিমায়ে শাহাদাতের সমস্বর ধ্বনি এবং পতপত রবে

Scanned with CamScanner

ওড়া পতাকার আন্দোলনে ময়দান মুখরিত হয়ে উঠল। আমীরুল মুমিনীন তার নেতৃত্বাধীন অপেক্ষারত বাহিনী নিয়ে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছুটে এলেন। অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী একযোগে দ্রুতগতিতে ছুটল শত্রুপানে। খৃস্টান বাহিনীর প্রধান অষ্টম আলফোন্সো তার পুরো বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চিন্তা করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি হঠাৎ তার ডানপাশ থেকে গগণবিদারী দামামা-ধ্বনি শুনতে পেলেন। টিলা ও আশেপাশের সমতল ভূমিসহ পুরো এলাকা মুসলিম বাহিনীর কালিমা-ধ্বনিতে প্রকম্পিত ছিল। তিনি মাথা উঁচিয়ে দেখতে পেলেন মুওয়াহহিদী বাহিনী দ্রুত বেগে তার দিকেই ধেয়ে আসছে। সবার সামনে শোভা পাচ্ছে কালিমায়ে তাইয়িবা ও 'লা গালিবা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন বিজয়ী নেই)-খচিত আলমানসুরের সাদা নিশান। মুসলিম বাহিনীর নওজোয়ানেরা প্রবল গতিতে ছুটে আসছে আর তাদের কণ্ঠের কালিমায়ে শাহাদাতের ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। আলফোন্সো অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? তাকে জানানো হল, ইনিই মুসলিম বাহিনীর আমীর, আমীরুল মুমিনীন। আজ সারাদিন আমাদের বিরুদ্ধে কেবল তার বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ যুদ্ধ করেছে। এটি তাদের মূল বাহিনী। এরপর আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। ফলে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল।

মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী পলায়নরত খৃস্টান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করল এবং তাদের সামনে-পিছনে আঘাত হানতে লাগল। মুসলিম বাহিনীর বর্শা ও ছুরির আঘাতে মারা পড়ল অসংখ্য খৃস্টান সৈন্য। তাদের রক্তে সিক্ত হল মুসলিম বাহিনীর তরবারি।

এরপর মুসলিম বাহিনী আরিক দুর্গ ঘেরাও করল। তাদের ধারণা ছিল, অভিশপ্ত আলফোন্সো এখানেই আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এই দুশমন দুর্গের এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী বলপূর্বক দুর্গে প্রবেশ করল এবং দুর্গের দ্বারগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। দুর্গের ভেতর থেকে এবং খৃস্টান বাহিনীর শিবির থেকে পাওয়া গেল ধন-সম্পদ,

Scanned with CamScanner

> আহার্যবস্তু, অস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রী, আসবাবপত্র, বাহনজন্তু এবং নারী-শিশুসহ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এ যুদ্ধে কাফিরবাহিনীর অসংখ্য যোদ্ধা নিহত হয়েছিল। তাদের সংখ্যা যে কত, একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। দুর্গের ভেতর থেকে অবরুদ্ধ চব্বিশ হাজার খৃস্টান অশ্বারোহী সৈন্যকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলেন, যেন খৃস্টানরা তার এই অনুগ্রহের কথা ভবিষ্যতে স্মরণ রাখে। অবশ্য মুওয়াহহিদী ও অন্যান্য মুসলিম সৈন্যগণ আমীরুল মুমিনীনের এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করতে পারেননি। তার এই সিদ্ধান্তটি ছিল একটি রাজকীয় স্খলন।[২২৯]

মুসলিম বাহিনীর এ বিজয়ের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। সুবিস্তৃত মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে মুসলমানদের মিম্বরে মিম্বরে এই মহান বিজয়ের সংবাদ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এমনকি এ সংবাদ মুসলিম প্রাচ্যেও পৌঁছে গেল। হিত্তীন যুদ্ধের গৌরবময় বিজয়ের মাত্র আট বছর পর আল্লাহপ্রদত্ত এই সুমহান সৌভাগ্যে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ যে কী পরিমাণ উদ্বেলিত হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়।

মাক্কারী রহ. লিখেছেন,

> কথিত আছে, এ যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর নিহত সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার। বন্দী হয়েছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলিম বাহিনী অর্জন করেছিল এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তাঁবু, আশি হাজার ঘোড়া, এক লক্ষ খচ্চর, চার লক্ষ গাধা। খৃস্টান বাহিনী এ বিপুলসংখ্যক বাহনজন্তু নিয়ে এসেছিল তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সামানা বহন করার জন্য। তাদের কাছে পরিবহনের জন্য উটের ব্যবস্থা ছিল না। আর স্বর্ণ-রূপা, বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু ও অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়েছিল অগণিত পরিমাণে। বন্দীদেরকে জনপ্রতি এক দিরহাম মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিল।[২৩০] তরবারি আধা দিরহাম, ঘোড়া পাঁচ দিরহাম, গাধা এক দিরহামে বিক্রি হয়েছিল।

---

[২২৯] ইবনে আবি যারআ', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৫। এ যুদ্ধের বিবরণ সংক্ষেপে জানতে দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ২১৪-২২০ ও ইবনুল খতীব, *রক্বমুল হুলাল*, পৃ : ৫৯।

[২৩০] মাক্কারী রহ.-এর এই এক দিরহামে বন্দী বিক্রির বর্ণনাটি উক্ত যুদ্ধের সমকালীন ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার বিপরীত। তাদের বর্ণনামতে, এ যুদ্ধের বন্দীদেরকে আমীর আলমানসুর রক্তপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

যুদ্ধ শেষে আমীর আবু ইউসুফ ইয়াকুব শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিম বাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ওদিকে খৃস্টান বাহিনীর প্রধান আলফোন্সো চরম নিগৃহীত অবস্থায় কোন মতে জান হাতে নিয়ে টলেডোতে পৌঁছলেন। তিনি তার মাথা ও গণ্ডদেশ মুণ্ডিয়ে ফেললেন, ক্রুশ উল্টিয়ে রাখলেন। এরপর শপথ করলেন, এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার আগ পর্যন্ত বিছানায় শোবেন না, নারীগমন করবেন না এবং ঘোড়া বা কোন বাহনে চড়বেন না।

এরপর আলফোন্সো আলজেরিয়া ও দূরবর্তী বিভিন্ন দেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ইয়াকুব আলমানসুর তার মোকাবেলা করে এবারও তাকে পরাজিত করলেন এবং তার পশ্চাদ্ধাবন করে টলেডো পর্যন্ত পৌঁছে টলেডো অবরোধ করলেন। তিনি মিনজানিক স্থাপন করে নগরপ্রাচীরের ওপর গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে অবরোধ গুটিয়ে আনতে লাগলেন। বিজয় যখন মুসলিম বাহিনীর দ্বারপ্রান্তে, তখন দুর্গের ভেতর থেকে আলফোন্সোর কন্যা-জায়া-জননী বের হয়ে এল এবং আমীরুল মুমিনীনের সামনে করজোরে কান্নাকাটি করে তাদেরকে টলেডোতে থাকার সুযোগ দিতে আবেদন জানাল। তাদের কান্নাকাটিতে আবু ইউসুফের মন নরম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও মনি-মুক্তা প্রদান করলেন এবং তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে বিদায় দিলেন। সুযোগ পাওয়ার পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এরপর তিনি কর্ডোভায় ফিরে এলেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করার জন্য এক মাস সেখানে অবস্থান করলেন।[২৩১]

আরিক প্রান্তরে বিজয়ের প্রভাব

আরিক প্রান্তরের এই বিশাল বিজয়ের প্রভাব ও অবদানও ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল :

---

[২৩১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৪৩।

Scanned with CamScanner

১. খৃস্টানশক্তির পাঁজরভাঙা পরাজয়

আরিক প্রান্তরের বিজয়ের অন্যতম প্রভাব এই ছিল যে, এত পরিমাণ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হওয়ার ফলে খৃস্টানদের সামরিক শক্তি বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু প্রথম দিনেই সর্বনিম্ন ধারণা অনুযায়ী প্রায় ত্রিশ হাজার খৃস্টান সৈন্য নিহত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মাক্কারীর *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী এ যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর মোট সৈন্য ছিল দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার; এদের মধ্যে নিহত হয়েছিল এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আর বন্দী হয়েছিল বিশ থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য।[২৩২] ইসলামের মর্যাদা ও গৌরব প্রকাশ, খৃস্টানদের প্রতি দয়াদ্রতা এবং খৃস্টানশক্তির প্রতি অনাগ্রহের কারণে খলীফা আলমানসুর বন্দী সবাইকে কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিয়ে দিয়েছিলেন।[২৩৩]

২. বস্তুগত বিজয়

যদিও এ যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে বস্তুগত সম্পদ অর্জিত হয়েছিল; কিন্তু তা ছিল আরিক প্রান্তরে অর্জিত বিজয়ের প্রভাবসমূহের মধ্য থেকে সবচে' সাধারণ প্রভাব। মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে অগণিত সম্পদরাজি গনীমত হিসেবে লাভ করেছিল। *'নাফহুত তীব'*-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঘোড়ার সংখ্যা ছিল আশি হাজার, খচ্চরের সংখ্যা এক লক্ষ আর তাঁবু তো অগণিত।[২৩৪]

আলমানসুর এই প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুযায়ী বণ্টন করেন। চার-পঞ্চমাংশ তিনি মুসলিম বাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দেন আর বাকি এক-পঞ্চমাংশ আরিক যুদ্ধের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখতে ব্যয় করেন সেভিল মসজিদ নির্মাণে। তিনি এই মসজিদের জন্য দুই শ' মিটার দীর্ঘ একটি সুউচ্চ মিনারও নির্মাণ করেন। এটি ছিল তৎকালীন আন্দালুসের অন্যতম উঁচু ও বড় মিনার। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! পরবর্তীতে যখন খৃস্টানদের হাতে সেভিলের পতন ঘটে, ইসলামী সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই মিনারটিকে গির্জার ঘণ্টা বাজানোর টাওয়ারে পরিণত করা হয় আর সেভিল মসজিদকে পরিণত করা হয় খৃস্টানদের গির্জায়।[২৩৫] সেভিলে সেই গির্জা এখনও আছে, আছে আরিক প্রান্তরের গৌরবময় বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন জামে সেভিলের ঐতিহাসিক মিনার!

---

[২৩২] প্রাগুক্ত, ১/৪৪৩।

[২৩৩] 'ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৮।

[২৩৪] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৪৩।

[২৩৫] 'ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২২৯।

Scanned with CamScanner

৩. মনস্তাত্ত্বিক বিজয়

আরিক প্রান্তরের বিজয়ের অন্যতম প্রভাব এও ছিল যে, এর ফলে এক মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয়ের অনুভূতিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মুসলমানের অন্তর ছেয়ে গিয়েছিল। মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দালুসবাসীদের মনোবল বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং খৃস্টানদের শক্তি তাদের সামনে তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়েছিল। এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মনোবলও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা ক্রীতদাস মুক্ত করে, দান-সদকা করে বিজয়ের আনন্দ উদযাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল।

এই বিজয়কে কেন্দ্র করেই ইসলামী বিজয়াভিযানের ধারা নতুন করে চালু হয়েছিল। মুসলমানগণ বেশ কয়েকটি দুর্গ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল এবং টলেডো অবরোধ করেছিল। তবে পূর্বেও যেমন উল্লেখ করেছি, টলেডো ছিল আন্দালুসের দুর্ভেদ্যতম নগরীগুলোর অন্যতম। এ কারণেই মুসলমানগণ নতুন করে টলেডো বিজয় করতে সক্ষম হয়নি।[২৩৬]

৪. খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সংঘাত

আরিকের যুদ্ধে পরাজয়কে কেন্দ্র করেই খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ক্যাস্টোলা-শাসক অষ্টম আলফোন্সো এ পরাজয়ের দায়ভার সম্পূর্ণই লিওন ও নাফার রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেন এবং উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।[২৩৭] এ যুদ্ধের পরাজয় আন্দালুসের খৃস্টানদেরকে মানসিকভাবেও হীনবল করে তোলে এবং এরই ফলশ্রুতিতে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আলমানসুর মুওয়াহহিদীর দরবারে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তির আবেদন করতে থাকে।

৫. ক্যাস্টোলা ও মুসলমানদের মধ্যে নতুন চুক্তি

আরিকের যুদ্ধের আরও একটি প্রভাব এই ছিল যে, এ যুদ্ধের পর ক্যাস্টোলা

---

[২৩৬] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৬০, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/১৯২।

[২৩৭] জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/৯৫।

Scanned with CamScanner

ও মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে দশ বছর মেয়াদী শান্তি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আলমানসুর এ সময়ের মধ্যে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা নতুন করে বিন্যস্ত করে নিতে চেয়েছিলেন বলে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত হন।[২৩৮]

ইয়াকুব আলমানসুরের শাসনামলের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম

১. ইবনে রুশদ আলহাফীদ রহ.[২৩৯]

তার পুরো নাম আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন আবুল কাসিম আহমাদ বিন আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রুশদ আলকুরতবী। জন্ম ৫২০ হিজরীতে (১১২৬ খৃস্টাব্দে)। ইলমী খান্দানে জন্ম নেওয়া এই মনীষীর শৈশব কাটে ইলম চর্চার পরিবেশেই। *'আসসিলাহ'* গ্রন্থকার ইবনে বাশকুওয়ালের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর দাদা ইবনে রুশদ ছিলেন ফিকহের জ্ঞানে সমৃদ্ধ আলিম, ফিকহের হাফিয, সমকালে ফিকহের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী, মালেকী মাযহাবের ফাতাওয়ার বিজ্ঞ জ্ঞানী, মালেকী ফকীহগণের ইজতিহাদ, ইজমা' ও মতানৈক্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষক, ফারায়েয ও উসূলের ইলমে প্রাজ্ঞ; ইলমী দক্ষতা, দ্বীনী উপলব্ধি বোধ, ধার্মিকতা, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা, সুখ্যাতি ও সুপথের অধিকারী।[২৪০]

অবশ্য ইবনে রুশদ আলহাফীদ তার এই মহান দাদার সংস্পর্শ লাভ করতে পারেননি। তার বয়স যখন মাত্র এক মাস, তখনই তার দাদা ইন্তেকাল করেন। দাদার সংশ্রব না পেলেও তিনি এই ইলমী পরিবারেই বেড়ে ওঠেন এবং বিশাল ইলমী মিরাস লাভ করেন। তার পিতা আবুল কাসিম আহমাদ

---

[২৩৮] আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৬০। অবশ্য কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের ভাষ্য হল, এ চুক্তির মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ১০/২৩৮ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/১৯৩।

[২৩৯] দাদা ও নাতী উভয়ের নাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, উভয়ের উপনাম আবুল ওয়ালিদ। প্রথমজন ইবনে রুশদ আলজাদ্দ এবং দ্বিতীয়জন ইবনে রুশদ আলহাফীদ ও দার্শনিক ইবনে রুশদ নামে খ্যাত। দাদা ইবনে রুশদ মালিকী মাযহাবের বিখ্যাত আলিম ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা ছিলেন। জন্ম ৪৫০ হিজরীতে কর্ডোভায়, মৃত্যুও কর্ডোভাতেই ৫২০ হিজরীতে। তিনি কর্ডোভার 'কাযিউল জামাআহ'-এর দায়িত্বও পালন করেছেন। (অনুবাদক)

[২৪০] ইবনে বাশকুয়াল, *আসসিলাহ*, ৩/৮৩৯।

Scanned with CamScanner

স্বীয় ফকীহ পিতা ও সমকালীন অন্যান্য ফকীহগণের কাছ থেকে ফিকহের বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি ইবনে বাজার কাছ থেকে দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেছিলেন। এই মহান পিতার কাছেই ইবনে রুশদ আলহাফীদ ফিকহের পাঠ গ্রহণ করেন।[২৪১]

আল্লামা যাহাবী রহ. লিখেছেন,[২৪২]

> ইবনে রুশদ বোধসম্পন্ন হওয়ার পর থেকে জীবনের দু'টি রাত ব্যতীত কখনোই ইলমী নিমগ্নতা পরিত্যাগ করেননি। একটি হল তার পিতার মৃত্যুর রাত, আরেকটি বিয়ের রাত। তার রচনার পরিমাণ প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠা। তিনি দর্শনশাস্ত্রে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞ ইমামের মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে রুশদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনাকর্ম হল :

- বিদায়াতুল মুজতাহিদ[২৪৩] (بدَايَة المُجْتَهِد)
- আলকুল্লিয়্যাত ফিত তীব (الكُلِّيَّات فِي الطِّبّ)
- মুখতাসারুল মুসতাছ্ফা (مُخْتَصَر المُسْتصفى)
- শরহু উরজূযাতি ইবনি সীনা (شرح أُرْجُوزَة ابْنِ سِيْنَا)
- আলমুক্বাদ্দামাত ফিল ফিক্বহ (المقدمات في الفقه)
- কিতাবুল হায়াওয়ান (كتاب الحيوان)
- জাওয়ামিউ' কুতুবি আরিসতূতালীস (جَوَامع كتب أَرِسْطُوطَاليس)
- শরহু কিতাবিন নাফস (شرح كِتَاب النَّفْس)
- কিতাবুন ফিল মানতিক্ব (كِتَاب فِي المنطق)
- তালখীসুল ইলাহিয়্যাত লি-নিয়াকূলাউস (تَلْخِيص الإلاهيّات لنِيقُوْلاوس)
- তালখীসু মা বা'দাত তাবিআ' লি-আরিসতূ (تَلْخِيص مَا بَعْد الطّبيعَة لأَرِسْطُو)
- তালখীসুল ইসতিক্বছাত লি-জালীনূস (تَلْخِيص الاسْتقصَات لجالينوس)
- কিতাবুল কুওয়া (كِتَاب القوى)
- কিতাবুল ই'লাল (كِتَاب الْعِلَل)
- কিতাবুত তা'রীফ (كِتَاب التعرِيف)
- কিতাবুল হুম্মাইয়াত (كِتَاب الحُمَّيَات)

---

[২৪১] রিহাব আকাবী, *ইবনে রুশদ*, পৃ : ৯।

[২৪২] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩০৮-৩০৯।

[২৪৩] عيون الأنباء কিতাবে এ গ্রন্থটির নাম *'হিদায়াতুল মুজতাহিদ'* লেখা হয়েছে। অপরদিকে الأعلام কিতাবে এর নাম লেখা হয়েছে *'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্বতাসিদ'*। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

- কিতাবু হীলাতিল বুর (كتاب حِيْلَة الْبُرْء)
- তাহাফুতুত তাহাফুত[২৪৪] (تهافت التهافت)
- মিনহাজুল আদিল্লাহ (منهاج الأدلّة)
- ফাছলুল মাক্বাল ফী-মা বাইনাশ শারীআ'তি ওয়াল হিকমাহ মিনাল ইত্তিছাল (فَصل المَقَالِ فِيمَا بَيْنَ الشرِيعَة وَالحِكْمَة مِنَ الاتصَال)
- শরহুল ক্বিয়াস লি-আরিসতূ (شرح القيَاس لأَرِسْطُو)
- মাক্বালাতুন ফিল আক্বল (مَقَالَة فِي العَقْل)
- মাক্বালাতুন ফিল ক্বিয়াস (مَقَالَة فِي القيَاس)
- আলফাহ্ছ ফী আমরিল আ'ক্বল (الْفَحْص فِي أَمر العَقْل)
- আলফাহ্ছ আ'ন মাসাইলা ফিশ শিফা (الْفَحْص عَنْ مَسَائِل فِي الشّفَاء)
- মাসআলাতুন ফিয-যামান (مَسْأَلَة فِي الزَّمَان)
- মাক্বালাতুন ফী-মা ইয়া'তাক্বিদুহুল মাশ্শাঊন ওয়ামা ইয়া'তাক্বিদুহুল মুতাকাল্লিমূন ফী কাইফিয়্যাতি উজূদিল আ'লম (مَقَالَة فِيمَا يَعتقده المشَّاؤُون وَمَا يَعتقده المُتَكَلِّمُوْنَ فِي كَيْفِيَة وَجُوْد العَالَم)
- মাক্বালাতুন ফী নাযারিল ফারাবী ফিল মানতিক্ব ওয়া নাযারি আরিসতূ (مَقَالَة فِي نَظَرَ الفَارَابِيّ فِي المنطق وَنظر أَرِسْطُو)
- মাক্বালাতুন ফিত্তাসিল আ'ক্বলিল মুফারিক্বি লিল ইনসান (مَقَالَة فِي اتّصَال العَقْل المفَارق لِلإِنْسَان)
- মাক্বালাতুন ফিল উজূদিল মাদ্দাতিল উলা (مَقَالَة فِي وَجُوْد المَادَّة الأُوْلى)
- মাক্বালাতুন ফির রাদ্দি আ'লা ইবনি সীনা (مَقَالَة فِي الرّدّ عَلَى ابْن سينَا)
- মাক্বালাতুন ফিল মিযাজ (مَقَالَة فِي المِزَاج)
- মাসাইলু হিকামিয়্যাহ (مَسَائِل حكمِيَّة)
- মাক্বালাতুন ফী হারাকাতিল ফালাক্ব (مَقَالَة فِي حركَة الفَلَك)
- কিতাবু মা খা-লাফা ফীহিল ফারাবী আরিসতূ (كِتَاب مَا خَالف فِيه الفَارَابِيّ أَرِسْطُو)

মুসলিম প্রতীচ্যে ইবনে রুশদের দর্শনের প্রভাব

বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক রজার ব্যাকন (Roger Bacon)-এর ওপর ইবনে রুশদের বিশাল অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি ইবনে রুশদের রচনাবলি দ্বারা

---

[২৪৪] ইমাম গাযালী রহ.-এর *'আততাহাফুত'* গ্রন্থের খণ্ডনে রচিত। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন এবং তার দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রজার ব্যাকন তার ল্যাটিন ভাষায় রচিত 'ওপুস মাজুস' (Opus Majus)-গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে রুশদের প্রতিভা ও জ্ঞান-গভীরতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, তিনি (ইবনে রুশদ) একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞ দার্শনিক। তিনি মানব-দৃষ্টিভঙ্গির অনেক ভুল সংশোধন করেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের জগতে এমন অমূল্য সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন, যা কেবল তার রচনাবলিতেই পাওয়া যাবে। তিনি এমন তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যা পূর্বের কারও ছিল না। গবেষণার মাধ্যমে তিনি দর্শনশাস্ত্রের পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলো থেকে অনেক অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দূর করেছেন।

তৎকালীন পাশ্চাত্যের গির্জাসমূহের সবচে' বড় ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন ক্যাথলিক সেইন্ট থমাস অ্যাকুইনাস (Saint Thomas Aquinas)। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। তার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার রচিত গ্রন্থ 'ইজমালুল লাহুত' (The Summa theologiae/God and crietion) বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি জাগতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার সম্পৃক্তির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন যে, তার গ্রন্থ-রচনার উপাদান ও শৈলীর কৃতিত্ব অবশ্যই ইবনে রুশদের পথ ও দর্শনের।

অবশ্য কর্ডোভার দার্শনিক ইবনে রুশদ সমকালীন গির্জার নেতৃবৃন্দের নির্দয় সমালোচনা হতে রেহাই পাননি। তারা তার গুণগ্রাহী হবে দূরে থাক, কৃতঘ্নতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে কঠোর ও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছে। যেমন দার্শনিক-কবি ফ্রান্সেসকো পেত্রারক (Francesco Petrarca) (১৩০৪-১৩৭৪ খৃ.) তার সম্পর্কে বলেছেন, এই কুকুর প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়েছে বলেই আমাদের প্রভু ঈসা মাসীহ ও ক্যাথলিক ধর্ম নিয়ে ঘেউ ঘেউ করেছে। আরেক দার্শনিক দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighieri) (১২৬৫-১৩২১ খৃ.) তো শান্তভাব বজায় রেখে ইবনে রুশদকে তার কুফরির (!) কারণে নরকেই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[২৪৫]

ইবনে রুশদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের যেসব প্রশংসাবাণী রয়েছে, তার একটি হল আল্লামা যাহাবী রহ. ইবনে আবি উসাবাআ'হ-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ছিলেন ফিকহ ও বিতর্কশাস্ত্রে অনন্য ব্যক্তিত্ব,

---

[২৪৫] মুহাম্মাদ লুতফী জুমআ, *তারীখু ফালাসিফাতিল ইসলাম ফিল মাশরিক ওয়াল মাগরিব*, পৃ : ২২৩।

Scanned with CamScanner

চিকিৎসাশাস্ত্রে সুদক্ষ ।[২৪৬] স্বয়ং যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> ফিকহ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রে তার মতামত সকলের জন্য পাথেয়। তাছাড়া তিনি আরবী ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে, দিওয়ানে আবি তামাম ও দিওয়ানে মুতানাব্বী তার কণ্ঠস্থ ছিল ।[২৪৭]

ইবনে রুশদের দুর্যোগ

খলীফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে রুশদকে সরকারী বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এ কারণে ইবনে রুশদ মাগরেবের বিভিন্ন অঞ্চলে একটানা দীর্ঘদিন সফর করেন এবং এ উদ্দেশ্যেই মার্‌রাকিশ, সেভিল ও কর্ডোভায় বারবার আসা-যাওয়া করেন। ৫৭৮ হিজরীতে আবু ইয়াকুব তাকে মার্‌রাকিশে ডেকে পাঠান এবং তাকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদ প্রদান করেন। এর কিছুদিন পর খলীফা তাকে কর্ডোভার বিচারকের পদ প্রদান করেন। আবু ইয়াকুব ইউসুফের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর শাসনভার গ্রহণ করেন। নতুন খলীফার শাসনামলে ইবনে রুশদের পদ ও মর্যাদা আরও উন্নত হয় এবং খলীফা তাকে একান্তভাজন করে নেন। এ সময় খলীফার কাছের কিছু মানুষ ইবনে রুশদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে খলীফা তাকে ইহুদিদের একটি গ্রামে নির্বাসনের নির্দেশ দেন এবং তার সমস্ত গ্রন্থ জ্বালিয়ে দেন। পাশাপাশি তিনি ফরমান জারী করে সকল মুসলমানকে দর্শন পাঠে মানা করেন এবং দর্শন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে নিষেধ করেন। এ নির্দেশ অমান্যকারীর জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয় ।[২৪৮]

৫৯৫ হিজরীতে (১১৯৮ খৃস্টাব্দে) ইবনে রুশদ মার্‌রাকিশে নিজ গৃহে গৃহবন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেন ।[২৪৯]

---

[২৪৬] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩০৮ ও ইবনে আবি উসাইবিআ', *তাবাক্বাতুল আতিব্বা*, ৩/৩১৯।

[২৪৭] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩০৮।

[২৪৮] রিহাব আকাবী, *মাওসুআ'তু আ'বাকিরাতিল ইসলাম*, ২/২৪৯।

[২৪৯] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/৩০৯।

Scanned with CamScanner

২. মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন যারকূন রহ.

আল্লামা যাহাবী রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী তার পুরো নাম আলমুসনিদ আলফকীহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন আহমাদ বিন সাঈদ আনসারী ইশবীলী মালিকী। তিনি 'ইবনে যারকূন' নামে খ্যাত ছিলেন। যারকূন তার প্রপিতামহ সাঈদের উপাধি।

ইবনে যারকূন ৫০২ হিজরীতে (১১০৯ খৃস্টাব্দে) আন্দালুসের 'শারীশ' এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে দক্ষিণ স্পেনে অবস্থিত এলাকাটি 'হেরেজ' নামে পরিচিত। প্রথমে তিনি নিজ এলাকার মাশায়েখে কেরামের কাছে ইলম অর্জন করেন; এরপর তার পিতার সঙ্গে মার্‌রাকিশ গমন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় আন্দালুসে ফিরে আসেন এবং আন্দালুসের বিভিন্ন এলাকায় সফর করেন। তিনি কাযী ইয়াযের (মৃত্যু : ৫৪৪ হিজরী) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং মার্‌রাকিশ ও সিউটায় বিভিন্ন আলিমের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। ইবনে যারকূন সেভিল ও শিল্‌বে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন।

তাকে সমকালে 'মুসনিদুল আন্দালুস' বলে গণ্য করা হত। তিরমিযী রহ.-এর জামে' কাবীর ও আবু দাউদ রহ.-এর সুনানগ্রন্থের হাদীসসমূহকে একত্র করে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই মহান আলিম চুরাশি বছর বয়সে ৫৮৬ হিজরীর মধ্য রজবে (১১৯০ খৃস্টাব্দে) সেভিলে ইন্তেকাল করেন।[২৫০]

৩. ইমাম শাতিবী রহ.[২৫১]

'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে আল্লামা যাহাবী রহ. তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন,

> তিনি হলেন শায়খ, শাস্ত্রজ্ঞ ইমাম, ধার্মিক আলিম, আদর্শ ব্যক্তিত্ব, সাইয়েদুল কুর্‌রা, আবু মুহাম্মাদ আবুল কাসিম কাসিম বিন ফিররুহ বিন খাল্‌ফ বিন আহমাদ আররাঈনী আন্দালুসী শাতিবী। তিনি

---

[২৫০] প্রাগুক্ত, ২১/১৪৭।

[২৫১] ইনি বিখ্যাত মালিকী ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী নন। *আলমুওয়াফাক্বাত*, *আলই'তিসাম* প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা আবু ইসহাক শাতিবীর মৃত্যু ৭৯০ হিজরীতে। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

জন্মান্ধ ছিলেন। জন্ম আন্দালুসের শাতিবা এলাকায় ৫৩৮ হিজরীতে (১১৪৪ খৃস্টাব্দে)।[২৫২]

নিজ এলাকাতেই তিনি ইলমুল কিরাআতের পাঠ গ্রহণ করেন এবং এ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী ভ্যালেন্সিয়ায় সফর করে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি হজ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে হেজায সফর করেন এবং হজ্বের সফরেই আলেকজান্দ্রিয়ায় ইলমে দ্বীন অর্জন করেন।[২৫৩]

ইমাম শাতিবী রহ.-এর সুবিখ্যাত রচনাকর্ম হল ইলমুল কিরাআত সম্পর্কিত তার অমর কাব্যসংকলন 'হিরযুল আমানী ওয়া ওয়াজ্হুত তাহানী ফিল ক্বিরাআতিস সাবই' (خرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع), যা 'মাতনুশ শাতিবিয়্যাহ' নামে সমধিক পরিচিত। ইলমুল কিরাআতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমৃদ্ধ এ গ্রন্থটিতে তিনি এ বিষয়ে তার শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও কাব্যশাস্ত্রে তার অপূর্ব যোগ্যতার যুগপৎ সুপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইলমুল কিরাআতের এই মৌলিক গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লা যেভাবে তাকে মেধার বিকাশ ও হৃদয়ের মর্মের প্রকাশের তাওফীক দান করেছেন, তাকে আল্লাহ-প্রদত্ত নূর ছাড়া আর কী-ইবা বলা যেতে পারে! এ গ্রন্থটিতে পঙ্‌ক্তির সংখ্যা এক হাজারের উর্ধ্বে। তিনি এর সমাপিকায় লিখেছেন,

وَأَبْيَاتُهَا أَلْفٌ تَزِيْدُ ثَلَاثَةً وَمَعَ مِئَةٍ سَبْعِيْنَ زُهْرًا وَكُمَّلَا

এ রিসালার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা এক হাজার, তারপর অতিরিক্ত আরও এক শ' তেয়াত্তরটি, যা সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতায়ও অধিক।

ব্যাখ্যাকার তার এই পঙ্‌ক্তিটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, زُهْرًا ও كُمَّلًا শব্দদু'টি বাক্যস্থ تَزِيدُ শব্দের কর্তা থেকে আরবী ব্যাকরণ-রীতি অনুযায়ী 'হাল' হয়েছে। তাই এর অর্থ হচ্ছে- গ্রন্থের পঙ্‌ক্তিগুলো সৌন্দর্যমণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ তথা সব ধরনের ভাষা-সৌকর্য ও বিষয়-সৌন্দর্যসহ আলোকজ্জ্বল।

এর পরের পঙ্‌ক্তিটি হল,

وَقَدْ كُسِيَتْ مِنْهَا الْمَعَانِيْ عِنَايَةً كَمَا عَرِيَتْ عَنْ كُلِّ عَوْرَاءَ مِفْصَلَا

বিশেষ যত্ন সহকারে পঙ্‌ক্তিগুলোকে সমৃদ্ধ মর্মের পোশাকে

---

[২৫২] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/২৬১-২৬২।

[২৫৩] দেখুন : ইবনুল জাযারী, *গাইয়াতুন নিহায়া*, ২/২০-২২।

Scanned with CamScanner

> আচ্ছাদিত করা হয়েছে; তেমনই সুসংবদ্ধ দৃষ্টিতে পঙ্‌ক্তিগুলোকে সব ধরনের ত্রুটি মুক্ত করা হয়েছে।

এ পঙ্‌ক্তিটির ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, এ পঙ্‌ক্তিটিতে প্রচ্ছন্নভাবে গ্রন্থের শব্দশৈলী ও ভাষামর্ম উভয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণনীতি অনুযায়ী عِنَايَةً শব্দটির অবস্থান كُسِيَتْ শব্দটির 'মাফঊল' হিসেবে। অর্থাৎ লেখক যত্ন করে লিখেছেন বিধায় তা সুন্দর শব্দ ও চমৎকার মর্মসমৃদ্ধ হয়েছে। আর الكسوة ও العري বিপরীত অর্থবোধক এই শব্দযুগলকে একত্রে আনায় পঙ্‌ক্তিটির সাহিত্যমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এ গ্রন্থের পঙ্‌ক্তিগুলোতে একদিকে সমৃদ্ধ মর্মগুণ যুক্ত হয়েছে, অপরদিকে ভাষাগত যাবতীয় অসম্পূর্ণতা ও উদ্দিষ্ট বিষয় হতে দূরে সরে পড়ার মতো ত্রুটি সযতনে পরিহার করা হয়েছে।[২৫৪]

পবিত্র কোরআনের বিশেষ লিখনরীতি (ইলমু রসমিল খত্ত) সম্পর্কে তিনি রচনা করেছেন আরেকটি কাব্যগ্রন্থ, যার নাম 'আ'ক্বীলাতু আতরাবিল ক্বাসাইদ ফী আসনাল মাক্বাসিদ' (عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد)। কোরআনের আয়াত-সংখ্যা সম্পর্কে তার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'নাযিমাতুত যুহার' (ناظمة الزهر)। এছাড়াও তিনি শেষে 'দাল' অক্ষর-বিশিষ্ট পঞ্চাশটি পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে ইবনু আবদিল বার-এর 'আততামহীদ'-এর একটি কাব্যসংক্ষেপন রচনা করেছেন।[২৫৫]

তার শিষ্যত্বগ্রহণকারী আলিমগণের তালিকা অনেক দীর্ঘ। কারণ তিনি ছিলেন কিরাআত-শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শায়খ ও প্রখ্যাত শিক্ষক। আল্লাহ তাআ'লা তার রচনাবলি ও ছাত্রদের মাঝে আশ্চর্য বরকত দান করেছেন। তাই যারাই তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছে, প্রত্যেকেই যোগ্য ও সুখ্যাত হয়েছে।[২৫৬]

ইবনুল জাযারী রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন খ্যাতনামা ইমাম, বিরল মেধাশক্তির অধিকারী, বহু শাস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ, আল্লাহর এক বিস্ময়কর নিদর্শন, ইলমুল কিরাআতের

---

[২৫৪] ব্যাখ্যাটুকু নেওয়া হয়েছে আবু শামাহ রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ إبراز المعاني من حرز الأماني এর ৭৫৬ নং পৃষ্ঠা থেকে।

[২৫৫] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/২৬৩-২৬৪।

[২৫৬] ইবনুল জাযারী, *গাইয়াতুন নিহায়া*, ২/২২।

Scanned with CamScanner

চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব, হাদীসের হাফিয, আরবী ভাষার সুপণ্ডিত, ভাষাতত্ত্বের ইমাম ও সাহিত্যের নেতৃত্বধারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন যুহদ ও নির্মোহতা, ইবাদত, কোলাহল-বিচ্ছিন্নতা ও কাশফের অধিকারী। ফিকহের দিক থেকে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। সর্বদা সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি জন্ম থেকেই দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। তার ছাত্র ও সহচরগণ তার সম্পর্কে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক বিবরণ দিয়েছেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করেছেন। হাফিয আবু শামা মাকদিসী তো তার শানে এ কবিতাই রচনা করেছেন,

رَأَيْتُ جَمَاعَةً فُضَلَاءَ فَازُوْا ... بِرُؤْيَةِ شَيْخِ مِصْرَ الشَّاطِبِيِّ

وَكُلُّهُمْ يُعَظِّمُهُ وَيُثْنِيْ ... كَتَعْظِيْمِ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ

আমি একদল গুণী ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করেছি, যারা সকলে মিশরের শায়খ শাতিবীর সাক্ষাত-সৌভাগ্যে ধন্য হয়েছেন।

তারা প্রত্যেকেই তার মর্যাদা ও গুণের এমন কীর্তন করছিলেন, যেমন সাহাবীগণ করতেন আপন নবীর।[২৫৭]

মাক্কারী রহ. '*নাফহুত তীব*' গ্রন্থে লিখেছেন,

তিনি ছিলেন ইমাম, আল্লামা, মেধাবী, বিভিন্ন শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ, স্বীয় যুগের অদ্বিতীয় আলিম, ইলমুল কিরাআতের নেতৃত্বের আসনধারী, হাদীসের হাফিয, আরবী ভাষায় সুদক্ষ, বিস্তৃত ইলমের অধিকারী। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ কিরাআত-শাস্ত্রের হিরযুল আমানী ও রুসমুল কোরআন-শাস্ত্রের আ'ক্বীলাতু আতরাবিল ক্বাসাইদ-এর খ্যাতি জগতজোড়া। অসংখ্য তালিবে ইলম এ গ্রন্থদু'টি মুখস্থ করেছে। যুগে যুগে কাব্যজগত, সাহিত্যজগত ও কেরাতজগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ এ গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের সামনে শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন। তাদের অনেকেই এ গ্রন্থদ্বয়ের খেদমতে ধন্য হয়েছেন; কেউ সংক্ষেপণ করেছেন, কেউ সুকঠিন স্থানগুলো সহজবোধ্য করেছেন।[২৫৮]

ইমাম সুবুকী রহ. আল্লামা শাতিবী রহ. সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

---

[২৫৭] ইবনুল জাযারী, *গাইয়াতুন নিহায়া*, ২/২০-২১।

[২৫৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/২৪।

Scanned with CamScanner

তিনি ছিলেন সুতীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী; বহু নুসূস তার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি একাধারে বহু শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ, ফকীহ, ক্বারী, মুহাদ্দিস, নাহবী, দুনিয়াবিরাগী, অধিক ইবাদতগুযার ও প্রজ্বলিত মেধার অধিকারী ছিলেন। ইমাম সাখাবী রহ. বলেছেন, আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, তিনি একজন কাশফওয়ালা আল্লাহর ওলী ছিলেন। আল্লাহর কাছে তিনি নিজের অপরিচিতির দোয়া করেছিলেন। তাই তিনি যে কত উচ্চস্তরের ওলী ও আলিম ছিলেন, তা কেউ অনুধাবন করতে পারত না।[২৫৯]

ইবনে খাল্লিকান বলেছেন,

'হিরযুল আমানী' গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি এক অভিনব শৈলীর অবতারণা করেছেন। তার এ গ্রন্থটি এ যুগের ইলমুল কিরাআতের মুআল্লিম-মুতাআল্লিমগণের মূল লক্ষ্য। ইলমুল কেরাআতের বিশেষজ্ঞতায় নিমগ্ন আছেন, অথচ 'হিরযুল আমানী' গ্রন্থটি কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করেননি, এমন তালিবে ইলম নেই বললেই চলে। গ্রন্থটি বিভিন্ন সূক্ষ্ম চিহ্ন ও দুর্লভ ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনায় ভরপুর। আমার মনে হয় না যে, এর শৈলীকে অতিক্রম করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, আমার এই কাব্যগ্রন্থটি যে-ই পাঠ করবে, আল্লাহ তাকেই উপকৃত করবেন। কেননা, আমি কেবল আল্লাহর ওয়াস্তেই এই পঙ্‌ক্তিগুলো রচনা করেছি।[২৬০]

আল্লামা যাহাবী রহ. লিখেছেন,

তিনি প্রোজ্জ্বল মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইলমুল কিরাআত, ইলমু রসমিল খত্ত, নাহু, ফিকহ, হাদীস ইত্যাদি শাস্ত্রে তার অনন্য দখল ছিল। কাব্যরচনায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনের পাশাপাশি তিনি তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং স্বভাব-গাম্ভীর্যের অধিকারী ছিলেন। তার সামনে যখন মুয়াত্তা (মালিক), বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ পাঠ করা হত, তিনি আপন স্মৃতিশক্তির মাধ্যমেই পাঠকের লিপির ভুল সংশোধন করে দিতেন। কথিত আছে, তিনি এক উট-বোঝাই ইলম মুখস্থ করেছিলেন।[২৬১]

---

[২৫৯] সুবুকী, *তাবাক্বাতুশ শাফিয়িয়্যাতুল কুবরা*, ৭/২৭৩।
[২৬০] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৪/৭১।
[২৬১] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১/২৬২-২৬৪।

Scanned with CamScanner

তার এক আশ্চর্য কারামাতের কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনুল জাযারী রহ.। তিনি বলেছেন,

> আমাকে আমার কতক নির্ভরযোগ্য শায়খ তাদের উসতাযের সূত্রে জানিয়েছেন যে, শাতিবী রহ. ফজর নামায ওয়াক্তের একেবারে শুরুতে ফাযিলিয়া মসজিদে আদায় করতেন। এরপর পাঠদানের জন্য বসতেন। তার এই দরসে শরীক হওয়ার জন্য তালিবে ইলমগণ দূর-দূরান্ত থেকে রাতেই সফর করে চলে আসত। তিনি দরসের মসনদে উপবিষ্ট হয়ে প্রতিদিনই বলতেন, সবার পূর্বে যে উপস্থিত হয়েছ, সে পড়। এরপর পর্যায়ক্রমে আগমনের ধারা হিসেবে তিনি তালিবে ইলমদের পড়া শুনতেন। একদিন তিনি দরসে উপবিষ্ট হয়েই বললেন, আজ দ্বিতীয় যে জন এসেছ, সে পড়। দ্বিতীয়জন পড়তে শুরু করল। এদিকে প্রথমে যে উপস্থিত হয়েছিল সে ভাবতে লাগল, প্রতিদিন শায়খ প্রথমজনকেই পড়তে বলেন, আজ দরসে আসার পূর্বে তার কী এমন অপরাধ হয়ে গেছে, যে কারণে শায়খ তাকে প্রথম পাঠের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলেন! হঠাৎ তার মনে পড়ল, গতরাতে তার গোসল ফরয হয়েছিল; কিন্তু প্রথমে উপস্থিত হওয়ার প্রবল আগ্রহের কারণে সে ঘুম থেকে ওঠার পর গোসল করার কথা ভুলে গেছে এবং দ্রুত দরসে চলে এসেছে। শায়খ বিষয়টি অবগত হয়ে তার পরিবর্তে দ্বিতীয়জনকে পড়ার আদেশ করেছেন!
>
> স্মরণ হওয়ামাত্র সে দরস থেকে উঠে মাদরাসার সন্নিকটে হাম্মামে চলে গেল এবং দ্বিতীয়জন পড়া শেষ করার পূর্বেই গোসল শেষ করে দরসে চলে এল। দৃষ্টিশক্তিহীন শায়খ তখনও আপন স্থানে উপবিষ্ট। দ্বিতীয়জনের পড়া শেষ হতেই শায়খ বলে উঠলেন, এবার যে প্রথমে এসেছ, সে পড়। (ইবনুল জাযারী রহ. বলেন,) আমার জানামতে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ (আশ্চর্য) ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি।[২৬২]

বিস্তৃত ইলম সাধনা ও ইলম প্রসারের সংগ্রামী এক জীবন শেষে আল্লামা শাতিবী রহ. ৫৯০ হিজরীর ২৮ জুমাদাল উখরা তারিখে (১৯/০৬/১১৯৪ খৃ.) কায়রোতে ইন্তেকাল করেন এবং মিশর ও কায়রোর মধ্যবর্তী কুরাফা এলাকার কাযী ফাযিল আবদুর রহীম বীসানী কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। তার কবর এখনও সে এলাকায় প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত।[২৬৩]

---

[২৬২] ইবনুল জাযারী, *গাইয়াতুন নিহায়া*, ২/২১।
[২৬৩] প্রাগুক্ত, ২/২২।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইকাব যুদ্ধ ... কঠিন পরাজয়

৫৯৫ হিজরীতে (১১৯৯ খৃস্টাব্দে) আলমানসুর চল্লিশ বছরেরও কম বয়সে পরপারে পাড়ি জমান। এর মধ্যে ৫৮০ হিজরী থেকে আমৃত্যু ৫৯৫ হিজরী পর্যন্ত (১১৮৫-১১৯৯ খৃস্টাব্দ) তিনি মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের শাসনদায়িত্ব পালন করেন। এরপর মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তার পুত্র আননাসির লি দীনিল্লাহ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ। শাসনভার গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল সতের বছর কয়েক মাস।[২৬৪] অবশ্য বয়সে পূর্ণ পরিণত না হলেও তা বিশেষ করে তার শাসন-পরিচালনায় তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি, যেমনটি আমরা ইতিহাসে অনেকের ক্ষেত্রে দেখে থাকি। এটাও ঠিক, নেতৃত্ব-দক্ষতায় তিনি কোনভাবেই তার পিতার সমপর্যায়ের ছিলেন না।

আলমানসুর মুওয়াহহিদী তার মৃত্যুর পূর্বে পুত্র আননাসির লি দ্বীনিল্লাহকে এই আশায় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ তাকে দীর্ঘ জীবন দান করবেন; আর এর মাঝে আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ তার পিতার ন্যায় যোগ্য নেতৃত্বগুণ ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় পাবেন। কিন্তু চল্লিশ বছরেরও কম বয়সে আলমানসুরের ইন্তেকাল মাত্র সতের বছর বয়সেই অনভিজ্ঞ আননাসির লি দ্বীনিল্লাহকে দাঁড় করিয়ে দেয় এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের গুরুদায়িত্বের সামনে।[২৬৫]

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ও পথচলায় নানা প্রতিবন্ধকতা

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ছিলেন ঈমানী চেতনায় প্রদীপ্ত শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী এক যুবক।[২৬৬] কিন্তু পিতার মতো স্বভাবজাত দক্ষতা তার ছিল না। অধিকন্তু মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য তখন চারিদিক থেকে শত্রুবেষ্টিত।

---

[২৬৪] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৮৬।

[২৬৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ২৩০।

[২৬৬] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৮৬।

Scanned with CamScanner

খৃস্টানশক্তি তখনও অল্প কয়েক বছর পূর্বে আরিক প্রান্তরের শোচনীয় পরাজয়ের বেদনা ভুলতে পারেনি। নতুন করে মুসলিম ভূমিতে হামলা চালিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা অধীর অপেক্ষমান ছিল।

কিন্তু এর চেয়েও বড় যে সমস্যাটি মুওয়াহহিদী সরকারকে বলতে গেলে বিনিদ্র রেখেছিল এবং মুসলমানদের পৃষ্ঠদেশে এক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা হল বনু গানিয়ার বিদ্রোহী ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পরিস্থিতিতে বনু গানিয়ার ভূমিকা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিকৃষ্টতর। আলমানসুর মুওয়াহহিদী আন্দালুসে যুদ্ধাভিযান অব্যাহত রেখে খৃস্টানশক্তির চূড়ান্ত দফা-রফা করার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তার আন্দালুসে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বনু গানিয়া আফ্রিকায় আবারও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের এই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের কারণেই মূলত আলমানসুর খৃস্টানশক্তির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আলমানসুরের মৃত্যুর পর বনু গানিয়ার অপতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। সুবিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাও বেড়ে যায় বহু গুণে। পূর্বের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে নতুন খলীফা আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ বাধ্য হয়েই তার মূল শক্তি ব্যয় করেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বনু গানিয়ার বিদ্রোহ দমনে। বনু গানিয়ার সঙ্গে একাধিক ফ্রন্টে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর তিনি এ ফিতনাকে পুরোপুরি দমন করতে সক্ষম হন। আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ নিজে আফ্রিকায় বনু গানিয়া-দমন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং ৬০৪ হিজরীতে বনু গানিয়ার হাত থেকে আফ্রিকার হৃত শহরগুলো পুনরুদ্ধার করে রাজধানী মার্‌রাকিশে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৬৭]

অষ্টম আলফোন্সো ও মুসলিম ভূখণ্ডে চলমান অরাজকতার সদ্ব্যবহার

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ যখন আফ্রিকার অভ্যন্তরে বনু গানিয়ার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, অষ্টম আলফোন্সোর মনে তখন নতুন করে মুসলিম আন্দালুস দখলের কামনা জেগে উঠল। প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি নতুন করে যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধভাবে আলমানসুর আলমুওয়াহহিদীর সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালালেন। বিভিন্ন গ্রাম বিরান করলেন, ক্ষেত-খামারে আগুন

---

২৬৭ আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৯৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৯।

Scanned with CamScanner

জ্বালিয়ে দিলেন, হত্যা করলেন নিরস্ত্র অসংখ্য মুসলমানকে। এটি ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানশক্তির নতুন যুদ্ধের সূচনা-সংকেত।[২৬৮]

খৃস্টশক্তির মোকাবেলায় মুওয়াহহিদী প্রশাসনের অমার্জনীয় কিছু ভুল

একে তো আননাসির লি দ্বীনিল্লাহর নেতৃত্ব-যোগ্যতা পূর্ববর্তী মুওয়াহহিদী শাসকগণের তুলনায় কম ছিল, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল আরেকটি নেতৃত্বজনিত ভুল, যা তার মাঝে বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়েছিল। আর তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণ নিজের মেধা-বিবেচনার ওপর নির্ভর করা এবং পরামর্শব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা।[২৬৯] তার পিতা আলমানসুর ইতঃপূর্বে এ ভুলের প্রতিকার বিধান করেছিলেন এবং এর ফলশ্রুতিতে সফলতা ও ক্ষমতার সুদৃঢ়তা লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাকে নুসরতে ইলাহী দ্বারা সিক্ত করেছিলেন। কিন্তু আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অনুসরণ করলেন পূর্বতন শাসকগণের পথ। এদিকে মুওয়াহহিদী সামরিক শক্তিও দেশের অভ্যন্তরে বনু গানিয়ার অব্যাহত বিদ্রোহ দমনে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

এ সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি চরম মারাত্মক বিষয়। আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ প্রশাসনিক ও সামরিক বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবু সাঈদ বিন জামে' নামক তার জনৈক অসৎ, দুশ্চরিত্র ও চরম অবিবেচক উযীরের সাহায্য গ্রহণ করতে লাগলেন। ঐতিহাসিকগণ অনেকেই এই ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা ও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার সমসাময়িক আন্দালুসী ও মাগরেবী ব্যক্তিত্বগণ তার ভূমিকা সম্পর্কে সরাসরি সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২৭০]

খৃস্টানশক্তির ব্যাপক প্রস্তুতি

মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য যখন এ ধরনের নানাবিধ জটিল সমস্যায় জর্জরিত, খৃস্টানশক্তির মাঝে তখন বিরাজ করছিল অতি উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ। খৃস্টানদের ধর্মীয় গুরু স্বয়ং রোমের পোপ যুদ্ধপ্রস্তুতির

---

[২৬৮] দেখুন : আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৩৯৮, ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৩৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২০।

[২৬৯] দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২০।

[২৭০] আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২১।

Scanned with CamScanner

তদারকি করছিলেন। খৃস্টানরা একে ক্রুশেড (ধর্মীয়) যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে ধর্মের খোলসে জড়িয়ে পবিত্রতা ও পুণ্যের রং প্রদান করেছিল।

পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করল, যখন খৃস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা তৎকালীন পোপ নাফারের শাসকের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে প্রয়াত মুসলিম খলীফা আলমানসুরের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে এবং ক্যাস্টোলার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃগঠনে উদ্বুদ্ধ করলেন। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, আরিক যুদ্ধে পরাজয়ের পর ক্যাস্টোলার শাসক নাফার ও লিওন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পোপ মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় সবাইকে একতাবদ্ধ করার নিমিত্তে নাফার-শাসককে মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গের এবং ক্যাস্টোলার শাসকের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। ধর্মীয় প্রধান নেতার নির্দেশ যখন এসে গেছে, তখন নাফার-শাসকের কাছে অঙ্গীকার ও চুক্তির কী মূল্য-ই আর থাকবে! পোপের নির্দেশ তিনি শিরোধার্য বলে মেনে নিলেন।[২৭১]

এর ফলে ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তি একক দলে পরিণত হল। খৃস্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল দুই লক্ষে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ ও পাদ্রীগণের নেতৃত্বে খৃস্টান বাহিনী রওয়ানা হল মুসলিম-খৃস্টান চূড়ান্ত যুদ্ধের উদ্দেশে।

মুওয়াহহিদী বাহিনী ইকাব প্রান্তরের পথে

খৃস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আননাসির লি দীনিল্লাহ যুদ্ধের ডাক দিলেন এবং মাগরেব ও আন্দালুস থেকে সৈন্যদের সমবেত করলেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যাও বড় অংকে পৌঁছল। কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে মুসলিম বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। অবশ্য আমাদের ধারণামতে তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় এ সংখ্যাকে অতিশয়োক্তি মনে হয়।[২৭২]

আননাসির লি দীনিল্লাহ তার বাহিনী নিয়ে মাগরেব থেকে রওয়ানা হলেন এবং জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়ে সেভিলে পৌঁছলেন। এরপর সেখান

---

[২৭১] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ২৬৪।

[২৭২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৪৬, আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/২২০ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১০৮।

Scanned with CamScanner

থেকে শাল্‌বাতরা গেলেন, সেখান থেকে আবার সেভিলে ফিরলেন। এরপর সেভিল থেকে ইকাবের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। ইকাব যাওয়ার পথে কিছু সময় ব্যয় হল জাইয়ান শহরের বাইরের এলাকায়।

ইকাব এলাকার নামকরণের কারণ এই যে, সেখানে এ নামে একটি প্রাচীন প্রাসাদ ছিল। এ প্রাসাদের নামেই পুরো এলাকা ইকাব নামে পরিচিতি লাভ করে। ইকাব প্রান্তরেই সংঘটিত হয় মুসলিম ও খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক এক যুদ্ধ। আল্লাহর কী মহিমা! নাম যেমন, বাস্তবেও তা-ই ঘটে। ইকাব প্রান্তর মুসলিম বাহিনীর জন্য পরিণত হয় তাদের বিভিন্ন শরীয়তবিরোধিতার শাস্তির স্থানে, যার কিছু তো যুদ্ধের পূর্বেই প্রকাশ পায় আর কিছু প্রকাশ পায় যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই, একের পর এক ধারাবাহিকভাবে।[২৭৩]

বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আননাসির লি দীনিল্লাহ আন্দালুস-ভূমিতে অবতরণ করলেন। অভিযানের প্রথম সামরিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি শাল্‌বাতরা দুর্গ অবরোধ করলেন। টলেডোর দক্ষিণে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এ দুর্গটি ছিল বিশাল ও সুরক্ষিত। অল্প কিছু খৃস্টান নাগরিক এখানে বসবাস করত। কিন্তু অত্যন্ত সুরক্ষিত এ দুর্গ মুসলিম বাহিনী জয় করতে ব্যর্থ হল। একপর্যায়ে আননাসির লি দীনিল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন, এ দুর্গ অবিজিত রেখেই সামনে অগ্রসর হবেন। কিন্তু সঙ্গী উযীর ইবনে জামে' তাকে দুর্গটি জয়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে এখানেই অবস্থান করতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ফলে মুসলিম বাহিনী এখানেই দুর্গ অবরোধ করে বসে রইল।[২৭৪]

স্বেচ্ছাচারিতার পরিণতি ... পরাজয়ের চোখরাঙানি

আননাসির লি দীনিল্লাহ-এর এই স্বেচ্ছাচারমূলক সিদ্ধান্তের ফলে যা ঘটে তা হল,

১. শাল্‌বাতরা দুর্গ অবরোধে দীর্ঘ অথচ অতি মূল্যবান কিছু সময়ের অপচয় হয়। এখানে সময় নষ্ট না করে অগ্রসর হলে খৃস্টান বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই বিশাল মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর হামলা করতে পারত।

২. এ দীর্ঘ সময় হাতে পেয়ে খৃস্টান বাহিনী তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি পূর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং ইউরোপ থেকে আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

---

[২৭৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ২৬০-২৬৫ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৯।

[২৭৪] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৩৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২১।

Scanned with CamScanner

৩. এ সময় আন্দালুস পর্বতমালার তুষার ও বরফের কারণে মুসলিম বাহিনী সীমাহীন ক্ষতির মুখোমুখি হয়। আননাসির লি দীনিল্লাহ আন্দালুসে প্রবেশ করেছিলেন মে মাসে। তখন আবহাওয়া ছিল পুরোপুরি যুদ্ধ-উপযোগী। কিন্তু তিনি দীর্ঘ সময় শাল্‌বাতরা অবরোধে কাটানোয় প্রচণ্ড শীতের মৌসুম শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘ অবরোধজনিত ক্লান্তি এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈন্য মারা যেতে থাকে।[২৭৫]

আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসের মুসলিম বাহিনীতে যোগদান

যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রারম্ভে উত্তর থেকে আগত খৃস্টান বাহিনীকে তিনটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা হল। প্রথম দল হল ইউরোপীয় সৈন্যদের, দ্বিতীয় দল অ্যারাজোনা রাষ্ট্রের এবং তৃতীয় দল ক্যাস্টোলা, পর্তুগাল, লিওন ও নাফার রাষ্ট্রের। তৃতীয় দলটি ছিল খৃস্টান বাহিনীর সবচে' বড় অংশ।[২৭৬]

তিন দলের সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী প্রথমে রাবাহ দুর্গ অবরোধ করল। দুর্গটি মুসলমানগণ আরিকের যুদ্ধের পর পুনরুদ্ধার করেছিল। রাবাহ দুর্গের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত আন্দালুসী সেনাপতি মহান বীর আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিস রহ.। খৃস্টান বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে রাবাহ দুর্গ অবরোধ করে রাখল। অবরোধের সময় যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিস উপলব্ধি করলেন, এখান থেকে তার ও সঙ্গী মুসলমানদের বের হওয়ার কোন পথ নেই। এদিকে অ্যারোজোনা বাহিনীর অবরোধের মুখে দুর্গের বিভিন্ন প্রাচীর বিধস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিস দুর্গে অবস্থানরত মুসলমানদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন, সবাইকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন এবং মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন। তাই তিনি অবরোধকারী খৃস্টান নেতা আলফোন্সোর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, তিনি যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-সামগ্রীসহ পুরো দুর্গ আলফোন্সোর হাতে তুলে দেবেন, বিনিময়ে তাকে এবং সকল মুসলিম নাগরিককে নিরাপদে বের হয়ে নিরস্ত্র ও রসদহীন অবস্থায় দক্ষিণে চলে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অষ্টম

---

[২৭৫] জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১০৮।
[২৭৬] জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১১২।

Scanned with CamScanner

আলফোন্সো এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ফলে আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসের নেতৃত্বে দুর্গে অবরুদ্ধ মুসলমানগণ দুর্গ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে রওয়ানা হল।

কিন্তু সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনীর শরীক ইউরোপীয় পক্ষ আলফোন্সোর এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাল। মুসলমানদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তো এখন কেবল ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়; বরং এর সঙ্গে বহুজাতিক খৃস্টান বাহিনীর সকলের স্বার্থ জড়িত। তারা তো কেবল মুসলমানদের হত্যা করার জন্যই এত কষ্ট করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কন্স্টানটিনোপলসহ ইউরোপের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ থেকে খৃস্টান বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সুতরাং তাদের চোখের সামনে দিয়ে মুসলমানরা এভাবে নিরাপদে বেরিয়ে যাবে, এটা তাদের মোটেই বরদাশত হল না।

কিন্তু আলফোন্সো আবুল হাজ্জাজের সঙ্গীদের ওপর এই যুক্তিতে হামলা চালাতে অস্বীকৃতি জানালেন যে, এরপর যখন তিনি মুসলমানদের অন্যান্য দুর্গ অবরোধ করবেন, তখন তার এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা কাজে দেবে এবং অন্যান্য দুর্গের মুসলমানগণও সহজে নতি স্বীকার করে দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। অপরদিকে এখন যদি তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমানদের ওপর হামলা চালান, তাহলে অভিযানের পরবর্তী ধাপগুলোতে মুসলমানগণ কিছুতেই আপন আপন দুর্গের দ্বার স্বেচ্ছায় উন্মুক্ত করবে না। কিন্তু আলফোন্সোর এই দূরদর্শিতা ইউরোপীয়দের অনেকেই অনুধাবন করতে পারল না। তারা তার সিদ্ধান্তে আপত্তি জানাল এবং অনেকেই বাহিনী ছেড়ে আপন আপন এলাকায় ফিরে গেল।[২৭৭]

ফলে ইকাব প্রান্তরের মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই খৃস্টান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পেল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। নিঃসন্দেহে এটি ছিল মুসলিম বাহিনীর জন্য অনেক বড় একটি নৈতিক, মানসিক ও বস্তুগত বিজয় আর খৃস্টান বাহিনীর জন্য চরম আঘাত ও মানসিক পরাজয়। খৃস্টান বাহিনীর বড় অংশের এই পশ্চাদ্‌গমনের কারণে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল খৃস্টান বাহিনীর কয়েক গুণ বেশি।[২৭৮]

---

[২৭৭] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ ৪০১, ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৩৮, আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২২ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১১৪।

[২৭৮] শাওকী আবু খলীল, *আলই'কাব*, পৃ : ৩৪ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১১৪।

Scanned with CamScanner

দুষ্ট সঙ্গীর পরামর্শে আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসকে হত্যা

আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিস যখন আননাসির লি দ্বীনিল্লাহর কাছে পৌঁছলেন এবং আননাসির জানতে পারলেন যে, আবুল হাজ্জাজ রাবাহ দুর্গ শত্রুবাহিনীর হাতে সমর্পণ করে এসেছেন এবং দুর্গে থাকা যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদসামগ্রী খৃস্টান বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেছেন, তখন তার দুষ্ট উযীর আবু সাঈদ বিন জামে' দুর্গের প্রতিরক্ষায় অবহেলার অপরাধে আবুল হাজ্জাজকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ তার এই উযীরের পরামর্শ গ্রহণে সামান্য দ্বিধা না করে আন্দালুসের মহান বীর সেনাপতি আবুল হাজ্জাজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন।[২৭৯]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল আননাসির লি দ্বীনিল্লাহর মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত এবং অবিবেচক ও অযৌক্তিক কাজ। পূর্বে তিনি যেসব ভুল করেছিলেন, তার সঙ্গে এবার আরও একটি আত্মঘাতী ভুল যোগ হল। এ সিদ্ধান্তের নেতিবাচক দিকগুলো হল,

১. আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিস এভাবে দুর্গ ছেড়ে এসে কোন ভুল করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করেছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বৃহত্তর মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি যদি দুর্গ-অভ্যন্তরেই অবস্থান করতেন, তার এবং সঙ্গী মুসলমানদের প্রাণের বিনাশ ছাড়া কিছুই হত না। আর যদি তারা প্রাণে রক্ষাও পেত, আরোপিত অবরোধের কারণে কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সহায়তায় আসতে পারত না।

২. যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসের এই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, তারপরও এই ভুলের শাস্তি কোনমতেই প্রাণদণ্ড হতে পারে না। বিশেষত তিনি স্বেচ্ছায় এ সিদ্ধান্ত নেননি। সর্বোচ্চ এটি ছিল তার ইজতিহাদী ও চিন্তাগত ভুল।

এ ধরনেরই একটি ভুল ইকরিমা বিন আবু জাহল রাযি. করেছিলেন হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতকালে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোন এক যুদ্ধে। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর রাযি. ইকরিমার এই

---

[২৭৯] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৩৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৪৯।

Scanned with CamScanner

ভুলের প্রতিকার বিধানরূপে কেবল তাকে মৌখিকভাবে তিরস্কার করেছেন এবং তার ভুল তার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর তাকে তার বাহিনীসহ নতুন করে যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের অন্য বাহিনীর সহায়তায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। বরং এতটুকুতেই ক্ষান্ত না থেকে ইকরিমা ও তার বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করতে সেই বাহিনীর সেনাপতির কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে অভিযানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইকরিমা বিন আবু জাহল-এর পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৮০]

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-এর এই ভুল সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম বাহিনী যে কেবল একজন সুদক্ষ ও মহান বীরকে হারাল তা-ই নয়; বরং তারা হারাল আন্দালুসের বিশাল বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকেও। কেননা, এরপর থেকে আন্দালুসী বাহিনীর প্রতিটি সদস্য অনুভব করতে লাগল যে, মুসলিম বাহিনীর মাঝে মাগরেব ও আন্দালুসের একটি বিভাজন কাজ করছে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের এক চোরা স্রোত প্রত্যেক্যের হৃদয়ে বয়ে যেতে লাগল। এর ফলাফল যে কতটা নেতিবাচক ছিল, তা সামনেই প্রকাশ পাবে।

এ কারণেই আন্দালুসের প্রবাদতুল্য ঐতিহাসিক মাক্কারী '*নাফহুত তীব*' গ্রন্থে লিখেছেন,

> ইকাব যুদ্ধের পরাজয় ছিল আন্দালুস বরং আন্দালুস ও মাগরেব উভয় অংশের জন্য এক মহাপ্রলয় সমতুল্য। আর এর অন্যতম কারণ ছিল অসৎ ও দুষ্ট প্রশাসন-নীতি। ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আন্দালুসী সেনাপতিদের খলীফা আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ও তার উযীর অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন এবং জনৈক আন্দালুসী সেনাপতিকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। এর ফলে মুসলিম বাহিনীর (আন্দালুসী সৈন্যদের) মানসিকতা ও ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ইউরোপীয় বাহিনীর ভাগ্য খুলে যায়। আল্লাহ পাক তো আপন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবল। ইকাবের যুদ্ধের এই মর্মন্তুদ ট্রাজেডির পর (আন্দালুস-ভূমিতে) মুসলমানদের প্রশংসাযোগ্য কোন অবস্থান আর সৃষ্টি হয়নি।[২৮১]

---

[২৮০] তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ২/২৭৫।

[২৮১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৮৩।

Scanned with CamScanner

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহর যুদ্ধ-কৌশল এবং ভুলের ধারাবাহিকতা

পূর্বের ভুলগুলোকে পূর্ণতা দানের জন্যই যেন আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ সম্মুখযুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেনাবাহিনীর বিন্যাস ও বণ্টনের ক্ষেত্রে এক বিরল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তার পদক্ষেপে প্রমাণ হয়ে গেল যে, আলমানসুর মুওয়াহহিদী বা ইউসুফ বিন তাশফীনের ন্যায় তিনি যুদ্ধ-ইতিহাস অধ্যয়ন করতেন না এবং পূর্ববর্তীদের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতেন না। তিনি পুরো বাহিনীকে সম্মুখ ফ্রন্ট ও পশ্চাৎ ফ্রন্ট– দু' ভাগে বণ্টন করলেন। কিন্তু সম্মুখ ফ্রন্টে রাখলেন স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদেরকে, যাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ষাট হাজার। আর পেছনের অংশে রাখলেন নিয়মিত মুওয়াহহিদী বাহিনীকে।[২৮২]

যদিও সামনের অংশের জন্য নির্বাচিত এসব স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাগণ নির্ভেজাল ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন এবং লড়াইয়ের বাধভাঙা চেতনা ধারণ করছিলেন; কিন্তু এ ধরনের সমরক্ষেত্রে লড়াইয়ের দক্ষতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। বিপরীতে খৃস্টান বাহিনী তাদের সম্মুখ ফ্রন্টের জন্য বাছাই করেছিল বাহিনীর সবচে' অভিজ্ঞ, তাজাদম ও শ্রেষ্ঠ সৈনিকদেরকে। সুতরাং স্বাভাবিক বিবেচনাবোধের দাবি এই ছিল যে, আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে এমন সৈন্যদের রাখবেন, যারা খৃস্টান বাহিনীর সুদক্ষ সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত অগ্রবর্তী দলের প্রথম হামলা সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে যুদ্ধের প্রথমভাগেই মুসলিম বাহিনী যুদ্ধপরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে এবং এ ধরনের বিশাল ও সম্মুখ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি, এর ফলে মুসলিম বাহিনীর মানসিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বিপরীতে খৃস্টান বাহিনী মানসিকভাবে হীনবল হয়ে পড়বে। কিন্তু আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-এর ভুল পরিকল্পনায় ঘটল এর সম্পূর্ণ উল্টো এবং অনভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের রাখা হল একেবারে সম্মুখ-সারিতে।

ভুল পরিকল্পনার ধারা এখানেই থামল না। আননাসির আন্দালুসী সৈন্যদেরকে রাখলেন বাহিনীর ডান বাহুতে। অথচ দুঃসাহসী আন্দালুসী

---

[২৮২] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৩৯, ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১১৮।

Scanned with CamScanner

সেনাপতি ও মহান বীর আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসকে হত্যা করার কারণে তাদের অন্তর তখন ব্যথা ও দহন-যন্ত্রণায় ভরপুর ছিল। সুতরাং খৃস্টান বাহিনীর প্রথম আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে নির্বাচন করা ছিল আরেকটি কৌশলগত ভুল।[২৮৩]

ইকাব যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর প্রধান আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ যেসব ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা একসঙ্গে বিন্যস্ত করলে নিম্নরূপ ধারণ করে।

১. শাল্‌বাতরা দুর্গ অবরোধে দীর্ঘ সময় নষ্ট। এর ফলে খৃস্টান বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যায়।

২. আবু সাঈদ বিন জামে' নামক অসৎ উযীরের কুপরামর্শ গ্রহণ।

৩. বিখ্যাত আন্দালুসী সেনাপতি আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন কাদিসকে প্রাণদণ্ড প্রদান।

৪. সমরক্ষেত্রে পৌছার পর সেনাবিন্যাস ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কৌশলগত ভুল।

৫. সবচে' বড় যে ভুলটি আননাসির করেছিলেন তা হল, জনবল ও অস্ত্রবলের ওপর ভরসা ও আস্থা রাখা। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এ বিশ্বাস নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন যে, তিনিই জয়ী হবেন।[২৮৪] কারণ, তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। আর তখনই দিগন্ত জুড়ে পুঞ্জীভূত হয়েছিল হুনাইনের নতুন মেঘ, যার বিবরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এভাবে দিয়েছেন,

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾

এবং (বিশেষ করে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন) হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করেছিল। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছিলে। [সূরা তাওবা : ২৫]

---

[২৮৩] জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১১৮।

[২৮৪] দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৮৩ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/২২০।

Scanned with CamScanner

ইকাব প্রান্তর ... তিক্ত শাস্তি

ইতঃপূর্বে আন্দালুস ইতিহাসে বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে এবং আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে খন্দকের প্রান্তরে যেভাবে ঐতিহাসিক হুনাইন যুদ্ধের চিত্র পুনঃমঞ্চস্থ হয়েছিল, আরও একবার আন্দালুসের মাটিতে সেই একই ঘটনা মঞ্চস্থ হল। খন্দকের যুদ্ধের সময় আবদুর রহমান আননাসির ছিলেন তার সামরিক শক্তির সর্বোচ্চ অবস্থানে অধিষ্ঠিত; আর এখন আননাসির লিদ্বীনিল্লাহ-ও ইকাব প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি নিয়ে। শুধু মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের কথা বলি কেন, ৯২ হিজরীতে আন্দালুস বিজয়ের পর এর চেয়ে বৃহৎ কোন সেনাবাহিনী আন্দালুসবাসী কখনো দেখেনি। কিন্তু মুসলমানরা কবে কোথায় সৈন্যবলে বিজয় লাভ করেছে?!

যুদ্ধপ্রস্তুতির শুরু থেকেই যেভাবে একের পর এক ভুল আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ করে গেছেন, তাতে পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

যুদ্ধের শুরুতেই স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যগণ খৃস্টান বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশের ওপর প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ক্যাস্টোলাবাহিনীর অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় অংশের পক্ষ থেকে তারা কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। খৃস্টান বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশ দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর এ অংশটির আক্রমণ প্রতিরোধ করল এবং মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল। প্রথম ধাক্কায়ই নিহত হল হাজার হাজার মুসলিম।

এক লক্ষ ষাট হাজার সৈন্যের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে খৃস্টান বাহিনীর অগ্রবর্তী দল পুরোপুরি বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হল এবং মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রে মুওয়াহহিদী নিয়মিত সৈন্যদের কাছে পৌঁছে গেল। কেন্দ্রীয় মুসলিম বাহিনী এই ধাক্কা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেও হাজার হাজার সৈন্যের মৃত্যুতে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যদের মনোবল ততক্ষণে একেবারেই ভেঙে গেছে। বিপরীতে খৃস্টান বাহিনীর মনোবল একই কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে শতগুণ।

এ অবস্থা দেখে অষ্টম আলফোন্সো তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে উদ্ধার ও সহায়তা করতে এবার তার বিশেষ প্রশিক্ষিত সহায়ক বাহিনীকে প্রেরণ করলেন। এরা যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিতেই যুদ্ধ-পরিস্থিতি পুরোপুরি খৃস্টান বাহিনীর অনুকূলে চলে গেল।

Scanned with CamScanner

ঠিক একই সময় মুসলিম বাহিনীতে ঘটল আরেক মারাত্মক দুর্ঘটনা। আন্দালুসী বাহিনীর সৈনিকগণের অন্তর তো পূর্ব থেকেই বিষণ্ন ছিল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকটা বাধ্য হয়ে তারা মুওয়াহহিদী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিল। উপরন্তু তাদের আস্থা ও নির্ভরতা ছিল সংখ্যাধিক্যের উপর, আল্লাহর সাহায্যের ওপর নয়। তাই তারা যখন স্বেচ্ছাসেবী হাজার হাজার যোদ্ধাকে অল্প সময়ে শহীদ হতে দেখল, তখন পূর্ব বিষণ্নতা ও সংখ্যা-নির্ভরতার দুর্বলতার সঙ্গে তাদের অন্তরে ভীতির অনুভূতিও যুক্ত হল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল।

মুসলিম বাহিনীর ডান বাহু ময়দান ছেড়ে পালাতে উদ্যত হতেই খৃস্টান বাহিনী চারদিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল গণ হত্যাযজ্ঞ। অল্প সময়েই শহীদ হল হাজার হাজার মুসলিম সিপাহী।[২৮৫]

মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি পরাজিত হল। আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ অবশিষ্ট বিধ্বস্ত-পরাজিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ যখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, তখন স্বগত কণ্ঠে উচ্চারণ করছিলেন, 'রহমান সত্য বলেছেন আর শয়তান বলেছে মিথ্যা'।[২৮৬] তিনি যখন ময়দানে প্রবেশ করছিলেন, তখন সংখ্যাধিক্যের কারণে ধারণা করছিলেন যে, তিনিই বিজয়ী হবেন। এখন বুঝতে পারলেন যে, তার সেই চিন্তা ছিল শয়তানের মিথ্যা প্রবঞ্চনা। আর রহমান তো সত্যই বলেছেন,

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾

এবং (বিশেষ করে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন) হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করেছিল। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন

---

[২৮৫] দেখুন : শাওকী আবু খলীল, *আলই'কাব*, পৃ : ৪৫ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/১১৯।

[২৮৬] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৩৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২৪।

Scanned with CamScanner

করেছিলে । [সূরা তাওবা : ২৫]

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-ও আয়াতের ভাষ্যমতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালালেন। পরাজয়ের তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পেল আননাসিরের আরেকটি মারাত্মক ভুলে; এ ধরনের পরিস্থিতিতে যা যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের চেয়ে কোন অংশে কম ক্ষতিকর ছিল না। তিনি ইকাব প্রান্তর থেকে পলায়নের পর নিকটবর্তী কোন নগরীতে থামলেন না; বরং ইকাব প্রান্তরের নিকটবর্তী বাইয়াসা, উব্বাযা উভয় শহর অরক্ষিত ফেলে সোজা সেভিলে চলে গেলেন।[২৮৭] এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল খৃস্টান বাহিনী এবার প্রবল প্রতাপ নিয়ে এ নগরীগুলোতে নিশ্চিত আক্রমণ করবে।[২৮৮]

ইকাব-পরবর্তী ধারাবাহিক দুর্যোগ ও বিপদ

বাইয়াসা ট্রাজেডি

শান্তির (ইকাব) প্রান্তরে মুসলমানদের শান্তি দিয়ে ও পরাজিত করে খৃস্টান বাহিনী এবার সম্মুখপানে অগ্রসর হল। প্রথমেই তার বাইয়াসা নগরী দখল করে নিল। নগরবাসী প্রাণের ভয়ে পূর্বেই শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। একমাত্র বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার আশায় শহরের বড় মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, খৃস্টান বাহিনী এ কারণে তাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করবে।

আচ্ছা, মসজিদে আশ্রয় নেওয়া এসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ কি রক্ষা পেয়েছিল? খৃস্টান বাহিনী তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছিল? ঐতিহাসিক মার্‌রাকিশী *'আলমু'জিব'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> আলফোন্সো বাইয়াসা নগরীকে অনেকটা জনশূন্য অবস্থায় পেলেন। তিনি শহরের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিলেন এবং বড় মসজিদটি ধ্বংস করে ফেললেন।[২৮৯]

---

[২৮৭] ইবনে আবি যারা', *রাওযুল ক্বিরতাস*, পৃ : ২৪০ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২৪।

[২৮৮] ইকাব যুদ্ধে বিজয়ের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে আধুনিক স্পেন রাষ্ট্র প্রতিবছর ১৬ জুলাই 'বিজয় দিবস' উদযাপন করে থাকে। এর দ্বারা অনুধাবন করা যায়, পরবর্তী সময়ে মুসলিম আন্দালুসের চূড়ান্ত পতনের ক্ষেত্রে ইকাব যুদ্ধের কী সুবিশাল প্রভাব ছিল। (অনুবাদক)

[২৮৯] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৪০২।

Scanned with CamScanner

উব্বাযা ট্রাজেডি

আল্লামা হিময়ারী '*আররাওযুল মি'তার*' গ্রন্থে লিখেছেন,

> উব্বাযা আন্দালুসের একটি শহর। একটি বড় নদীর তীরে গড়ে ওঠা উব্বাযা নগরী বাইয়াসা থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত ছোট একটি জনপদ। শহরটিতে গম, যবসহ প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হত। ৬০৯ হিজরীতে ইকাব যুদ্ধের পর খৃস্টান বাহিনী এ শহরে আগ্রাসন চালায়। উব্বাযাবাসী বাইয়াসাবাসীর মতো শহর ছেড়ে পালায়নি। তারা খৃস্টানবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে খৃস্টান বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। বহু মুসলিম নাগরিক শহীদ হয়, বন্দী হয় অনেকে।[২৯০]

মার্‌রাকিশী রহ. '*আলমু'জিব*' গ্রন্থে লিখেছেন,

> আলফোন্সো খৃস্টান বাহিনী নিয়ে উব্বাযায় অবতরণ করলেন। উব্বাযায় তখন নগরীর অধিবাসীগণ ছাড়াও ইকাব প্রান্তরে পরাজিত মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ ও পার্শ্ববর্তী বাইয়াসা নগরীর অধিবাসীগণ অবস্থান করছিল। একটানা তেরদিনের প্রতিরোধের পর মুসলমানদের প্রতিরোধশক্তি ভেঙে পড়ল এবং খৃস্টান বাহিনী জোরপূর্বক শহরে প্রবেশ করল। শুরু হল গণহত্যা, বন্দীকরণ ও লুটপাট। স্বয়ং আলফোন্সো ও তার সৈন্যরা মিলে বন্দীদের মধ্য থেকে নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসী হিসেবে রোমে পাঠানোর উদ্দেশ্যে পৃথক করতে লাগল। এটি ছিল মুসলমানদের জন্য সবচে' কঠিন আঘাত।[২৯১]

ইকাব প্রান্তরের মর্মন্তুদ পরাজয়ের পর মাগরেব ও আন্দালুস- মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের উভয় অংশে মুসলমানদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। তাই তো ঐতিহাসিকগণ সমস্বরে উচ্চারণ করেছেন যে, ইকাব যুদ্ধের পর আপনি মাগরেব-আন্দালুস কোথাও লড়াই করতে সক্ষম কোন তরুণ খুঁজে পাবেন না। একটিমাত্র যুদ্ধ মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ন্যায় বিশাল ও শক্তিশালী রাষ্ট্রকে

---

[২৯০] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ০৬।

[২৯১] আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৪০২।

Scanned with CamScanner

সামান্য সময়ের ব্যবধানে দুর্বল ও ধ্বংসপ্রায় করে দিয়েছিল।[২৯২]

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-ও পরাজয়ের পর অতিমাত্রায় ঘাবড়ে যান এবং পলায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি তাড়াহুড়া করেন। তিনি সেভিলে পৌঁছেই শান্ত না হয়ে সেখান থেকে দ্রুত তার রাজধানী মার্‌রাকিশে চলে আসেন এবং নিজেকে রাজপ্রাসাদের চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ করে রাখেন। এরপর তড়িঘড়ি করে তিনি তার পুত্রকে পরবর্তী যুবরাজ (ওলিয়ে আ'হদ) ঘোষণা করেন; অথচ তখনও পুত্রের বয়স পনের পেরোয়নি।

এর মাত্র একবছর পর ৬১০ হিজরীতে (১২১৪ খৃস্টাব্দে) বয়স চৌত্রিশ পেরোনোর পূর্বেই আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। কতক ইতিহাসগ্রন্থের ভাষ্য অনুসারে মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুনরায় আন্দালুস-ভূমিতে অভিযান পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[২৯৩] তার মৃত্যুর পর মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তার পুত্র ও ঘোষিত যুবরাজ আলমুসতানসির বিল্লাহ। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর।[২৯৪]

এভাবে নতুন করে আবারও ঘটল বিভক্ত আন্দালুস-আমলের ভুলের পুনরাবৃত্তি। আমানত বিনষ্ট করা হল; দায়িত্ব অর্পণ করা হল অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে। মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের দীর্ঘ সময়ের প্রতাপ, ক্ষমতা ও উচ্চারোহণের পর আবারও মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে এল অব্যাহত পরাজয়ের বিভীষিকা।

---

[২৯২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৪৬।

[২৯৩] অজ্ঞাত, *আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ১৬১, ইবনুল খতীব, *রক্বমুল হুলাল*, পৃ : ৬০ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২৫।

[২৯৪] আবদুল ওয়াহিদ আলমার্‌রাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ৪০৪, যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২২/৩৪০, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৫০ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ২/২২৬।

Scanned with CamScanner

আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-এর শাসনামলের বিখ্যাত আলিমগণ

১. ইবনে জুবাইর রহ.

তার পুরো নাম আল্লামা আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জুবাইর আলকিনানী আন্দালুসী। সাহিত্যিক ও পরিব্রাজক হিসেবে তার খ্যাতি রয়েছে। ৫৪০ হিজরীতে (১১৪৫ খৃস্টাব্দে) তিনি ভ্যালেন্সিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইলমুল কিরাআতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর সাহিত্যে মনোযোগী হন এবং সাহিত্য, কাব্যরচনা ও গদ্যলেখনীর জগতে যোগ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হল, ভ্রমণবৃত্তান্ত 'রিসালাতু ইবনি জুবাইর', কাব্যসংকলন 'নায্মুল জুমান ফিত তাশাক্কী মিন ইখওয়ানিয যামান' (نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان), স্ত্রী উম্মুল মাজ্দের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা-সংকলন 'নাতীজাতু বিজদিল জাওয়ানিহ ফী তাবীনিল ক্বারনিস সালিহ' (نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرن الصالح)।

তার একটি কাব্যপঙ্‌ক্তি হল,

تَأَنَّ فِي الْأَمْرِ لَا تَكُنْ عَجِلًا ... فَمَنْ تَأَنَّى أَصَابَ أَوْ كَادَا

وَكُنْ بِحَبْلِ الْإِلٰهِ مُعْتَصِمًا ... تَأْمَنْ مِنْ بَغْيِ كَيْدِ مَنْ كَادَا

কাজকর্ম ধীরে সুস্থে সম্পাদন কর, তাড়াহুড়ো করো না। কেননা, ধীরস্থিরতার সঙ্গে কাজ করলে হয় সফল হবে কিংবা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে।
আর মজবুত করে আঁকড়ে ধর ইলাহী রজ্জুকে, নিরাপদ থাকবে অনিষ্টকামীর চক্রান্ত ও অনাচার থেকে।

فَكَمْ رَجَاهُ فَنَالَ بُغْيَتَه ... عَبْدٌ مُسِيْءٌ لِنَفْسِه كَادَا

وَمَنْ تَطُلْ صُحْبَةُ الزَّمَانِ لَه ... يَلْقَ خُطُوْبًا بِه وَأَنْكَادَا

কত এমন হয়েছে যে, নিজের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারী বান্দা

Scanned with CamScanner

তার প্রত্যাশার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে অথবা প্রায় পৌঁছে গেছে। আর কালের দীর্ঘ সংস্পর্শ পেয়েও অনেকে লাভ করেছে যৎসামান্য কিছু সৌভাগ্য।[২৯৫]

তিনি যখন বাগদাদে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার একটি বাগান থেকে একটি সতেজ ডাল কেটে নেন। তার হাতে ডালটি শুকিয়ে নির্জীব হয়ে গেলে তিনি তক্ষণাৎ নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় রচনা ও আবৃত্তি করেন,

لَا تَغْتَرِبْ عَنْ وَطَنٍ وَاذْكُرْ تَصَارِيْفَ النَّوَى
أَمَا تَرَى الْغُصْنَ إِذَا مَا فَارَقَ الْأَصْلَ ذَوَى

স্বদেশ ভূমি ছেড়ে প্রবাসী হয়ো না; ভুলে যেও না খেজুর আঁটির বিবর্তন। দেখনি, বৃক্ষশাখা যখন মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন কেমন নির্জীব ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে।[২৯৬]

তার অনন্য গদ্যকুশলতার একটি নমুনা *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থে আল্লামা মাক্কারী রহ. তুলে ধরেছেন। ইবনে জুবাইর তার দামেশক-ভ্রমণের সময় দামেশক সম্পর্কে বলেছিলেন,

جنّة المَشرق، ومَطلعُ حُسنه المُونق المُشرق. هي خاتمة بلاد الإسلام الَّتي استقريناها، وعروس المدن الَّتي اجتليناها. قد تحلَّتْ بأزاهير الرياحين، وتجلَّتْ في حلل سُندسيَّة من البساتين، وحلَّتْ من موضع الحسن بمكانٍ مكينٍ، وتزيَّنتْ في منصّتها أجملَ تزيينٍ، وتشرَّفتْ بأن آوى الله تعالى المسيحَ وأمَّه منها إلى ربوةٍ ذاتِ قرارٍ ومعينٍ، وظلٍّ ظليلٍ، وماء سلسبيل، تنساب مذانبُه انسيابَ الأراقمِ بكلِّ سبيلٍ، ورياض يُحْيِي النَّفوسَ نسيمُها العليل، تتبرَّج لناظريها بمجتلًى صقيلٍ، وتناديهم: هلمّوا إلى معرّس للحسن ومقيلٍ. قد سئمت أرضها كثرة الما، حتى اشتاقت إلى الظّما، فتكاد تناديك بها الصُّمُّ الصّلاب. اركض برجلك، هذا مغتسلٌ باردٌ وشرابٌ. قد أحدقتْ بها البساتين إحداقَ الهالة بالقمر، واكتنفتْها اكتنافَ الكمامة للزهر، وامتدّتْ بشرقيّها

---

[২৯৫] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২২/৪৬-৪৭।
[২৯৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/৩৮২।

Scanned with CamScanner

غوطتُها الخضراء امتدادَ البصر، فكلُّ موقع لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قيد النظر، ولله صدق القائلين فيها: إن كانت الجنّة في الأرض فدمشق لا شكّ فيها، وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتحاذيها!

দামেশক। প্রাচ্যের ভূস্বর্গ। প্রদীপ্ত সৌন্দর্যের উদয়াচল। মুসলিম বিশ্বের যেসব নগরী আমি ভ্রমণ করেছি, দামেশক তার শেষ প্রান্ত। যেসব শহরের রূপে-গুণে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি, দামেশক সবার বর-পাত্র। দামেশক সজ্জিত হয়েছে পল্লবিত বাগিচার রেশমী আচ্ছাদনে; বিকশিত হয়েছে সুরভিত গুল্মের মুকুলিত দেহাবরণে; অধিষ্ঠিত হয়েছে অনিন্দ্য রূপমাধুরীর সুদৃঢ় অবস্থানে এবং ধন্য হয়েছে মহান প্রতিপালকের করুণা-নির্বাচনে। আল্লাহ পাকের আদেশে মাসীহ ও উম্মে মাসীহ আশ্রয় নিয়েছিলেন দামেশকের উচ্চভূমিতে; যেখানে ছিল অবারিত শান্তি-কায়া, নিবিড় তরু-ছায়া ও স্বচ্ছ ঝরনা-ধারা।

সুমিষ্ট পানির প্রবহমান ধারা সাপের মতো একে-বেঁকে পুরো ভূখণ্ডে বয়ে চলেছে। পুষ্পিত উদ্যানভূমি মৃদুমন্দ বায়ুতে পর্যটকের দেহ-মন উজ্জীবিত করছে আর সুকোমল স্নিগ্ধতায় নিজেকে মেলে ধরেছে। দামেশক যেন হাতছানি দিয়ে সকলকে আহ্বান করছে, এসো, সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে; দিবস-রজনীর অবকাশ-কেন্দ্রে। সুপেয় পানির ভারে ক্লান্ত দামেশক-ভূমি প্রবল কামনা করছে একটু খানি তৃষ্ণার ও পিপাসার! বারবার তোমায় ডেকে বলছে, এসো, আঘাত কর পা দিয়ে এখানে; দেখ, এই তো শীতল পানি, স্নানের ও তৃষ্ণা নিবারণের!

দামেশককে ঘিরে আছে ঘন উপবন, যেভাবে আলোকবলয় ঘিরে রাখে চন্দ্রকে। দামেশককে জড়িয়ে রেখেছে পল্লবিত পুষ্পোদ্যান, যেভাবে পুষ্পবৃতি জড়িয়ে রাখে পুষ্পকে। দামেশকের পূর্ব-পশ্চিমে যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল গুতা অঞ্চল[২৯৭]।

---

[২৯৭] দামেশক শহর ও আশেপাশের পল্লীসমূহের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিন দিকে অবস্থিত বিশাল সবুজ অঞ্চলের নাম 'গুতা'। ভূমি-উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এ অঞ্চলের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। এ

Scanned with CamScanner

> চারিদিকে নিখাদ সবুজের মেলা, বর্ণিল প্রকৃতির খেলা! আল্লাহর শপথ! যিনি বলেছেন, সত্য বলেছেন, মাটির পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে 'স্বর্গ' বলে, নিঃসন্দেহে তা দামেশক-ভূমি; আর যদি থাকে ঊর্ধ্বজগতে, তবে তা দামেশকের-ই সমান্তরালে, দামেশকের গগন-ভূমি![২৯৮]

জীবনীকার ও ইতিহাসলেখকগণ অকুণ্ঠচিত্তে ইবনে জুবাইরের প্রশংসা করেছেন। লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি ফিকহ ও ইলমুল হাদীসে আন্দালুসের প্রাজ্ঞ আলিমগণের একজন। সাহিত্যেও তার সরব পদচারণা রয়েছে।

'*নাফহুত তীব*' গ্রন্থে মাক্কারী রহ. লিখেছেন,

> আবুল হুসাইন ইবনুল জুবাইর আলমুতারজিম সাহিত্যে দুনিয়াজোড়া সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চা পরিহার করে যুহদানা যিন্দেগী গ্রহণ করেন।[২৯৯]

ইবনে জুবাইর ৬১৪ হিজরীর ২৯ শাবান (১২১৭ খৃস্টাব্দে) আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[৩০০]

২. ইবনুল কুরতুবী রহ.

তার পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান বিন আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ আলআনসারী আলমালাক্বী। তার উপনাম আবু মুহাম্মাদ। তবে

অঞ্চলকে পৃথিবীর অন্যতম সবুজ ভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পুরো অঞ্চলটি বাগান, পাহাড়, নদী ও ঝর্না ইত্যাদি প্রাকৃতিক নেয়ামতে ভরপুর। ঘন সবুজ গাছ-পালায় ঘেরা গুতা অঞ্চলে প্রচুর ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। পাখ-পাখালির কলতান, ভোমরা-মৌমাছির গুঞ্জরন, কাঁচা-পাকা ডুমুর ও যাইতুনের মৌ মৌ ঘ্রাণ এ অঞ্চলের সবসময়ের ছবি। দূর-অতীত ও নিকট-অতীতের ঐতিহাসিকগণ গুতা অঞ্চলকে পৃথিবীর অন্যতম সজীব-সুন্দর ভূমি হিসেবে গণ্য করেছেন।

গুতার যে বৈশিষ্ট্য বলা হল, ক'দিন আগেও সিরিয়া-মানচিত্রে তার দেখা মিলত। কিন্তু আজকের সিরিয়া? কসাই বাশার আলআসাদের সিরিয়া, দামেশক ও গুতা অঞ্চলের রং আজ সবুজ নয়; কয়লা কালো! দামেশক ও গুতায় এখন পাখির কলতান নেই; আছে অস্ত্রের গর্জন, ভোমরা-মৌমাছির গুঞ্জরন নেই; আছে মযলুমের ক্রন্দন, সিরিয়ার বাতাসে আজ কাঁচা-পাকা ফলের ঘ্রাণ নেই; আছে তাজা-শুষ্ক রক্তের গন্ধ। প্রাচ্যের ভূস্বর্গ আজ পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের নরকে! (অনুবাদক)

[২৯৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/৩৮৬-৩৮৭।

[২৯৯] প্রাগুক্ত, ২/৪৮৭।

[৩০০] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা*, ২/২৩৯।

Scanned with CamScanner

তিনি 'ইবনুল কুরতুবী' নামে সমধিক পরিচিত। ৫৬৫ হিজরীর ২২ যিলকদ মোতাবেক ১১৬১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মালাগাতে তার জন্ম।[৩০১]

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ইলমের অধিকারী, ইলমুল কিরাআত, ইলমুল হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞগণের শায়খ, বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত, সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী, আসমাউর রিজাল, তাবাকাত ও তারীখ-শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ। জর্হ ও তা'দীল-শাস্ত্রে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন প্রিয়ভাষী, সচেতন, প্রদীপ্ত মেধাশক্তি ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী, শান্তশিষ্ট, বিনয়ী, সচ্চরিত্র, জনপ্রিয়, চলনে-বলনে পরিচ্ছন্ন, গাম্ভীর্যপূর্ণ, সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র, ধার্মিক, দুনিয়াবিরাগী, মুত্তাকী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাকরণবিদ ও প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক।[৩০২]

তার প্রিয় শিষ্য জাফর বিন যা'রূর বলেছেন, ফারা পাহাড়ের[৩০৩] ওপর অবস্থিত তার অতি ছোট কুটিরে আমি একরাত তার সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলাম অধ্যয়নের জন্য। আমি জেগে আছি, এরই মধ্যে হঠাৎ তিনি জেগে উঠলেন। তিনি তখন প্রফুল্লচিত্তে হাসছিলেন আর এমনভাবে হাত টেনে ধরছিলেন যেন মূল্যবান কিছু লাভ করেছেন। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন, আমি স্বপ্নে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, সব মানুষকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উপস্থিত করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণকে এক এক করে আহ্বান করা হচ্ছে। আমি দেখতে পেলাম আবু আবদুল্লাহ নুমাইরীকে উপস্থিত করা হল, তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড় করানো হল এবং জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতির পয়গাম প্রদান করা হল। এরপর আমাকে আহ্বান করা হল এবং আল্লাহ তাআ'লার দরবারে দাঁড় করানো হল। আমাকেও আল্লাহ তাআ'লা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতির ফরমান প্রদান করলেন। এতটুকু দেখার পর আমার ঘুম ভেঙে যায়। আনন্দের আতিশয্যে আমি আমার ফরমান ধরার জন্য হাত উঁচু করে

---

[৩০১] প্রাগুক্ত, ৩/৪০৮।

[৩০২] প্রাগুক্ত, ৩/৪০৫।

[৩০৩] মালাগা নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। দেখুন : লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ১/৫০৬ এর টিকা নং ৪।

Scanned with CamScanner

রেখেছিলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য।[৩০৪]

তিনি ইলমুল আ'রূয (কাব্যশাস্ত্র) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি কোরআনের ক্বেরাতে নাফে' সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, আসানিদে মুয়াত্তা-এর সংক্ষেপণ করেছেন এবং ইলমুল কিরাআত সম্পর্কেও কলম ধরেছেন। তার প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ হল- 'আলমুবদী লি খ্বাতাইর রুনদী' (المبدي لخطأ الرندي)।

ইবনুল কুরতুবী ৬১১ হিজরীর ৭ রবিউল আউয়াল মৃত্যুবরণ করেন।[৩০৫]

---

[৩০৪] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ৩/৪০৬-৪০৭।
[৩০৫] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ৩/৪০৮।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আন্দালুসের রাষ্ট্রসমূহের ধারাবাহিক পতন

ইকাব যুদ্ধ-পরবর্তী অব্যাহত ট্রাজেডি

আন্দালুসে ইসলামের এই ঘোরতর মুহূর্তে ক্যাস্টোলা-বাহিনী নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদে জড়িয়ে পড়ায় দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। (এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদের আরও মারাত্মক দুর্যোগ হতে রক্ষা করলেন।)[৩০৬]

ইকাব যুদ্ধের চার বছর পর ৬১৩ হিজরীতে (১২১৭ খৃস্টাব্দে) মাগরেবের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। তৎকালীন মুওয়াহহিদী শাসক মুসতানসির বিল্লাহ ছিলেন একেবারেই অল্পবয়সী। তার দুর্বল শাসনব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে যিনাতা গোত্র নতুন করে মাগরেব অঞ্চলে আন্দোলন শুরু করে এবং মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। তারা বনু মারীন রাষ্ট্র (Marinid dynasty) নামে একটি নতুন সুন্নী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আন্দালুসের ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৩০৭]

৬২৬ হিজরীতে ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জের সবচে' বড় ও সমৃদ্ধ দ্বীপ মিওরেকা (Palma de Mallorca)-এর পতন ঘটে। কিছুদিন পর আরেক দ্বীপ বিয়াসা (Ibiza)-ও মিওরেকার ভাগ্য বরণ করে। এটি ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জের সবচে' ছোট দ্বীপ। কেবল ম্যানোরকা (Menorca) নামক মধ্য দ্বীপটি মুসলমানদের দখলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও ছিল খৃস্টান রাষ্ট্রের বদান্যতায়, তাদের আনুগত্য স্বীকার করে।[৩০৮]

---

[৩০৬] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৬ ও জোসেফ আশবাচ, *তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন*, ২/২৫১।

[৩০৭] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৬/২৫১।

[৩০৮] অবশেষে ৬৮৬ হিজরীতে এ দ্বীপটিরও পতন ঘটে।

Scanned with CamScanner

পরের বছর ৬২৭ হিজরীতে বনু হাফ্স তিউনিসিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায়।[৩০৯]

এদিকে মুওয়াহহিদী শাসক মুসতানসির বিল্লাহর মৃত্যুর পর শুরু হয় ক্ষমতার প্রচণ্ড সংঘাত। মুসতানসির বিল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করেন তার পিতা আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-এর চাচা আবদুল ওয়াহিদ। কিন্তু একপর্যায়ে তিনি অপসারিত ও নিহত হন। এরপর শাসনভার গ্রহণ করেন আবদুল্লাহ আদিল। অব্যাহত থাকে ক্ষমতা ও সিংহাসন নিয়ে সংঘাত। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, প্রতি চার-পাঁচ বছর পরপরই নতুন শাসক ক্ষমতা গ্রহণ করেন, এরপর ক্ষমতাচ্যুত কিংবা নিহত হন। আসে নতুন আরেকজনের পালা। এভাবে চলতে চলতে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য উপনীত হয় অতল গহ্বরের প্রান্তসীমায়।

৬২৫ হিজরীতে (১২২৮ খৃস্টাব্দে) ইবনে হুদ নামক জনৈক ব্যক্তি পূর্ব ও দক্ষিণ আন্দালুসের স্বাধিকার দাবি করে। ঐতিহাসিকগণ তাকে একজন চরম গণ্ডমূর্খ ও অবিবেচক বলে চিহ্নিত করেছেন। খৃস্টানদের মোকাবেলায় কেউ তাকে সামান্য সহযোগিতাও করেনি।[৩১০]

৬৩৩ হিজরীতে (১২৩৬ খৃস্টাব্দে) সংঘটিত হয় এক ভীতিপ্রদ ও চরম বেদনাদায়ক ঘটনা। পতন ঘটে ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক নগরী কর্ডোভার।[৩১১]

গভীর বেদনাদায়ক ট্রাজেডি ... কর্ডোভার পতন

এই মর্মবিধুর ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা অনুতাপ ও আফসোস ছাড়া আর কী-ইবা করতে পারি। খৃস্টান বাহিনী কর্তৃক দীর্ঘ কয়েকমাস কর্ডোভা অবরোধ করে রাখা হয়। অসহায় কর্ডোভাবাসী এ সময় বনু হুদের সহায়তা কামনা করে, যারা দক্ষিণ-পূর্ব আন্দালুসে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে কী, নিজেরাই তখন আপন রাষ্ট্ররক্ষায় ব্যতিব্যস্ত বনু আহমারের সঙ্গে লড়াইয়ে। বনু আহমার আরেক গোত্র, যারা আন্দালুসের অন্য একটি অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করেছিল। সবদিক

---

[৩০৯] আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ২/২৪০।

[৩১০] দেখুন : ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ :২৭৮, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২১৫, ৪/৪৬৪।

[৩১১] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬৯, হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৪৫৯ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৪৪৮।

Scanned with CamScanner

থেকে যখন এই নিরাশার পরিস্থিতি, ৬৩৩ হিজরীতে (১২৩৬ খৃস্টাব্দে) পতন ঘটে কর্ডোভার। পতন ঘটে আন্দালুসের প্রধান ইসলামী নগরীর।

কর্ডোভাবাসী আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং কর্ডোভা ছেড়ে চলে যেতে থাকে। এ সময় খৃস্টান পাদ্রীদের আচরণ ছিল বড় নির্দয় ও অমানবিক। তারা খৃস্টান সৈন্যদের প্ররোচিত করছিল সবাইকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ক্যাস্টোলা-শাসক তৃতীয় ফার্ডিনান্ড এই আশঙ্কায় তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, তাহলে হয়তো কর্ডোভাবাসী এই ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ নগরীর যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ ও নিদর্শনাবলি ধ্বংস করে ফেলবে। কর্ডোভাবাসী সকলে শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কর্ডোভা ছেড়ে তারা রওয়ানা হয় দক্ষিণে নতুন কোন আশ্রয়ের খোঁজে। পেছনে ফেলে রেখে যায় সভ্যতার আলোকমিনার, গৌরব ও ঐতিহ্য, মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত আরও অনেক কিছু।[৩১২]

যে কর্ডোভা বিশ্বকে দান করেছে কল্যাণ ও বরকতের বারিধারা, ইলম ও জ্ঞানের আলোকচ্ছটা– আজ তার পতন হল। তিন হাজার মসজিদ, তের হাজার গৃহ-সমৃদ্ধ কর্ডোভার পতন হল। পতন ঘটল পাঁচ শ' বছরেরও অধিক সময়ের ইসলামী খেলাফতের রাজধানীর। পতন ঘটল বিশ্বের সবচে' বড় সবচে' আলীশান মসজিদের নগরী কর্ডোভার। পতন ঘটল জাওহারাতুল আলম ও পৃথিবীর রত্নখণ্ডের।[৩১৩]

৬৩৩ হিজরীর শাওয়াল মাসের ২৩ তারিখে কর্ডোভার পতন হল। আর যেদিন কর্ডোভার পতন ঘটল, সেদিনই কর্ডোভা মসজিদ রূপান্তরিত হল গির্জায়। কর্ডোভা মসজিদ আজও পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ আবিদের সিজদা-চিহ্ন বুকে ধারণ করে, আরেকবার আল্লাহু আকবারের সুমধুর ধ্বনি শ্রবণের আশায়।

একের পর এক মর্মন্তুদ ঘটনা ... অব্যাহত ট্রাজেডি

কর্ডোভা পতনের পর ৬৩৫ হিজরীতে (১২৩৭ খৃস্টাব্দে) ইবনে হুদের মৃত্যু হলে বনু আহমার গ্রানাডায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলে। আন্দালুসের পরবর্তী

---

[৩১২] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৬/৪২৪।

[৩১৩] প্রিয় পাঠক! একটু পেছনে ফিরে আরেকবার পাঠ করে নিন পঞ্চম অধ্যায়ের 'পৃথিবীর রত্নখণ্ড কর্ডোভা নগরী' শিরোনামের পরিচ্ছেদটি এবং আবারও স্মরণ করুন কী ছিল কর্ডোভা?!

Scanned with CamScanner

ঘটনাপ্রবাহে এই বনু আহমারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আমরা সামনে আলোচনা করব। ৬৩৬ হিজরীতে (১২৩৭ খৃস্টাব্দে) গ্রানাডায় বনু আহমারের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের একবছর পর পতন ঘটে ভ্যালেন্সিয়ার। ফ্রান্সের সহায়তায় একটানা পাঁচ বছর অবরোধ করে রাখার পর অ্যারাজোনা-শাসক ভ্যালেন্সিয়া দখল করে নেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের এই অবরোধে ভ্যালেন্সিয়ার বহু মুসলমান ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয় বেশ কয়েকটি যুদ্ধ, যার মধ্যে সবচে' বিখ্যাত হল ৬৩৪ হিজরীর আনিশা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বহু আলিম-ওলামাসহ অনেক মুসলমান শহীদ হয়।

তিউনিসিয়ার বনু হাফ্স গোষ্ঠী অস্ত্র ও রসদসামগ্রী প্রেরণের মাধ্যমে ভ্যালেন্সিয়াবাসীকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অবরোধের তীব্রতার কারণে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ৬৩৬ হিজরীতে (১২৩৯ খৃস্টাব্দে) নগরবাসী শহরের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বিতাড়িত পঞ্চাশ হাজার মুসলমান আশ্রয় নেয় তিউনিসিয়ায়। কালবিলম্ব না করে এ শহরেও মুসলমানদের সবগুলো মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। এটি প্রতিটি মুসলিম দেশে খৃস্টান অপশক্তির সর্বকালে অনুসৃত সুপ্রসিদ্ধ একটি নীতি; যেখানেই তারা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানেই গণ হত্যাযজ্ঞ কিংবা বিতাড়ন-নীতি প্রয়োগ করেছে; আর অনিবার্য নীতি মেনে মসজিদসমূহকে গির্জায় রূপান্তরিত করেছে।[৩১৪]

৬৪১ হিজরীতে (১২৪৩ খৃস্টাব্দে) ভ্যালেন্সিয়ার নিকটবর্তী দানিয়ার পতন ঘটে।[৩১৫] ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫ খৃস্টাব্দে) পতন ঘটে জাইয়ান নগরীর।[৩১৬] ফলে এই কয়েক বছর পূর্বের সুবিশাল মুসলিম আন্দালুস সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে মাত্র দু'টি প্রদেশে- আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে গ্রানাডা প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সেভিল প্রদেশ। এই দুই প্রদেশের মোট আয়তন ছিল মুসলিম আন্দালুসের মোট আয়তনের এক-চতুর্থাংশ।[৩১৭]

পাশাপাশি এ তথ্যটিও মনে রাখতে হবে যে, আফ্রিকার প্রতিটি অংশ ততদিনে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে সুবিশাল সুবিস্তৃত প্রতাপশালী মুওয়াহহিদী রাষ্ট্র বলতে গেলে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

---

[৩১৪] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৭৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৪৬০।

[৩১৫] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ৬১।

[৩১৬] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৬/৪৬৮।

[৩১৭] দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২০৬।

Scanned with CamScanner

সপ্তম পরিচ্ছেদ
মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন

একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

অনেক পাঠকই এত আকস্মিক ও দ্রুতগতিতে সুবিশাল এই রাষ্ট্রকাঠামোর ভীতিপ্রদ পতনের ঘটনা পাঠ করে বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে যান এবং এই আকস্মিকতার কারণ ও কার্যকারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হন। বাস্তব কথা হল, এই পতন মোটেই আকস্মিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুওয়াহহিদী রাষ্ট্র তার দেহ-অভ্যন্তরেই দুর্বলতার প্রচুর বীজ ও পতনের প্রভূত কার্যকারণ ধারণ করে ছিল। কারণ ছিল অনেক। তার কয়েকটি হল,

১. মুরাবিতী প্রশাসনের সঙ্গে চরম অন্যায় আচরণ এবং কোন বিচারেই হত্যার উপযুক্ত নয়, এমন হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যাকরণ। আর জগতের শাশ্বত নীতি হল, রক্তের পথ কখনোই ন্যায়ের ফল প্রদান করতে পারে না। ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন,

> ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র যদি কাফির কর্তৃক পরিচালিতও হয়, আল্লাহ তাকে স্থায়িত্ব দান করেন; আর জালিম শাসনব্যবস্থা যদি মুসলমান কর্তৃক পরিচালিতও হয়, আল্লাহ তাকে স্থায়িত্ব দান করেন না।[৩১৮]

জুলুমের পরিণাম বড়ই ক্ষতিকর ও অশুভ। জুলুমের শাস্তি আসতে দেরী হতে পারে; কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তা জালিমের ওপর আপতিত হবে। জালিমকে আল্লাহ তাআ'লা ছাড় দেন; কিন্তু ছেড়ে দেন না। মুওয়াহহিদী গোষ্ঠী তাদের বিরোধী মুসলমানদের প্রাণহরণে সামান্য দ্বিধা করেনি। শুধু প্রতিপক্ষই নয়, তাদের অনুসারীদের মধ্য থেকেও যাদের আনুগত্য সম্পর্কে

---

[৩১৮] ইবনে তাইমিয়া, *মাজমূউ'ল ফাতাওয়া*, ২৮/১৪৬।

Scanned with CamScanner

সামান্য সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করতেও তাদের হাত সামান্য কাঁপেনি। বুহাইরা যুদ্ধের পূর্বে ইবনে তুমার্‌ত কর্তৃক পরিশুদ্ধি অভিযানের নামে হাজার হাজার অনুসারীকে হত্যা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এক দুষ্ট খবীসের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তিনি এসব মানুষকে জাহান্নামী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাদের পরিজনের মাধ্যমে তাদের হত্যা করিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদের এই অপরাধের ত্বরিত শাস্তি দিয়েছিলেন বুহাইরা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে, যেখানে মুওয়াহহিদী পক্ষের বহু যোদ্ধা নিহত হয়েছিল।

এটি অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণ, পারস্পরিক বিরোধিতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লড়াই-বিবাদ ও ঘৃণা-শত্রুতা পোষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. আপন সনদে আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُه وَلَا يَخْذُلُه، وَلَا يَحْقِرُه، التَّقْوٰى هٰهُنَا»

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না, কেউ দামাদামি করা অবস্থায় আগে বেড়ে সে পণ্যের দাম বলো না। বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। (তাই) সে তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করবে না, তার বিপদে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে যাবে না এবং তাকে তুচ্ছ ও অপদস্থ করবে না। তাকওয়া তো এখানে।

'তাকওয়া তো এখানে'– এ কথা বলার সময় নবীজী আপন বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেন। এরপর ইরশাদ করেন,

«بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُه، وَمَالُه، وَعِرْضُه»

Scanned with CamScanner

কোন মুসলিম কর্তৃক তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করা অকল্যাণের জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সবকিছু হারাম।[৩১৯]

২. সেসব ভ্রান্ত-বাতিল বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, যা ইবনে তুমার্‌ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র আদর্শ ও বিশ্বাসের মাঝে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। যদিও মুওয়াহহিদী শাসক আলমামুন পরবর্তীতে এগুলোর বিরোধিতা ও বাতিল ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু প্রবীণ ও বিশিষ্ট মুওয়াহহিদী নেতৃবৃন্দ শেষ যুগ পর্যন্ত ইবনে তুমার্‌তের নিষ্পাপত্ব ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে ছিল। আর তাই আলমামুনের এই সংস্কার-প্রচেষ্টা ছিল আকীদাগত দিক থেকে জীর্ণ ও জরাজীর্ণ একটি বস্ত্র জোড়া-তালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা মাত্র।

মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যে আরও একটি ভ্রান্ত মতাদর্শ লালন করা হত, যার ভয়াবহতা কোন অংশেই কম নয়। আর তা হল মুরাবিতীদের কাফির বলে গণ্য করা। ইবনে তুমার্‌ত এই ভ্রান্ত মতাদর্শকে পুঁজি করে মুরাবিতীদের হত্যা করা, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, মুরাবিতী নারীদের দাসী বানানো, তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং মুরাবিতী সাম্রাজ্যের আমূল ধ্বংসসাধন– এ সবকিছুকে বৈধতা প্রদান করেছিলেন।

কোন মুসলমানকে কাফির ঘোষণা করা অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ। বিবেকসম্পন্ন কোন মুসলমান কখনো কোন অবস্থাতেই এরূপ কাজ করতে পারে না। ইমাম বুখারী রহ. আপন সনদে আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِه أَحَدُهُمَا»

যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে 'হে কাফির' বলে ডাকে, তখন তা তাদের দু'জনের কোন একজনের ওপর বর্তায়।[৩২০]

অপরদিকে ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন,

«أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»

---

[৩১৯] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৬৪।

[৩২০] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬১০৩।

Scanned with CamScanner

যে কেউ তার (মুসলিম) ভাইকে 'হে কাফির' বলে ডাকবে, তা তাদের দু'জনের কোন একজনের ওপর বর্তাবে। সে যাকে বলেছে, যদি সে সত্য সত্যই কাফির হয়ে থাকে, তাহলে তো ঠিকই বলেছে। অন্যথায় (কুফরী) তার (অর্থাৎ বক্তার) নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।[৩২১]

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ গাযালী রহ. লিখেছেন,

মুসলমানের কর্তব্য হল যথাসম্ভব (সামান্য সংশয় বা পরিহারের সুযোগ থাকলেই) তাকফীর (কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা) থেকে বিরত থাকা। কেননা, ইসলামের কিবলাকে বিশ্বাসকারী, কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায়কারী, কালিমায়ে তাইয়্যিবার স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন ব্যক্তির জান-মালের নিরাপত্তা উন্মুক্ত করে দেওয়া চরম অপরাধ। একজন মুসলমানের সামান্য এক শিশি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করার অপরাধের চেয়ে হাজার কাফিরকে প্রাণে ছেড়ে দেওয়ার অপরাধও অনেক তুচ্ছ।[৩২২]

হাফিয ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন,

যার ঈমান (একবার) অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সংশয়-সন্দেহের কারণে তার ঈমান বাতিল হবে না। বরং সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ এবং সংশয় নিবারণ ব্যতিরেকে কখনোই একজন মুসলমানকে তাকফীর করার সুযোগ নেই।[৩২৩]

৩. মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের পতনের আরেকটি কার্যকারণ ছিল, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বনু গানিয়ার বিদ্রোহ, ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জে সংঘটিত বিদ্রোহ ও তিউনিসিয়ায় সংঘটিত বিদ্রোহ।

৪. একদিকে খৃস্টান বাহিনীর উন্নত সামরিক প্রস্তুতি অপরদিকে আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ও তার পরবর্তী শাসকবর্গের পক্ষ থেকে সামরিক প্রস্তুতিতে সুচিন্তার ঘাটতি।

৫. এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক একটি বিষয়। আর তা হল মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সামনে পার্থিব উন্মুক্ততা ও সম্পদের প্রাচুর্য। এ

---

[৩২১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬০।
[৩২২] আবু হামিদ গাযালী, *আলইকৃতিসাদ ফিল ই'তিকাদ*, পৃ : ১৫৭।
[৩২৩] ইবনে তাইমিয়া, *আলফাতাওয়া*, ১২/৪৬৬।

Scanned with CamScanner

বিষয়টি তাদেরকে প্রচণ্ড বিলাসী ও শৌখিন করে তোলে এবং সম্পদের মোহই তাদেরকে ক্ষমতা নিয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে প্ররোচিত করে।

৬. আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ-এর শাসনামলে আবু সাঈদ বিন জামে' এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দুষ্ট ও অসৎ-চরিত্র ব্যক্তিদের প্রশাসনে উপস্থিতি।

ডক্টর শাওকী আবু খলীল এ বিষয়ে লিখেছেন,

> আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ছিলেন তার উযীর ইবনে জামে'-এর হাতের পুতুল। এ লোকটি কেবল ইকাব যুদ্ধের পরাজয়ের জন্যই দায়ী নয়; বরং আননাসির-পরবর্তী সময়ে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সুকরুণ পরিণতির জন্যও সে দায়ী। ইবনে জামে' এমন কিছু কার্যকারণ সৃষ্টি করে গিয়েছিল, যেগুলো পরবর্তী সময়ে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যকে তার শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে ভূমিকা রেখেছিল।
>
> ইবনে জামে'-এর পরিবারের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে উযীরের পদ লাভ করেছিল, যাদের মধ্যে সবচে' শীর্ষ পদে ছিল আবু সাঈদ বিন জামে'। এই পরিবারটি যাযাবর বেদুঈনদের সহায়তায় মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পেছনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। খলীফার দুষ্ট সঙ্গী উযীর ইবনে জামে' মুওয়াহহিদী প্রশাসনে এমন কিছু পরিবর্তন এনেছিল, যা কেবল রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-নীতিতেই নয়; বরং মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের পতনের ক্ষেত্রেও বিশাল ভূমিকা রেখেছে।[৩২৪]

৭. আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ ও তার পরবর্তী সকল আমীরগণের পরামর্শব্যবস্থা উপেক্ষাকরণ। এটি ছিল কোরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা-বিরোধী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যাবতীয় কাজ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করার তাকিদ দিয়েছেন। এক আয়াতে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

> এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে থাক। [সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯]

---

[৩২৪] শাওকী আবু খলীল, *আলই'কাব*, পৃ : ৫৯-৬০।

Scanned with CamScanner

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (সৎকর্মে) ব্যয় করে । [সূরা শূরা : ৩৮]

হাফিয ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

(আয়াতের দাবি হল,) মুমিন ব্যক্তিগণ পারস্পরিক পরামর্শ ব্যতিরেকে কখনো কোন কাজ সম্পাদন করবে না; যেন তারা যুদ্ধ বা এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরস্পরের মতামতের মাধ্যমে সহায়তা লাভ করতে পারে ।[৩২৫]

মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ন্যায় সুবিশাল রাষ্ট্রের পতনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণসমূহ এবং অন্যান্য আরও বিভিন্ন কারণ সমবেত হয়েছিল । এসব কার্যকারণের প্রভাব ও ক্রিয়া এত গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এ বিশাল সাম্রাজ্যের পতনই শুধু ঘটেনি; বরং এতদঅঞ্চলে ইসলামের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল এবং ইসলামী ভূখণ্ড গ্রানাডা ও সেভিল– এই দুই প্রদেশে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিশাল ধাক্কার পরও, অতি অল্প সময়ে ইসলামের পরিসর এভাবে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার পরও এবং মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের এই ভীতিপ্রদ পতনের পরও আন্দালুসের মাটিতে ইসলামের অস্তিত্ব টিকে ছিল পরবর্তী আড়াই শ' বছরেরও বেশি ।

প্রিয় পাঠক! এককালের প্রতাপশালী সাম্রাজ্য মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের আলোচনা এখানেই শেষ । শেষ করার পূর্বে আসুন একবার চোখ বুলিয়ে নিই মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সকল শাসকের নাম ও শাসনকালের এই তালিকাটির দিকে ।

---

[৩২৫] ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম*, ৭/২২১ ।

Scanned with CamScanner

ক্রম	নাম	শাসনকাল	
		হিজরী	ঈসায়ী
০১	আবদুল মুমিন বিন আলী	৫২৪-৫৫৮	১১২৯-১১৬৩
০২	আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন	৫৫৮-৫৮০	১১৬৩-১১৮৪
০৩	আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইউসুফ আলমানসুর	৫৮০-৫৯৫	১১৮৪-১১৯৯
০৪	আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আননাসির	৫৯৫-৬১০	১১৯৯-১২১৩
০৫	আবু ইয়াকুব ইউসুফ আলমুসতানসির	৬১১-৬২০	১২১৩-১২২৪
০৬	আবদুল ওয়াহিদ বিন ইউসুফ বিন আবদুল মুমিন	৬২০-৬২১	১২২৪
০৭	আবু আবদুল্লাহ বিন ইয়াকুব আলমানসুর (আদিল)	৬২১-৬২৪	১২২৪-১২২৭
০৮	ইয়াহইয়া বিন আননাসির	৬২৪-৬২৭	১২২৭-১২৩০
০৯	আলমামুন বিন আলমানসুর	৬২৭-৬৩০	১২৩১-১২৩২
১০	রাশীদ বিন আলমামুন বিন আলমানসুর	৬৩০-৬৪০	১২৩২-১২৪২
১১	সাঈদ আলী আবুল হাসান	৬৪০-৬৪৬	১২৪২-১২৪৮
১২	আবু হাফ্স ওমর আলমুরতাযা	৬৪৬-৬৬৫	১২৪৮-১২৬৬
১৩	আবু দাবূস আলওয়াসিক বিল্লাহ	৬৬৫-৬৬৮	১২৬৬-১২৬৯

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নবম অধ্যায়
আন্দালুসের পতন ও গ্রানাডা রাষ্ট্র

প্রথম পরিচ্ছেদ	গ্রানাডা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বনু মারীন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী আন্দালুসে বিজয়াভিযানের পুনঃসূচনা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	পতনের সঙ্গে সংগ্রাম
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	গ্রানাডা-অভ্যন্তরে সংঘাত
সপ্তম পরিচ্ছেদ	গ্রানাডা পতনের পূর্বে প্রতিরোধ-তৎপরতা
অষ্টম পরিচ্ছেদ	গ্রানাডার পতন
নবম পরিচ্ছেদ	গ্রানাডার পতনের পর আন্দালুসী মুসলমানদের পরিণতি
দশম পরিচ্ছেদ	সমকালীন গ্রানাডার যুগসচেতন কয়েকজন আলিমের কথা

Scanned with CamScanner

ইকাব যুদ্ধের পরপরই মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। একে একে পতন ঘটতে থাকে মুসলিম নগরীগুলোর। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ও সুদীর্ঘকালের খেলাফতের রাজধানী কর্ডোভার পতন হয়। পতন হয় জাইয়ান নগরীর ৬৪৩ হিজরীতে (১২৪৫ খৃস্টাব্দে)।

মুসলিম আন্দালুসে টিকে থাকে তুলনামূলক বড় দু'টি প্রদেশ। এর একটি হল গ্রানাডা, যার অবস্থান আন্দালুস উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং যার আয়তন পুরো আন্দালুসের প্রায় ১৫%, আরেকটি হল সেভিল প্রদেশ; যা উপদ্বীপের আরেক প্রান্তে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত এবং যার আয়তন আন্দালুসের মোট ভূমির ১০%।

সুবিশাল মুসলিম আন্দালুসে মাত্র এ দু'টি অংশ ইকাব যুদ্ধ-পরবর্তী ঝড়ের ধাক্কা সামলে টিকে থাকে। পূর্বেও বলে এসেছি, বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই সুকঠিন পরিস্থিতি, কর্ডোভার পতন এবং এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেও আন্দালুসে ইসলামী শাসনব্যবস্থা টিকে ছিল এরপরও প্রায় আড়াই শ' বছর। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি বড় কিছু প্রশ্নবোধক চিহ্নের অবতারণা করে। আর তাই ইতিহাসের এ অধ্যায়টুকুও কিছুটা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
গ্রানাডা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

ইবনুল আহমার ও ক্যাস্টোলা-নৃপতি চরম লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর এক চুক্তি

এই কঠিন সংকটপূর্ণ সময়েও আন্দালুস জাতির সন্তানদের পারস্পরিক মতবিরোধ এত চরম পর্যায়ের ছিল যে, এর কারণে তারা নিজেদের পবিত্র নীতি ও আদর্শ, বিবেক-বিবেচনাবোধ সবই উৎসর্গ করেছিল। নিকৃষ্ট ব্যক্তিস্বার্থ ও লালসার সামনে জাতীয় ও ধর্মীয় সম্পর্ক এবং জাতীয়-ধর্মীয় যৌথ অস্তিত্বের দাবি- সবই হারিয়ে গিয়েছিল। তাই তো যে বছর মুসলিম-খৃস্টান এক অসম যুদ্ধের পর জাইয়ানের পতন হয়, সেই ৬৪৩ হিজরীতেই খৃস্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টোলা এবং মুসলিম প্রদেশ গ্রানাডার অধিকার এবং দায়িত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্যাস্টোলা-নৃপতি তৃতীয় ফার্ডিনান্ড গ্রানাডা প্রদেশের শাসনক্ষমতার দাবিদার ইবনুল আহমারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তিতে গ্রানাডা রাষ্ট্রকে কিছু অধিকার প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়, তাদের ওপর কিছু শর্তও আরোপ করা হয়।[৩২৬]

এই সমঝোতা চুক্তির ধারাসমূহ আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে আমরা চুক্তিটির এক পক্ষ ইবনুল আহমারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিই। তার পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন নাস্‌র। তার বংশধারা বিশিষ্ট সাহাবী সা'দ বিন উবাদা আলখাযরাজী রাযি.-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৩২৭] কিন্তু হায়! কত পার্থক্য পরম্পরার দু' প্রান্ত তথা সেই সা'দ বিন উবাদা খাযরাজী রাযি. ও এই মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন নাসর ইবনুল আহমার - এর মধ্যে!

---

[৩২৬] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪১-৪২।

[৩২৭] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা*, ২/৯২।

Scanned with CamScanner

তিনি ইবনুল আহমার নামে খ্যাতি লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি তার মূল নাম নয়; মূলত এটি তার এবং তার সেসব বংশধরগণের উপাধি, যারা পরবর্তী সময়ে গ্রানাডা শাসন করেছেন।

ক্যাস্টোলা-নৃপতি ও মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন নাস্‌র ইবনুল আহমারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির কয়েকটি ধারা হল,

১. ইবনুল আহমার ক্যাস্টোলা-নৃপতিকে নিয়মিত কর প্রদান করবেন। করের পরিমাণ বার্ষিক দেড় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।[৩২৮] কর-প্রদানের এ শর্তটি ছিল তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর দুরবস্থার প্রতীক এবং প্রবল পরাক্রান্ত মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ভাগ্য-তারকা অধোগমন-পরবর্তী দ্রুত ও ব্যাপক বিধ্বস্ততা ও পতনের পরিমাণ নির্ণায়ক। এ দুরবস্থা তখন ছেয়ে গিয়েছিল আন্দালুস ও আফ্রিকার অনেক প্রান্তেই।

২. ক্যাস্টোলা সাম্রাজ্যের অধীনস্থ আমীর হিসেবে ইবনুল আহমারকে নিয়মিত ক্যাস্টোলার বিধানসভার সভায় উপস্থিত হতে হবে।[৩২৯]

এ শর্তের মাধ্যমে মূলত পরোক্ষভাবে গ্রানাডাকে ক্যাস্টোলার অঙ্গরাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩. ইবনুল আহমার সুস্পষ্টভাবে ক্যাস্টোলা-সম্রাটের নামে গ্রানাডা শাসন করবেন।[৩৩০]

এ ধারার মাধ্যমে গ্রানাডাকে ক্যাস্টোলার অঙ্গরাষ্ট্র সাব্যস্ত করার বিষয়টি পূর্ণ ও নিশ্চিত করা হয়।

৪. সবশেষে পতন হওয়া নগরী জাইয়ানের বাকি দুর্গগুলোসহ অ্যারাজোনা, আলগার পর্যন্ত জাযিরাতুল খাযরা-এর সকল দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ক্যাস্টোলার হাতে তুলে দিতে হবে।[৩৩১]

এ ধারা মেনে নিয়ে ইবনুল আহমার ক্যাস্টোলা-নৃপতি তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের

---

[৩২৮] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪২।

[৩২৯] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪৩।
এখানে এ তথ্যটিও উল্লেখ করা সঙ্গত হবে যে, তৎকালেও খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। এর মাধ্যমে জমিদার ও জায়গীরদার আমীরগণ আপন আপন অধিকৃত ভূমিতে স্বাধীন অধিকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করত। তাদের দায়িত্ব ছিল ফল-ফসল ও কর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সহায়তা করা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সময় নিজেদের সম্পদ ও শক্তি দিয়ে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করা।

[৩৩০] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪২।

[৩৩১] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ৬৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯০।

Scanned with CamScanner

হাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ সব স্থান তুলে দেন, যা গ্রানাডাকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে।

৫. চুক্তির এ ধারাটি ছিল সবচে' আত্মঘাতী। আর তা হল, ইবনুল আহমার ক্যাস্টোলা-শাসককে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে প্রয়োজন পড়লেই সহায়তা করবেন। অর্থাৎ ক্যাস্টোলা-নৃপতি যখন যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করুন না কেন, ইবনুল আহমার তার সঙ্গে যুদ্ধে শরীক থাকবেন।[৩৩২]

অবক্ষয় ... অধঃপতন ... এবং অবশেষে সেভিলের পতন

ইবনুল আহমার পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে চুক্তির যাবতীয় শর্ত পালন করে যেতে লাগলেন এবং সেভিলের পতনের ক্ষেত্রে তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সবচে' বড় সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করলেন। তখন সেভিলই ছিল পুরো আন্দালুসের সবচে' বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। সেভিল ছিল পুরো মুসলিম আন্দালুসের বিবেচনায় কর্ডোভার পর দ্বিতীয় প্রধান নগরী। সেভিলই ছিল বিভক্ত শাসকবর্গের আমলের পরাক্রমশালী শাসকগোষ্ঠী বনু আব্বাদের রাজধানী।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মাদ ইবনুল আহমারের সহায়তা নিয়ে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড প্রথমে সেভিল রাষ্ট্রের সম্মুখ অঞ্চলের দুর্গ কারামোনা নগরী দখল করলেন। এরপর তিনি সেভিলের নিকটবর্তী অন্যান্য দুর্গগুলোও জয় করার মনস্থ করলেন। যথারীতি ইবনুল আহমার বিশ্বস্ততার অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গেলেন। তিনি উপদেশ, পরামর্শ, হুমকি-ধমকি ও অযাচিত হস্তক্ষেপ– বিভিন্ন মাধ্যমে এসব দুর্গের অধিকারীদেরকে ক্যাস্টোলা-শাসকের কাছে আপন আপন দুর্গ সমর্পণে রাজী করাতে সক্ষম হলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ও দুর্গের নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করলে ক্যাস্টোলা-নৃপতি মুসলমানদের রক্তপাত থেকে বিরত থাকবেন এবং তাদের ওপর তুলনামূলক সহজতর শর্ত আরোপ করবেন।

৬৪৫ হিজরী (১২৪৭ খৃস্টাব্দ) শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্যাস্টোলার শাসক সেভিলের সম্মুখবর্তী সবগুলো দুর্গ দখল করে নিলেন এবং পুরো ভূখণ্ড ও ফসলের ভূমিতে প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ চালালেন। এরপর ৬৪৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (১২৪৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে) খৃস্টান বাহিনী সেভিল অবরোধ করল।[৩৩৩]

---

[৩৩২] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪২।

[৩৩৩] প্রাগুক্ত, ৭/৪৩-৪৪।

Scanned with CamScanner

অবমাননাকর আনুগত্য, ইসলাম ও শরীয়তে ইসলামীর চরম লঙ্ঘন, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাহায্য-নীতিকে তুচ্ছজ্ঞান এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টান ও ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ইবনুল আহমার ক্যাস্টোলা-সম্রাটের আনুগত্য করে যেতে লাগলেন। তিনি তার পুরো অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ক্যাস্টোলা বাহিনীর সঙ্গে রওয়ানা হলেন সেভিলের চারপাশে দীর্ঘ ও কঠিন অবরোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে।

ক্যাস্টোলা-গ্রানাডা মিত্র বাহিনী (!) ইসলামী নগরী সেভিল অবরোধ করল। এক মাস, দু' মাস নয়; দীর্ঘ সতের মাসের অবরোধ। এ দীর্ঘ সময়ে সেভিলবাসী আশেপাশের সবার কাছে সাহায্য কামনা করল। কিন্তু বধির যারা, তারা কি শুনবে কারও আর্তচিৎকার?! কবির ভাষায়:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلٰكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِيْ

وَلَوْ نَارٌ نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلٰكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِيْ رَمَادٍ

যদি তুমি কোন জীবিত ব্যক্তিকে আহ্বান করতে, অবশ্যই তাকে শোনাতে পারতে; কিন্তু তুমি যাকে আহ্বান করছ, তার মাঝে তো প্রাণের স্পন্দনই নেই!

যদি আগুনে ফুঁক দিতে, চারপাশ এতক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠত; কিন্তু নিষ্ফল ফুঁক দিয়েই যাচ্ছ স্তূপ ছাইয়ের মাঝে![৩৩৪]

আটলান্টিকের ওপারের মাগরেব তখন ব্যস্ত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সংঘাতে, শাসকগোষ্ঠী বনু মারীন ব্যস্ত মাগরেবের অভ্যন্তরে মুওয়াহহিদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, আর আটলান্টিকের এপারের একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডা ব্যস্ত ...! ও হ্যাঁ, গ্রানাডা তো ব্যস্ত সেভিল অবরোধে। সুতরাং কে এগিয়ে আসবে সেভিলের সহায়তায়?!

কঠিন এ অবরোধ শুরুর দীর্ঘ সতের মাস পর ৬৪৬ হিজরীর রমযান মাসের ২৭ তারিখে (১২৪৮ খৃস্টাব্দে) মুসলমানদের হাতে এবং খৃস্টানদের জন্য মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইসলামী রাষ্ট্র সেভিলের পতন হল!

পতন হল গৌরবময় ইতিহাস ও সুমহান সভ্যতা-সমৃদ্ধ এক নগরীর!

পতন হল দক্ষিণ আন্দালুসের সবচে' বড় সীমান্তশহরের!

পতন হল মুসলিম আন্দালুসের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীর!

পতন হল আন্দালুসের দুর্ভেদ্যতম দুর্গের!

---

[৩৩৪] আমর বিন মা'দিকারিব আযযুবাইদী-এর কাব্যসংকলন থেকে গৃহীত, পৃ : ১১৩।

Scanned with CamScanner

সেভিলের পতন হল। সেভিলবাসী সেভিল ত্যাগ করল; বরং বলা ভালো, ত্যাগ করতে বাধ্য হল। চার লক্ষ মুসলমানকে সেভিল থেকে বিতাড়িত ও গৃহহীন করা হল।

হায় আফসোস! হায় মুসলিম জাতি! মুসলমানের দুর্গ বিজিত হচ্ছে, মুসলমানের শক্তি বিনাশ হচ্ছে মুসলমানের হাতে![৩৩৫] তাই তো কবির ব্যথাভরা আক্ষেপ,

وَمَا فَتِئَ الزَّمَانُ يَدُوْرُ حَتّٰى ... مَضٰى بِالْمَجْدِ قَوْمٌ آخَرُوْنَا

وَأَصْبَحَ لَا يُرٰى فِي الرَّكْبِ قَوْمِيْ ... وَقَدْ عَاشُوْا أَئِمَّتَهُ سِنِيْنَا

وَآلَمَنِيْ وَآلَمَ كُلَّ حُرٍّ ... سُؤَالُ الدَّهْرِ: أَيْنَ الْمُسْلِمُوْنَا؟

কালের পরিভ্রমণ এখনও আছে অব্যাহত; এদিকে গৌরব ও মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অন্য জাতি,

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, (নেতৃত্বের) কাফেলায় দেখা মেলে না স্বজাতির কাউকে; অথচ তারাই তো বছরের পর বছর কাটিয়েছে কাফেলার নেতৃত্বে।

আজ আমাকে বরং প্রতিটি স্বাধীন মানুষকে পীড়া দেয় কালের এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন– কোথায় ...? কোথায় মুসলমান?[৩৩৬]

কোথায় মুসলমান? মুসলমান ব্যস্ত মুসলমানদের অবরোধে! মুসলমান শশব্যস্ত মুসলিম নিধনে! মুসলমান ব্যতিব্যস্ত মুসলমানদের বিতাড়নে! হায় ইতিহাস! কত সাদৃশ্য অতীত ও বর্তমানে!

ইসলামী মানচিত্রের পাতা থেকে সেভিল এভাবেই হারিয়ে গেল কিংবা মুখ লুকাল চরম লজ্জায় ইসলামের সন্তানদের অধঃপতনে!

ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক আরিক বিজয়ের অমর স্মারক সেভিল মসজিদ আজও দাঁড়িয়ে আছে সেভিলের বুকে!

দাঁড়িয়ে আছে ক্লান্ত দেহে, বুকভরা ব্যথা নিয়ে!

দাঁড়িয়ে আছে গির্জার পরিচয় ধারণ করে ক্রুশচিহ্ন বুকে এঁকে!

---

[৩৩৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ৩৮৪, ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ৭৩ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৭১।

[৩৩৬] *দিওয়ানে হিশাম আররিফায়ী*, পৃ : ৩৮৩।

Scanned with CamScanner

ইসলামের বৃহত্তর সীমান্তনগরী সেভিল কতদিন শ্রবণ করেনি আজানের ধ্বনি! কতদিন শোনেনি অশ্বখুঁড়ের প্রতিধ্বনি!

সেভিল প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে একটি সিজদাচিহ্নের এবং ঈসা মাসীহের নিষ্ঠুর অবমাননা বন্ধের!

ক্যাস্টোলা-নৃপতির কেন এই গ্রানাডা-প্রীতি?!

৬৪৬ হিজরীতে (১২৪৮ খৃস্টাব্দে) সেভিল পতনের সময় গ্রানাডার আয়তন ছিল আন্দালুসের মোট আয়তনের মাত্র ১৫% । গ্রানাডা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তিনটি প্রদেশের সমন্বয়ে; গ্রানাডা প্রদেশ, মালাগা প্রদেশ ও আলমারিয়া প্রদেশ । তিনটি প্রদেশই যদিও ইবনুল আহমারের শাসনাধীন ছিল; কিন্তু প্রতিটি প্রদেশের কিছুটা হলেও স্বাতন্ত্র ও স্বাধিকার ছিল ।

আর তাই এ বিস্ময়মাখা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে যে, যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড অতি সহজেই দখল বা ধ্বংস করতে পারেন, তার সঙ্গে তিনি কেন এমন সমঝোতা-চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন?! অঙ্গীকার ও কোনরূপ চুক্তি স্বাক্ষর ব্যতিরেকে অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র তিনি যেভাবে গ্রাস করে নিয়েছেন, গ্রানাডার ক্ষেত্রে কেন তা করলেন না?!

প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু বাধার কারণেই তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এর সঙ্গে কোনরূপ প্রীতি বা সম্প্রীতির সম্পর্ক জড়িয়ে ছিল না । উল্লেখযোগ্য দু'টি কারণ হল,

১. গ্রানাডা ছিল অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ । তাই সেখানে প্রবেশ করা এবং দখলের চেষ্টা করা খৃস্টান বাহিনীর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল । গ্রানাডার জনসংখ্যার এই অতি ঘনত্বের কারণ হল, যখনই খৃস্টানদের হাতে মুসলিম আন্দালুসের কোন নগরীর পতন হয়েছে, খৃস্টানরা তাদের জাতীয় নীতি অনুযায়ী একটি পথই অবলম্বন করেছে, সেখানকার নাগরিকদের হত্যা কিংবা বিতাড়ন ।

আর তাই যখনই কোন মুসলিম নগরীর নাগরিকদের আপন বসতি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়িত করা হত, তারা আরও দক্ষিণে কোন শহরে আশ্রয় নিত ।[৩৩৭] এভাবে খৃস্টানদের হাতে পতন হওয়া সবগুলো ইসলামী নগরীর

---

[৩৩৭] দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৭১ ।

Scanned with CamScanner

মুসলিম নাগরিকগণ আশ্রয় নিয়েছিল আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গ্রানাডা প্রদেশে। আর এভাবেই গ্রানাডা পরিণত হয়েছিল ঘন জনবহুল একটি রাষ্ট্রে। এ কারণে খৃস্টান বাহিনীর জন্য এ রাষ্ট্রে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য।

২. গ্রানাডা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত ও মজবুত প্রচুর দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীনকালে অব্যাহত শত্রু আক্রমণ এবং পরবর্তীতে খৃস্টানশক্তির হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সম্ভাব্য আশঙ্কার কারণে প্রাকৃতিক কারণেই এসব দুর্গ ও নিরাপত্তাপ্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। এসব দুর্গ ও নগরপ্রাচীরই গ্রানাডাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। বরং আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, এসব নগরপ্রাচীরই নিরাপদ গ্রানাডা রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত করে দিয়েছিল এবং এসব দুর্গই গ্রানাডা, মালাগা ও আলমারিয়াকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল।[৩৩৮]

আর এসব কারণকে সামনে রেখেই মূলত তৃতীয় ফার্ডিনান্ড এ ধরনের সমঝোতা-চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন; যদিও এ চুক্তি ছিল সম্পূর্ণই একটি লাঞ্ছনাকর ও প্রহসনমূলক চুক্তি। এ চুক্তির অধীনে ইবনুল আহমার ক্যাস্টোলা-নৃপতিকে নিয়মিত কর প্রদান করতেন এবং ক্যাস্টোলার সম্রাটের পক্ষ হয়ে খৃস্টান রাষ্ট্রটির প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। চুক্তিতে তিনি এ অঙ্গীকারও করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে কখনোই ক্যাস্টোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না।

অবধারিত পতন-ক্ষণের অপেক্ষা

যদিও বনু আহমারের সঙ্গে ক্যাস্টোলা-সম্রাটের পূর্ব অঙ্গীকার ও চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ ছিল যে, উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সন্ধিমূলক সম্পর্ক বজায় থাকবে; কিন্তু নিজেদের অভ্যাস ও রীতি অনুযায়ী মাঝে মধ্যেই ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী তৃতীয় ফার্ডিনান্ড ও তার অধীনস্থ অন্যান্য খৃস্টান রাজন্যবর্গের নেতৃত্বে বনু আহমারের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করত এবং গ্রানাডা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নিত। ইবনুল আহমার এসব শহর পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চালালেও সফল হতেন না।

---

[৩৩৮] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪৪৩-৪৪৪।

Scanned with CamScanner

প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন গ্রানাডা রাষ্ট্র তাকওয়ার মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র ছিল না; বরং ইবনুল আহমার গ্রানাডা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পতনোন্মুখ গহ্বরের প্রান্তসীমায়। তিনি আস্থা রেখেছিলেন একজন ক্রুশেডারের অঙ্গীকারের উপর, যার কাছে অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা এসব শব্দের সামান্য মূল্যও নেই। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

﴿أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

যখনই তারা কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সর্বদা তাদের একটি দল তা ভেঙে ছুড়ে ফেলেছে; বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না। [সূরা বাকারা : ১০০]

যাই হোক, খৃস্টানশক্তিই প্রথম চুক্তি ভঙ্গ করল এবং ইবনুল আহমারের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করল। ৬৬০ হিজরীতে (১২৬১ খৃস্টাব্দে) তারা গ্রানাডা ভূমিতে হামলা চালাল। ইবনুল আহমার আটলান্টিকের ওপার থেকে আগত বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকদের সহায়তায় এ হামলা প্রতিরোধ করে খৃস্টান বাহিনীকে পরাজিত করতে এবং তার ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেন।[৩৩৯] মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের পতনের পর এই প্রথমবারের মতো মুসলিম আন্দালুস যুদ্ধের ময়দানে তার শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করল।

এর কিছুদিন পর ৬৬২ হিজরীতে বনু মারিনের একটি বাহিনী সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে আগমন করল এবং দলের বীর সেনাপতি আমীর বিন ইদরীস খৃস্টানদের হাত থেকে শারিশ নগরী কেড়ে নিতে সক্ষম হলেন। কিন্তু অতি অল্প সময় শহরটি মুসলমানদের দখলে ছিল। আমীর বিন

---

[৩৩৯] মুমূর্ষুপ্রায় মুওয়াহহিদী রাষ্ট্র ও নবগঠিত বনু মারীন রাষ্ট্রের মধ্যে মাগরেবে চলমান অব্যাহত সংঘাত মাগরেব হতে আন্দালুসে উল্লেখযোগ্য সামরিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা ছিল। এর মধ্যেও বনু মারীনের বিভিন্ন অগ্রবর্তী বাহিনী এবং মাগরেবের স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা আন্দালুসবাসীর সাহায্যার্থে ছুটে আসত। বনু মারীনের শাসক সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন আবদুল হকের প্রায় তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সেনাপতি আবু মা'রূফ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস বিন আবদুল হক আলমারীনী ও তার ভাই বীর যোদ্ধা আমীর বিন ইদরীস সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পা রেখেছিলেন। আন্দালুসের বেদনাদায়ক ঘটনাপ্রবাহ এ সময় মাগরেবে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। আন্দালুসে খৃস্টানশক্তির অব্যাহত অত্যাচার-নির্যাতনের সংবাদ জানিয়ে এবং মুসলিম ভাইদের জন্য সাহায্য কামনা করে আন্দালুস থেকে মাগরেবের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাছে ক্রমাগত বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল। মাগরেবের আলিম-ওলামা, খতীব ও কবি-সাহিত্যিকগণ আন্দালুসে সাহায্য প্রেরণের জন্য এ সময় প্রচুর প্রচারণা চালিয়েছিলেন। দেখুন : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪৭।

Scanned with CamScanner

ইদরীসের বাহিনীর এ আকস্মিক আগমন ছিল প্রত্যাশার সামান্য এক ঝলক আলোকচ্ছটার মতোই ।

এ সময় ক্যাস্টোলার তৎকালীন নৃপতি দশম আলফোন্সো হঠাৎ করেই অনুভব করলেন যে, মুসলিম আন্দালুসে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার যুদ্ধের নতুন আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে; খৃস্টান বাহিনী মুসলমানদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে মার খাচ্ছে আর আন্দালুসবাসী নতুন করে তাদের হারানো রাষ্ট্রভূমি ও হৃত ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে । এই গুরুতর পরিস্থিতিতে দশম আলফোন্সো নিশ্চুপ বসে রইলেন না । তিনি আন্দালুসের ঘাঁটিগুলোর ওপর বলপ্রয়োগ ও নিষ্পেষণ শুরু করলেন । ৬৬২ হিজরীর শেষ দিকে (১২৬৩ খৃস্টাব্দে) ইসেজা (Ecija) শহরের প্রশাসক ইবনে ইউনুস খৃস্টান বাহিনীর নির্যাতনে নতি স্বীকার করে শহরের কর্তৃত্ব খৃস্টান বাহিনীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন ।[৩৪০] ক্যাস্টোলা বাহিনীর সেনাপতি বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করল এবং মুসলিম নাগরিকদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করল । হত্যা ও বন্দী করা হল অনেককে । অথচ ক্যাস্টোলা-শাসকের পক্ষ থেকে ইতঃপূর্বে ইসেজাবাসীকে নিরাপত্তা-অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছিল ।

পরবর্তী বছর ৬৬৩ হিজরীতে ক্যাস্টোলা-শাসকের আন্দালুসের অন্যান্য ঘাঁটিগুলোও জয় করার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল । মুসলিম আন্দালুসের সর্বত্র আশঙ্কা ও ভয়ের এক শীতল স্রোত বয়ে গেল । আন্দালুসবাসীর পক্ষ থেকে আটলান্টিকের ওপারে মাগরেবের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও নেতৃবৃন্দের কাছে ক্রমাগত সাহায্যের আবেদন এবং চূড়ান্ত পতনের পূর্বেই উদ্ধার-অভিযান পরিচালনার আবেদন-বার্তা পৌঁছতে লাগল । বিশেষত এ সময় খৃস্টানদের শত্রুতাপূর্ণ আচরণের হিংস্রতা ও তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ৬৬৩ হিজরীতেই সংঘটিত এক যুদ্ধে ইবনুল আহমারের বাহিনী ক্যাস্টোলা-শাসকের জামাতা ও তার প্রধান সেনাপতি ডন নোনিয়ো ডি লারার কাছে পরাজিত হয়েছিল ।

চলমান দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আন্দালুসের ওপারের সিউটা অঞ্চলের ফকীহ আবুল কাসেম আলউযফী আন্দালুসের ভূমিতে কাফিরশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

[৩৪০] আরও সিকি শতাব্দী পূর্বে অঞ্চলটির পতন হয়েছিল এবং তা খৃস্টান রাষ্ট্রের শাসনভুক্ত হয়েছিল । কিন্তু এরপর থেকে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ পর্যন্ত এলাকাটি একটি করদ রাজ্য হিসেবে খৃস্টান শাসকের অধীনে মুসলিম প্রশাসক কর্তৃক শাসিত ছিল ।

Scanned with CamScanner

করার জন্য মাগরেববাসীকে উদ্বুদ্ধ করে এক দীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি লিখলেন,

> তোমরা আরাম ও শান্তির কোলে আশ্রয় নিও না। আল্লাহর দ্বীন তাকে সহায়তা করার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। ইসলাম এ যুগের সবাইকে চিৎকার করে তার আবেদন শুনতে আবেদন জানাচ্ছে আর ওদিকে খৃস্টানরা দলে দলে তাদের ধর্মরক্ষার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুতরাং জলদি ওঠ, শীঘ্র কর। মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে দ্রুত কোমর বেঁধে রণাঙ্গনে অগ্রসর হও।

আফ্রিকার সকল প্রশাসকদের কাছে এ ধরনের আবেদন-নিবেদন পৌছতে লাগল। গ্রানাডা-শাসক ইবনুল আহমার তিউনিসিয়ার শাসক আলমুসতানসির বিল্লাহ আলহাফ্সীর আনুগত্যের বাইআত ঘোষণা করলেন। সংবাদ পেয়ে তিউনিসিয়ার শাসক তার সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন ও অর্থ-সম্পদ পাঠালেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টার দ্রুত ও ফলপ্রসূ কোন ফলাফল দৃষ্টিগোচর হল না। পরবর্তী আরও কয়েক বছর মুসলিম আন্দালুস একাকী শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা করে যেতে লাগল এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে অশুভ পরিণতির প্রহর গুনতে লাগল।

ক্যাস্টোলা বাহিনীর হুমকি-হামলা ও নিষ্পেষণ যখন বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেল, ইবনুল আহমার ক্যাস্টোলা-শাসকের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব (!) ও চুক্তি-নবায়ন ব্যতীত নিষ্কৃতির অন্য কোন পথ খুঁজে পেলেন না। ৬৬৫ হিজরীর শেষদিকে (১২৬৭ খৃস্টাব্দে) তিনি গ্রানাডা রাষ্ট্রের এক শ'-এর অধিক স্থানের অনেকগুলো শহর ও দুর্গ ক্যাস্টোলা-শাসকের হাতে তুলে দিলেন। এর অধিকাংশই ছিল পশ্চিম আন্দালুসের। এর মাধ্যমে নতুন করে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এভাবে দুর্যোগ ও বিপদের এক প্রলয়ঙ্কারী প্লাবনে মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে (৬২৭-৬৫৫ হিজরী) গ্রানাডা রাষ্ট্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ ঘাঁটি হারিয়ে ফেলল। মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও যে মুসলিম আন্দালুস ছিল আইবেরিয়ান উপদ্বীপের প্রায় অর্ধেক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, এই অল্প ক'দিনের ব্যবধানে তা পরিণত হল গ্রানাডা নামক সামান্য এক টুকরো ভূখণ্ডে।

এ সময় (৬৬৭ হিজরী ও তার পরবর্তী সময়) খৃস্টানশক্তি নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যায় হস্তক্ষেপ শুরু করল। ক্যাস্টোলা-শাসক দশম আলফোন্সো জাযিরাতুল খাযরাতে হামলা করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালেন।

Scanned with CamScanner

এত দিনে ইবনুল আহমার অনুভব করলেন যে, তিনি এক কঠিন সংকটে আটকে গেছেন। এতক্ষণে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তিনি এমন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করেছেন, যার কাছে এসব চুক্তির কানা-কড়ির মূল্যও নেই। সুতরাং এখন তিনি কী করবেন? তিনি একটি করণীয়ই খুঁজে পেলেন এবং তা-ই করলেন।

তিনি আটলান্টিকের ওপারে মাগরেব অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। মাগরেবে তখন মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনীর নেতৃত্বে নতুন এক রাষ্ট্র। ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনীর নামের সঙ্গে বংশীয় উপাধি আলমারীনী যুক্ত করা হয়েছিল পূর্বতন মুওয়াহহিদী শাসক ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদীর নামের সঙ্গে পার্থক্য বজায়ের উদ্দেশ্যে। উভয় ইয়াকুবই ছিলেন একই চেতনার শাসক। তারা উভয়ে ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম মহান পুরুষ ও শ্রেষ্ঠতম শাসকদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল আহমার মাগরেবের শাসক আমীরুল মুসলিমীন সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমারীনীর কাছে বার্তা পাঠিয়ে সাহায্য চাইলেন এবং সাগরের এপারের মুসলিম ভাইদের সহায়তা করার আবেদন জানালেন। তিনি পত্রের মাধ্যমে তাকে খৃস্টানদের অব্যাহত হামলা ও নিষ্পেষণ, আন্দালুস-ভূমিতে ইসলামের অবশিষ্ট অস্তিত্বটুকুও নিশ্চিহ্ন করার খৃস্টীয় অভিপ্রায়ের বিষয়েও অবগত করলেন।

কিন্তু ইবনুল আহমার তার এই আবেদনের পরিণতি দেখে যেতে পারেননি। পত্রপ্রেরণের অল্প ক'দিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩৪১]

---

[৩৪১] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৪৭-৫০।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বনু মারীন

বনু মারীন বিখ্যাত আমাজিগ (বার্বার) গোত্র যিনানা গোত্রের একটি শাখা।[৩৪২] মাগরেবের ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আরও অনেক গোত্র যেমন মুগীলা, মাদইয়ুনা, মিগরাওয়া, আবদুল ওয়াদ, যিরারা ইত্যাদি গোত্রও যিনানা গোত্রের শাখা। প্রথম দিকে বনু মারীন ছিল একটি যাযাবর মরুচারী গোত্র। ৬০১ হিজরীতে বনু আবদিল ওয়াদ ও বনু ওয়াসিনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে তারা নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে মাগরেবের গহীন পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যায় এবং মাগরেব ও সাহারা মরুভূমির মধ্যবর্তী বৃক্ষ-তরু-লতাহীন এক নির্জন ও দুর্গম এলাকায় অবতরণ করে। ৬১০ হিজরীতে তারা সেখানেই স্থায়ী আবাস স্থাপন করে। সে বছরই ইকাব যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মুওয়াহহিদী শাসক মুহাম্মাদ আননাসির মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র আলমুসতানসির তার স্থলাভিষিক্ত হন।

আলমুসতানসির ছিলেন একেবারেই কিশোর বয়সী একজন শাসক। রাজনীতি ও প্রশাসননীতি সম্পর্কে তার মোটেও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বভার তার চাচা ও মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন দায়িত্বপ্রাপ্তরা সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার পরিবর্তে দুঃশাসন কায়েম করে এবং প্রশাসনিক দায়িত্বপালনে অবহেলা করে বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ইকাব যুদ্ধের কারণে মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিও বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশ দক্ষ সেনাপতি ও যোদ্ধা যুবক ইকাব যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আর এর পরপরই এ অঞ্চলে এক বিরাট মহামারী ছড়িয়ে পড়ায় মারা গিয়েছিল অনেক মানুষ।

বনু মারীন এ সময় নির্জন মরুভূমিতে বসবাস করত। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে তারা সাময়িক সময়ের জন্য মাগরেবের গ্রাম ও উপশহরগুলোতে পশু চরাতে আসত এবং অনুর্বর মরুভূমিতে জীবন নির্বাহের অনিবার্য সামগ্রী শস্যদানা ও

---

[৩৪২] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ১৪ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৬৬।

Scanned with CamScanner

খাবার সংগ্রহ করত। গ্রীষ্ম শেষে যখন শীতকাল শুরু হত, তখন তারা বিভিন্ন গ্রাম ও শহরতলি থেকে সকলে আকরাসিফ নামক একটি শহরে সমবেত হত এবং সেখান থেকে সবাই একসঙ্গে নিজেদের আবাসভূমি গহীন মরুভূমির উদ্দেশে পাড়ি জমাত।

অভ্যাসমতো ৬১০ হিজরীতে তারা পশু চরানো এবং শস্যদানা ও খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাগরেবের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরতলিতে উপস্থিত হল। এবার এসে তারা দেখতে পেল, এসব এলাকার অবস্থা আগের মতো নেই। সবকিছু কেমন যেন পাল্টে গেছে। মুওয়াহহিদী প্রশাসনের অবস্থাও তথৈবচ। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে চরম উদাসীন হয়ে তারা ব্যস্ত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে। ইকাব যুদ্ধে বীর যোদ্ধা ও নওজোয়ানদের হারানোর পর জনগণও কেমন যেন নীরব-নিস্তব্ধ। যুদ্ধ বিভীষিকার পরেই যোগ হয়েছে মাগরেব ও আন্দালুস-ভূমি উজার করা এক মহামারী।

পাশাপাশি তারা লক্ষ করল, এ দেশের মাটি চাষাবাদের উপযোগী ও অত্যন্ত উর্বর, পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ আছে, আছে বসবাসের উপযুক্ত বিস্তৃত স্থান, চাষাবাদের বিস্তৃত ক্ষেত; পশু চরানোর প্রচলন কম থাকায় সবুজ ঘাসে ভরপুর চারণভূমিও অনেক, আছে সবুজ-শ্যামল সমতল ভূমি ও টিলাভূমি। সার্বিক পরিস্থিতি তাদেরকে মরুভূমি ছেড়ে এখানে আবাস স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করল। তারা মরুভূমিতে অবস্থানরত তাদের গোষ্ঠীর সকলকে যাবতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করল এবং এও জানাল যে, তারা এখানেই আবাস স্থাপন করতে চায়। গোত্রের বাকিদেরকেও তারা এখানে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করল। বনু মারীনের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী সংবাদ পাওয়ামাত্র দ্রুত রুক্ষ মরুভূমি ছেড়ে এই সবুজ ভূখণ্ডে চলে এল এবং পুরো মাগরেবে ছড়িয়ে পড়ল।[৩৪৩]

যেহেতু বনু মারীন ছিল যাযাবর সম্প্রদায়, স্বাভাবিকভাবেই কারও কাছে নতি স্বীকার করা বা কারও অধীনে থাকা তাদের ধাতে ছিল না। তাই নতুন আবাসস্থলে ধীরে ধীরে তারা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে লাগল এবং বেদুঈনদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তাদের চারপাশের শহরগুলোতে মাঝে মধ্যেই অতর্কিতে হামলা চালাতে লাগল। তাদের এ ধরনের আক্রমণের প্রকোপ যখন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেল এবং মুওয়াহহিদী প্রশাসনের কাছে জনসাধারণের অভিযোগ আসা বেড়ে গেল, তখন খলীফা আলমুসতানসির

---

[৩৪৩] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ২৪-২৭, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৬৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ৩/৪।

Scanned with CamScanner

মুওয়াহহিদী তাদের মূলোৎপাটন করার মনস্থ করলেন।

৬১৩ হিজরীতে তিনি তৎকালীন প্রধান সেনাপতি আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক বিন মাহইয়ু-এর নেতৃত্বে বনু মারীনকে দমন করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। একটানা কয়েকদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুওয়াহহিদী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। বিজয়ী বনু মারীন মুওয়াহহিদী বাহিনীর প্রচুর সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করল। ফলে তাদের শক্তি ও প্রভাব বহু গুণে বৃদ্ধি পেল এবং পুরো মাগরেব অঞ্চলে তাদের প্রভাব-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল।[৩৪৪]

এরপর ৬৩৯ হিজরী পর্যন্ত একটানা কয়েক বছর বনু মারীন ও মুওয়াহহিদী সরকারের মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ অব্যাহত রইল। ৬৩৯ হিজরীতে মুওয়াহহিদী শাসক রাশীদ মুওয়াহহিদী বনু মারীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করলে এবারও মুওয়াহহিদী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল এবং বনু মারীন প্রচুর ধন-সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারী হল।[৩৪৫]

এর এক বছর পরই খলীফা রাশীদ মারা গেলেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার ভাই আবুল হাসান সাঈদ। সেভিলবাসী সেভিল পতনের পূর্বে তার কাছেই সাহায্য কামনা করেছিল।[৩৪৬] আবুল হাসান সাঈদ বনু মারীনকে দমন করার সঙ্কল্প করলেন এবং এ উদ্দেশ্যে কয়েক গুণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। ৬৪২ হিজরীতে তিনি বনু মারীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এবার বনু মারীন পরাজিত হল এবং তাদের তৎকালীন আমীর আবু মুআ'ররিফ মুহাম্মাদ বিন আবদুল হক নিহত হলেন।

আবু মুআ'ররিফের মৃত্যুর পর বনু মারীনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন তার ভাই আবু বকর বিন আবদুল হক। তিনি 'আবু ইয়াহইয়া' উপাধি ধারণ করলেন। তার আমলে বনু মারীনের প্রতাপ ও শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পেল। ৬৪৩ হিজরীতে বনু মারীন মিক্‌নাসা শহর দখল করে নিল।[৩৪৭] এরপর তারা ফেয নগরীকে লক্ষ্যস্থির করল এবং কঠিন অবরোধের পর ৬৪৮ হিজরীতে ফেয নগরীও দখল করে নিল। ৬৫৫ হিজরীতে তারা সিজিল্‌মাসা (Sijilmasa) ও দার্‌আ (Draa) নগরী জয়

---

[৩৪৪] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ২৭ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৬৯।

[৩৪৫] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৭১।

[৩৪৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, মুওয়াহহিদীন অধ্যায়, পৃ : ৩৮০-৩৮৪।

[৩৪৭] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ৬৩-৬৬ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৭১-১৭২।

Scanned with CamScanner

করল। এর এক বছর পর আবু ইয়াহইয়া মৃত্যুবরণ করলেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার অপর এক ভাই আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন আবদুল হক আলমারীনী। তিনি 'আলমানসুর বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করলেন এবং ফেয নগরীকে বনু মারীন রাষ্ট্রের রাজধানী নির্ধারণ করলেন।[৩৪৮]

৬৫৭ হিজরীতে বনু মারীন এবং মধ্য মাগরেবের শাসক ও বনু আবদিল ওয়াদের সর্দার আমীর ইয়াগ্‌মারাসিন বিন যিয়াদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল। আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুর যুদ্ধে জয়লাভ করলেন এবং ইয়াগ্‌মারাসিন পরাজিত অবস্থায় তিলিমসানে চলে গেল।[৩৪৯] ৬৫৮ হিজরীতে আন্দালুসের খৃস্টানশক্তি মাগরেবের সমুদ্র উপকূলীয় শহর সিলায় হামলা চালাল এবং সেখানকার বহু অধিবাসীকে হত্যা ও বন্দী করল। সংবাদ পেয়ে আলমানসুর আলমারীনী দ্রুত সেখানে ছুটে গেলেন এবং কয়েক সপ্তাহ দখলদার খৃস্টান বাহিনীকে অবরোধ করে রাখার পর তাদেরকে শহর ত্যাগে বাধ্য করলেন।[৩৫০]

৬৬৭ হিজরী। সংঘটিত হল বনু মারীন ও মুওয়াহহিদী বাহিনীর চূড়ান্ত যুদ্ধ। বছরের শেষ দিকে মুওয়াহহিদী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ বনু মারীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিজেই বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। বনু মারীনের রাজধানী ফেয এবং মুওয়াহহিদী রাষ্ট্রের রাজধানী মার্‌রাকিশের মধ্যবর্তী গাফু উপত্যকায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল।

যুদ্ধে বনু মারীন নিরঙ্কুশ জয় অর্জন করল। মুওয়াহহিদী বাহিনীর প্রচুর সৈন্য নিহত হল; স্বয়ং মুওয়াহহিদী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহও নিহত হলেন। বনু মারীন বাহিনী তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কব্জা করল।[৩৫১] এরপর তারা রওয়ানা হল মার্‌রাকিশের উদ্দেশে। ৬৬৮ হিজরীর ৯ মুহাররম ইয়াকুব আলমানসুর তার বাহিনী নিয়ে মার্‌রাকিশে প্রবেশ করলেন এবং মার্‌রাকিশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি ধারণ করলেন।[৩৫২] শেষ হল দীর্ঘ প্রায় দেড় শতাব্দীব্যাপী মুওয়াহহিদী সাম্রাজ্যের অধ্যায়; আর শুরু হল নবগঠিত এক সাম্রাজ্যের নতুন এক অধ্যায়, যার নাম 'বনু মারীন সাম্রাজ্য'। পরবর্তী সময়ে বনু মারীন সুবিশাল মাগরেবের সকল অঞ্চলকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল।

---

[৩৪৮] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ৫৮, ৭৭-৭৮, ৮৩।

[৩৪৯] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৭৭-১৭৮।

[৩৫০] ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ৯৩-৯৪ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্বসা*, ৩/২১-২২।

[৩৫১] দেখুন : ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ১১৭-১১৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৮২।

[৩৫২] দেখুন : ইবনে আবি যারা', *আযযাখীরা*, পৃ : ১১৮।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী
আন্দালুসে বিজয়াভিযানের পুনঃসূচনা

ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী ... এক সংগ্রামী পুরুষ

ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী-এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তার সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন অধিক রোযা ও অধিক কিয়ামুল লাইলের আমলকারী। সর্বদা যিকিরের হালতে থাকতেন, উম্মাহর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। দিনের অধিকাংশ সময় যিকর করতেন আর রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকতেন। সৎ লোকদের সম্মান করতেন, দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও আন্তরিক আচরণ করতেন। আহলে দ্বীনের সামনে বিনয়ী থাকতেন, রক্তপাত যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। উদার ও বদান্য ছিলেন, যুদ্ধে সর্বদা বিজয়ী হয়েছেন এবং সৌভাগ্যময় চরিত্রগুণের অধিকারী ছিলেন। তার বহন করা নেতৃত্বের পতাকা কোনদিন অবনমিত হয়নি; তার পরিচালিত বাহিনী কোনদিন ভাঙনের শিকার হয়নি। যে শত্রুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন, তাকে পরাভূত করেছেন। যে বাহিনীর মোকাবেলা করেছেন, তাকেই পরাজিত ও বিনাশ করেছেন। যে নগরী ও দেশকেই লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন, তা-ই জয় করেছেন।[৩৫৩]

ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী রহ.-এর এসব মহান বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি তো ইসলামের ইতিহাসের সকল বিজয়ী সেনানায়কের গুণাবলি। আজকের মুসলমানের কর্তব্য, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সামনে কিছুক্ষণের জন্য থেমে চিন্তা-ভাবনা করা, নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে এসব গুণের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করা; সর্বোপরি নিজেদের জীবনের চলার পথে আলো পাবার লক্ষ্যে এসব গুণের এক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা।

---

[৩৫৩] ইবনে আবি যারা', *আযযাখিরাতুস সানিয়্যা*, পৃ : ৮৫-৮৬।

Scanned with CamScanner

ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী-এর অসাধারণ সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ ও প্রায়োগিক নমুনা হল, যখন প্রথম মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার তার কাছে সহায়তার আবেদন করেছিলেন, তখন কালবিলম্ব না করে তিনি সে আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পা রেখেছিলেন। এরপর গ্রানাডায় খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করে ইসলামী চেতনাবোধের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

আন্দালুস ও বহিঃরাষ্ট্রের সহায়তার অর্জিত বিজয় একটি পর্যালোচনা

বহিঃরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে বিজয় অর্জন করা আন্দালুসবাসীর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বিগত দীর্ঘকাল ধরে এটি আন্দালুসে একটি স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। দুই শ' বছরের অধিক সময় ধরে আন্দালুসবাসী বহিঃরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়েই ছালিব-পূজারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কখনো মুরাবিতী বাহিনীর সাহায্য নিয়ে, কখনো মুওয়াহহিদী বাহিনীর সহায়তায়, আবার কখনো বনু মারীনের সহযোগিতায়, এভাবেই চলেছে শেষ পর্যন্ত। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মাগরেব ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর স্কন্ধে ভর দেওয়া ব্যতীত আন্দালুসে মুসলমানদের ভিত্তিই যেন দাঁড়াতে পারত না।

আর এটি একটি অতি স্বাভাবিক ও কুদরতি বিষয় যে, অন্যের কাঁধে ভর করে যার অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তার অবস্থান কখনোই স্বাভাবিক ও মজবুত হয় না এবং এ পথে অর্জিত বিজয় কখনো পূর্ণাঙ্গ হয় না। যাদের সম্পদের পাহাড় খরচ হয় চকমকে চোখ-ধাঁধানো প্রাসাদ নির্মাণের পেছনে, চির শত্রু খৃস্টান বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় যাদের চিন্তা ও পরিকল্পনা এবং অর্থ ও কর্মসাধনা ব্যয় হয় গ্রানাডায় আলহামরা রাজপ্রাসাদের মতো আন্দালুসের অন্যতম জাকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণে, আর তাদের মাতৃভূমি ও সেই বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তারক্ষায় সাগর পাড়ি দিয়ে দূর দেশের বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়, আর যাই হোক এ ধরনের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রজীবন সঠিক পথে চলতে পারে না।

Scanned with CamScanner

প্রথম মুহাম্মাদের মৃত্যু এবং মুহাম্মাদ আলফকীহের ক্ষমতাগ্রহণ

৬৭১ হিজরীতে (১২৭৩ খৃস্টাব্দে) প্রায় আশি বছর বয়সে গ্রানাডা শাসক প্রথম মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র তার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতা-পুত্র উভয়ের নামই ছিল মুহাম্মাদ; বরং বনু আহমারের অধিকাংশ শাসকই তাদের পুত্রের নাম মুহাম্মাদ রেখেছিলেন। নতুন শাসকের পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইবনুল আহমার। পিতার শাসনামলে যেহেতু তিনি তালিবে ইলম ছিলেন, তাই জনগণ তাকে 'ফকীহ' উপাধি প্রদান করে এবং তিনি পরিচিত হন 'মুহাম্মাদ আলফকীহ' নামে।[৩৫৪]

শাসনভার লাভ করার পর মুহাম্মাদ আলফকীহ তার রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থার ওপর নজর বোলালেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, উত্তরের খৃস্টানশক্তির মোকাবেলায় আন্দালুসের মুসলিম শক্তি কিছুতেই অটল-অবিচল থাকতে পারবে না। এদিকে তার পিতা প্রথম মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর থেকে দশম আলফোন্সো ভাবতে শুরু করেছেন যে, গ্রানাডা রাষ্ট্রের প্রশাসন ও সামরিক শক্তি এবার ভেঙে পড়েছে। আর তাই তিনি কালবিলম্ব না করে নতুন করে গ্রানাডা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে হামলা চালাতে শুরু করেছেন। সবদিক বিবেচনা করে মুহাম্মাদ আলফকীহ একটি সমাধানই খুঁজে পেলেন; হ্যাঁ, বহিঃরাষ্ট্রের সাহায্য কামনা। অধিকন্তু তার পিতাও মৃত্যুর পূর্বে তাকে মাগরেবের আমীরুল মুসলিমীন ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী-এর সঙ্গে সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে রাখার অসিয়ত করেছিলেন।[৩৫৫]

বনু মারীন সরকারও গ্রানাডার সাহায্য আবেদনে সাড়া দিল। ৬৭৪ হিজরীর সফর মাসে আলমানসুর আলমারীনী প্রথমবার আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পা রাখলেন। নিজের আন্দালুস-অভিযানের প্রস্তুতি পূর্ণ সম্পন্ন করার জন্য এর একবছর পূর্বে তিনি তার পুত্রের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী জাযিরাতুল খাযরায় প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইয়াকুব আলমানসুরের বিভিন্ন সময়ের আন্দালুস-অভিযানে এই জাযিরাতুল খাযরাই ছিল আন্দালুস-ভূমিতে তার অস্থায়ী ঘাঁটি। এরও বেশ কয়েক বছর পূর্বে ৬৬৩ হিজরীতে তিনি প্রথম মুহাম্মাদ ইবনুল আহমারের জীবদ্দশায় তার

---

[৩৫৪] দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯১।

[৩৫৫] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯১।

Scanned with CamScanner

জনৈক নিকটাত্মীয়ের নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এ বাহিনীটি গ্রানাডাতেই অবস্থান করছিল এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে গ্রানাডার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বস্তুত তাদের অপরিসীম ভূমিকার ওসীলাতেই আল্লাহ তাআ'লা গ্রানাডাকে চূড়ান্ত পতন থেকে রক্ষা করেছিলেন।[৩৫৬]

এমন প্রেক্ষাপটেই গ্রানাডা থেকে বাইরে কর্ডোভার কাছাকাছি এলাকায় মুসলিম বাহিনী ক্যাস্টোলা বাহিনীর মুখোমুখি হল। ক্যাস্টোলা বাহিনীর নেতৃত্বে দিচ্ছিল ক্যাস্টোলার বিখ্যাত যোদ্ধা ও সেনাপতি ডন নোনিয়ো ডি লারা। তার নামেই এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয় এবং এ যুদ্ধটি 'ডনোনিয়োর যুদ্ধ' নামে খ্যাতি লাভ করে।[৩৫৭]

ডনোনিয়োর যুদ্ধ ও নিরঙ্কুশ বিজয়

৬৭৪ হিজরীতে (১২৭৬ খৃস্টাব্দে) সংঘটিত হল ডনোনিয়োর যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে বনু মারীন রাষ্ট্রের প্রধান আমীরুল মুসলিমীন ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী। তিনি নিজে জনসাধারণকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন,

শোন! জান্নাত তোমাদের জন্য আপন দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছে আর হুর ও সহচরদের সুসজ্জিত করে রেখেছে। সুতরাং তোমরা দ্রুত জান্নাতের দিকে ধাবিত হও এবং জান্নাতের সন্ধানে সর্বস্ব ব্যয় কর। জান্নাতের সওদা করতে গিয়ে আপন প্রাণ-মূল্য ব্যয় কর। শোন, জান্নাত তো তরবারির ছায়াতলে।

এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতে তেলাওয়াত করলেন কোরআনের চির শাশ্বত ঘোষণা :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ

---

[৩৫৬] ইবনে আবি যারা', *আযযাখিরাতুস সানিয়্যা*, পৃ : ১৪৪-১৪৬ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯১-১৯২।

[৩৫৭] ইবনে আবি যারা', আযযাখিরাতুস *সানিয়্যা*, পৃ : ১৪৮।

Scanned with CamScanner

بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে-এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে এবং নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কোরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য। [সূরা তাওবা : ১১১]

এরপর তিনি বললেন,

সুতরাং এই প্রভূত মুনাফার ব্যবসাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এর সদ্ব্যবহার কর এবং সৎ কর্মের মাধ্যমে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও। তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তারা তো লাভ করবে শহীদী মৃত্যুর গৌরব; আর যারা জীবিত থাকবে, তারা আপন পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে নিরাপদ অবস্থায় পার্থিব গনীমত ও পরকালের অফুরান সাওয়াবের সম্পদ নিয়ে প্রশংসিত অবস্থায়। সুতরাং

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা আলে-ইমরান : ২০০][৩৫৮]

আল্লাহওয়ালা এই অনন্যসাধারণ সিপাহসালার, সমুন্নত ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত ও জান্নাতের সওদায় পূর্ণ প্রস্তুত আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া মাগরেবের জানবাজ সৈনিকদল– দশ হাজারেরও কমসংখ্যক বীর যোদ্ধার এই বাহিনীর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআ'লা বাস্তবায়ন করলেন এক মহান ও গৌরবময় বিজয়। যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর ছয় হাজার সৈন্য নিহত হল, বন্দী হল সাত-আট হাজার। বাহিনীর প্রধান ডন নোনিয়ো নিজেও এ যুদ্ধে নিহত হল।[৩৫৯] মুসলিম বাহিনী প্রচুর গনীমত লাভ করল। ৫৯১ হিজরীতে (১২৭৬

---

[৩৫৮] ইবনে আবি যারা', *আযযাখিরাতুস সানিয়্যা*, পৃ : ১৪৯।

[৩৫৯] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৩।

Scanned with CamScanner

খৃস্টাব্দে) সংঘটিত আরিক যুদ্ধের পর আন্দালুসে মুসলিম বাহিনী এই ডনোনিয়ো যুদ্ধের মতো এমন নিরঙ্কুশ বিজয় কোন যুদ্ধে লাভ করেনি।

ডনোনিয়ো যুদ্ধের পর আলমানসুর জাযিরাতুল খাযরায় ফিরে এলেন এবং পয়ত্রিশ দিন সেখানে অবস্থান করে গনীমতের সম্পদ বণ্টন করলেন। এ সময় তিনি আটলান্টিকের ওপারের মুসলিম জনগণের কাছে এপারের মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের সংবাদ পাঠালেন এবং গ্রানাডা-শাসক ইবনুল আহমারের কাছেও বার্তাবাহক পাঠিয়ে বিজয়-সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে সেভিলের নগর-সীমান্তে পৌঁছলেন। মুসলিম বাহিনী দুর্ভেদ্য সেভিল নগরী অবরোধ করল। প্রতিরোধ করতে গিয়ে সেভিলের খৃস্টান বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত বা বন্দী হল। এরপর তিনি সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে শারিসে পৌঁছলেন এবং শারিস নগরীও অবরোধ করলেন। এরপর সেখান থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে জাযিরাতুল খাযরায় ফিরে এলেন।[৩৬০]

এ যুদ্ধের তিন বছর পর ৬৭৭ হিজরীতে (১২৭৯ খৃস্টাব্দে) সেভিলের খৃস্টান গোষ্ঠী আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সংবাদ পেয়ে ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী আবারও তার বাহিনী নিয়ে সেভিলে পৌঁছলেন এবং আবারও সেভিল অবরোধ করলেন। দীর্ঘ সময়ের অবরোধের পর সেভিলের খৃস্টান কর্তৃপক্ষ জিযিয়া প্রদানের শর্তে ইয়াকুব আলমানসুরের সঙ্গে সন্ধি করল। এরপর তিনি কর্ডোভা অভিমুখী হলেন এবং কর্ডোভা অবরোধ করলেন। কর্ডোভাও জিযিয়া প্রদানের শর্তে নতি স্বীকার করল।[৩৬১]

তৎকালীন আন্দালুসের খৃস্টান গোষ্ঠী যে কোন মূল্যে তাদের নগরীগুলোর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে উদগ্রীব ছিল। তারা এসব নগরীর প্রাচীর ও দুর্গগুলোর কারণে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা লাভ করেছিল। বরং বলা ভালো, এগুলো সেসব নগরপ্রাচীর ও দুর্গ, যা ইতঃপূর্বে মুসলমানরাই নিজেদের নগরীর নিরাপত্তার জন্য নির্মাণ করেছিল। কিন্তু দশম আলফোন্সো সেসব মুসলিম শাসকদের

---

[৩৬০] ইবনে আবি যারা', *আযযাখিরাতুস সানিয়্যা*, পৃ : ১৫৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৩।

[৩৬১] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৬-১৯৭।

Scanned with CamScanner

মতো ভীরু, কাপুরুষ ও দুর্বল ছিলেন না, যারা এসব নগরীর পতনের সময় মুসলমানদের শাসনকর্তা ছিল এবং বীরত্ব প্রদর্শনের পরিবর্তে ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে এসব নগরীর কর্তৃত্ব খৃস্টানশক্তির হাতে তুলে দিয়েছিল। এমনকি তারা এসব নগরী দখলের ক্ষেত্রে খৃস্টান বাহিনীকে সহায়তাও করেছিল।

আরও পরিতাপের বিষয়, মুসলিম আন্দালুসের এই মুমূর্ষুপ্রায় অবস্থাতেও আন্দালুসের পুরো মুসলিমসমাজ এক ইবনুল আহমারের শাসনে ঐক্যবদ্ধ ছিল না; বরং বনু আশকীলুলা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল[৩৬২] এবং মালাগা, কিমারিশ ও ওয়াদিয়ে আশ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইবনুল আহমার ও তার পিতা প্রথম মুহাম্মাদ অধিকাংশ সময় এসব অভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটাতেই ব্যস্ত থাকতেন। স্বয়ং মুহাম্মাদ আলফকীহ বনু আশকিলুলাকে দমনে ব্যস্ত থাকায় ডেনোনিয়োর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি।[৩৬৩]

মুসলিম বাহিনী সেভিল অবরোধ করার পর যথাসম্ভব এর ক্ষতিসাধন করল। দশম আলফোন্সো তখন সেভিলেই ছিলেন। এ সময় ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী তার বাহিনীর সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করলেন। এসব বাহিনী খৃস্টানদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন দুর্গে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হল।

এরপর সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে জাযিরাতুল খাযরায় তার অস্থায়ী সেনানিবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। জাযিরায় কয়েকদিন বিশ্রাম করার পর তিনি তার বাহিনী নিয়ে শারিসের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং সেখানে কঠিন অবরোধ আরোপ করলেন। এখানে অবরোধ চলাকালেই তিনি তার পুত্রকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ সেভিলের উদ্দেশে প্রেরণ করলে উক্ত বাহিনী সেভিলের বিভিন্ন দুর্গের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হল। এরপর পুত্র পিতার কাছে ফিরে এলেন এবং

---

[৩৬২] বনু আশকিলুলা ছিল সুলতান মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার আলফকীহ-এর ভাগনে গোষ্ঠী। সুলতান মামার সঙ্গে বনু আশকিলুলার বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয় এবং এক যুদ্ধে তাদের চার ভাইয়ের একজন নিহত হয়। একে কেন্দ্র করে সুলতান মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার ও তার বোন (নিহত ব্যক্তির মা)-এর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়। এ গৃহ-সংঘাত কখনোই শেষ হয়নি এবং তা আন্দালুসের ভাগ্যে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি।

[৩৬৩] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৭ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ৩/৪৫-৪৮।

Scanned with CamScanner

উভয়ে প্রচুর গনীমতসহ মুসলিম বাহিনী নিয়ে জাযিরাতুল খাযরায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এর কিছুদিন পর সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর গ্রানাডার শাসক ফকীহ ইবনুল আহমারকে অভিযানে শরীক হতে অনুরোধ জানালেন। অনুরোধে সাড়া দিয়ে ইবনুল আহমার তার বাহিনীসহ মাগরেবের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন। উভয় বাহিনী একসঙ্গে কর্ডোভায় আক্রমণ করল এবং কর্ডোভার বিভিন্ন দুর্গের যথাসাধ্য ক্ষতিসাধন করল। এ সময় সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর অ্যারাজোনা, বারকুনা, জাইয়ানসহ আশেপাশের বিভিন্ন শহরের উদ্দেশে বিভিন্ন ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করলেন। নিরুপায় ও কোণঠাসা ক্যাস্টোলা-শাসক নগর-প্রাচীরের বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার দুঃসাহস না দেখিয়ে সুলতানের কাছে সন্ধি ও শান্তিচুক্তির প্রস্তাব পাঠালেন। সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী ইবনুল আহমারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তার কাছেই ন্যস্ত করলেন। ইবনুল আহমার আমীরুল মুসলিমীনের অনুমতি নিয়ে সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হলেন।

এরপর আমীরুল মুসলিমীন সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর ইবনুল আহমারের সঙ্গে গ্রানাডায় ফিরলেন এবং এ অভিযানে অর্জিত যাবতীয় গনীমত ইবনুল আহমারকে দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন তার অস্থায়ী ছাউনি জাযিরাতুল খাযরায়।[৩৬৪]

মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার আলফকীহ ও চরম বিশ্বাসঘাতকতা

সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর যখন জাযিরাতুল খাযরায় ফিরছিলেন, এ সময় সংবাদ এল, মালাগার প্রশাসক মৃত্যুবরণ করেছেন। উক্ত প্রশাসক ছিলেন তৎকালে মালাগার শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী বনু আশকিলুলা গোত্রীয়। প্রয়াত প্রশাসকের স্থলাভিষিক্ত হলেন তার পুত্র। কিন্তু তিনি গ্রানাডা-শাসক মুহাম্মাদ আলফকীহের উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেতে মালাগার শাসনভার নিজে গ্রহণ না করে সুলতান ইয়াকুব আলমানসুরের কাছে সোপর্দ করতে

---

[৩৬৪] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৬-১৯৭।

Scanned with CamScanner

চাইলেন।[৩৬৫] উল্লেখ্য, মুহাম্মাদ আলফকীহ ছিলেন তার মামা। এমনকি অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আলমানসুরকে এ কথাও বললেন যে, আপনি যদি মালাগার দায়িত্বভার গ্রহণ না করেন, তাহলে আমি তা খৃস্টানদের হাতে তুলে দেব; তবুও ইবনুল আহমারকে এ অঞ্চলের মালিক হতে দেব না। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির দাবি হিসেবে ইয়াকুব আলমানসুর বনু আশকিলুলার দাবি মেনে নিলেন এবং দ্রুত মালাগায় পৌঁছে মালাগার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলেন।[৩৬৬]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল ইয়াকুব আলমানসুরের জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত। কেননা, তিনি সর্বদা মুহাম্মাদ আলফকীহকে আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট রাখতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তার সঙ্গে মুহাম্মাদ আলফকীহ-এর ঘনিষ্ঠতার হাকীকত অনেকটাই ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে মু'তামিদ বিন আব্বাদের সম্পর্কের মতো। এ শ্রেণির সুবিধাবাদী ও নীতিহীন শাসকেরা মুসলিম ভূখণ্ডকে খৃস্টানশক্তির হাতে তুলে দিতে রাজী হবে; কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীন বা ইয়াকুব আলমানসুরের মতো আন্দালুসের পরম বন্ধুদেরকে জাযিরাতুল খাযরায় অবতরণ করতে দিতে রাজী হবে না! হায়! কী নিষ্ঠুর নীতি! কী নির্মম নীতি-বিসর্জন!

এ কথাও সত্য যে, ইয়াকুব আলমানসুর কিছুতেই তার অভিযান-তৎপরতাকে বিফল হতে দিতে চাননি। নিশ্চিতভাবেই তিনি আন্দালুস-ভূমিতে বনু মারীনের অবস্থান শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, যেন এর মাধ্যমে এ অঞ্চলে খৃস্টান বাহিনীর আগ্রাসন ও সব ধরনের প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় এবং একই সঙ্গে ইবনুল আহমারের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকা খৃস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন বা খৃস্টানদের হাতে ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার চিন্তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

---

[৩৬৫] ইবনুল খতীব, *আললামহাতুল বাদারিয়্যা*, পৃ : ৪৫ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৭।

[৩৬৬] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা*, ১/৫৬৪, *আ'মালুল আ'লাম*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ : ২৮৮ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ৩/৪৮।

Scanned with CamScanner

আগে থেকেই আন্দালুসের দক্ষিণ উপকূলের তারীফ দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ সুলতান ইয়াকুবের হাতে ছিল এবং সেখানে বনু মারীনের সেনাঘাঁটি ছিল। প্রথমবার যখন ইবনুল আহমার তার কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, তখনই তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, তারীফ দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ বনু মারীনকে দিতে হবে, যেন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রয়োজন পড়লে নিকটে আন্দালুস-ভূমির অভ্যন্তরেই সাহায্যকারী বাহিনী পাওয়া যায় এবং যে কোন সময় মাগরেব থেকে মুসলিম বাহিনীর আন্দালুস-ভূমিতে অবতরণ নিষ্কণ্টক হয়।

যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা-ই ঘটল। মুহাম্মাদ আলফকীহ মু'তামিদ বিন আব্বাদের চরিত্রকেই যেন পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি আশঙ্কা করলেন, আবারও বুঝি ইউসুফ বিন তাশফীনের ঘটনা মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে এবং তিনি হারাতে যাচ্ছেন তার অতি সাধের শাসনক্ষমতা। ইউসুফ বিন তাশফীন যেমন প্রথমে বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গকে সহায়তা করেছিলেন, এরপর নিজেই আন্দালুসের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছিলেন এবং আন্দালুসকে মুরাবিতী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তেমন করেই হয়তো গ্রানাডা চলে যাচ্ছে বনু মারীনের সাম্রাজ্যের অধীনে।[৩৬৭] এসব ভেবে মুহাম্মাদ আলফকীহ সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি যে কোন মূল্যে কঠিন ও দুর্ভেদ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবেন, যাতে আন্দালুস কিছুতেই বনু মারীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে।

কী ভয়াবহ চিন্তা! ফকীহ উপাধীধারী ফিকহ-শূন্য এক শাসকের কেমন নীচু মানসিকতাপূর্ণ চিন্তাধারা! অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে কী করবেন তিনি? তার মনে যে অশুভ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিরোধ করতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তিনি? বাস্তবতা চিন্তা করে মুহাম্মাদ আলফকীহ উপলব্ধি করলেন যে, ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনীর সঙ্গে লড়াই করার মতো সামর্থ্য তার নেই। তাহলে ...? তাহলে কী করবেন তিনি?

দ্বীন ও স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস আবারও মঞ্চস্থ হল। ইতঃপূর্বে মু'তামিদ বিন আব্বাদ যেমন ন্যায়শাসক ইউসুফ বিন তাশফীনকে পরাভূত করতে ষষ্ঠ আলফোন্সোর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবার মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার আলফকীহ-ও ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে একই রকম প্রতারণা করলেন এবং তারীফ দ্বীপ থেকে তার যুগের আন্দালুসের

---

[৩৬৭] দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/১৯৮।

Scanned with CamScanner

দরদী বন্ধু ইয়াকুব আলমারীনীকে বিতাড়িত করতে ক্যাস্টোলা-শাসক দশম আলফোন্সোর কৃপা প্রার্থনা করলেন।[৩৬৮]

ফিকহ-শূন্য ফকীহ ইবনুল আহমার এতটুকুই যথেষ্ট মনে করলেন না; বরং দ্রুত মধ্য মাগরেবের শাসক এবং সুলতান ইয়াকুব আলমানসুরের পুরোনো শত্রু ইয়াগ্‌মারাসিন বিন যিয়াদের কাছে দূত প্রেরণ করে আলমানসুরের বিরুদ্ধে মিত্রতার প্রস্তাব দিলেন।[৩৬৯]

দশম আলফোন্সো এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া করবেন কেন! তৎক্ষণাৎ তিনি স্থলবাহিনী ও নৌবহরের সমাবেশ ঘটিয়ে তারীফ দ্বীপ অবরোধ করলেন। এ সংবাদ শোনামাত্রই সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে আগমনের মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু মাগরেবের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে ইয়াগ্‌মারাসিনের সৃষ্ট ঝামেলা তার সংকল্প পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে তারীফ দ্বীপের অবরুদ্ধ মুসলমানদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তারা কাফিরদের হাতে বন্দী হয়ে কুফরীর লাঞ্ছনা ভোগ করবে এই আশঙ্কায় নিজেদের শিশু সন্তানদের নিজেরাই হত্যা করতে লাগল।[৩৭০] এ সংবাদ জানতে পেরে সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং কালবিলম্ব না করে তার পুত্র আবু ইয়াকুবের নেতৃত্বে একটি বিশাল নৌবহর তারীফ দ্বীপের অবরুদ্ধ মুসলমানদের উদ্ধারে প্রেরণ করলেন। এটি ৬৭৮ হিজরীর শুরুর দিকের (১২৭৯ খৃস্টাব্দের) ঘটনা। কিছু কিছু ইতিহাসগ্রন্থের

---

[৩৬৮] দেখুন : ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ২৮৯ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২০০।

[৩৬৯] অথচ ইয়াগ্‌মারাসিনই সেই ব্যক্তি, যার অব্যাহত যুদ্ধ পদক্ষেপের কারণে বনু মারীন ইতঃপূর্বে আন্দালুসবাসীর সাহায্য আবেদনে দ্রুত সাড়া দিতে পারেনি। খৃস্টানশক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেতে আন্দালুস থেকে ক্রমাগত সাহায্যের আবেদন আসার পর সুলতান আলমানসুর আলমারীনী তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়াগ্‌মারাসিনকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর তাই বাধ্য হয়েই সুলতান আলমানসুর আলমারীনী ইয়াগ্‌মারাসিনের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল যুদ্ধে জয়লাভ করার পূর্বে আন্দালুসে অভিযানে গমনের সুযোগ পাননি। সুলতান আলমানসুর আলমারীনী আন্দালুসে অভিযান চালানোর পরই আন্দালুসের মুসলমানগণ লাভ করেছিল অনেকগুলো শহরের নিয়ন্ত্রণ, ফিরে পেয়েছিল হৃত লড়াইয়ের চেতনা, লাভ করেছিল প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। ইবনুল আহমার এই সবকিছু ভুলে গিয়ে আলমানসুর আলমারীনীর বিরুদ্ধে জোট করার জন্য সেই ইয়াগ্‌মারাসিনের কাছেই বার্তা পাঠান!

[৩৭০] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২০২।

Scanned with CamScanner

বর্ণনা অনুসারে এ সময় সিউটা নগরীর আবু হাতেম আলআ'যাফী নামক জনৈক প্রাজ্ঞ আলিম সিউটার জনগণকে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে আন্দালুসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তার দাওয়াতে উদ্দীপ্ত হয়ে সিউটার প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি যুবক কাফেলায় যোগদান করে এবং ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত এক কাফেলা আন্দালুসের পথে রওয়ানা হয়ে যায়।[৩৭১]

এদিকে মাগরেব ও আন্দালুসে বনু মারীন সম্প্রদায়ের এই দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে গ্রানাডার শাসক মুহাম্মাদ আলফকীহ মালাগা দখল করে তাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হলেন। এর মাধ্যমে মালাগা থেকে মারীনী গোত্রের লোকদেরকে বিতাড়িত করার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তা বাস্তবায়নের পথ সুগম হল।

কিন্তু খৃস্টান বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ তারীফ দ্বীপের মুসলমানদের দুর্দশা দেখে মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার উপলব্ধি করলেন যে, খৃস্টান বাহিনী সেখান থেকে বনু মারীনকে বিতাড়ন করেই ক্ষান্ত হতে চাইছে না; বরং নিজেরাই তারীফ দ্বীপ দখল করার পাঁয়তারা করছে এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের একেবারে নিকটে চলে গেছে। এতক্ষণে ইবনুল আহমার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং অনুতপ্ত হলেন। তিনি খৃস্টানদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দ্রুত তার নৌবহর প্রস্তুত করে তারীফের অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। সিউটা বন্দরে সিউটা, মাগরেব ও গ্রানাডার নৌবহর মিলে প্রায় সত্তরটি নৌযান একত্রিত হল। এরপর মুসলিম নৌবহর ও খৃস্টান নৌবহরের মধ্যে সংঘটিত প্রচণ্ড যুদ্ধের পর খৃস্টান বাহিনী পরাজিত হল। মুসলিম নৌবহরের সৈন্যগণ খৃস্টান বাহিনীর জাহাজগুলো কব্জা করতে সক্ষম হলেন। মুসলিম বাহিনী জাযিরাতুল খাযরায় অবতরণ করতেই খৃস্টান স্থল বাহিনী তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করল।

কিন্তু ফকীহ মুহাম্মাদ অতীত ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ– পুরোটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন না। ইতিহাসের পুরো অধ্যায় অধ্যয়ন করলে তিনি

---

[৩৭১] প্রাগুক্ত, ৭/২০২।

Scanned with CamScanner

দেখতে পেতেন খৃস্টানদের সাহায্য গ্রহণকারী ইবনে আব্বাদের বিরুদ্ধে ইউসুফ বিন তাশফীনের বিজয়-দৃশ্য। তিনি যদি পুরোটা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতেন, তাহলে ঘটনাপ্রবাহ পূর্ণতা পেত। তিনি ইতিহাসের কেবল একটি অধ্যায় থেকে আশঙ্কার শিক্ষা নিয়ে প্রতারণার ইতিহাস পুনঃমঞ্চায়নের পরিবর্তে পুরো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারতেন। তার এই আচরণ যুগ-যুগান্তের সেসব অনাচারী শাসকদেরই একটি নমুনা, যাদের হাতে বারবার ইসলামী ভূখণ্ড ও ইসলামী সরকারের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়েছে এবং তাদের অসচ্চরিত্রের কারণেই যুগে যুগে ইতিহাসের মহান বিজেতা ও বীর পুরুষদের কীর্তি ও অবদান বিলীন হয়ে গেছে।

ইবনুল আহমারের এহেন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণে সুলতান ইয়াকুব আলমানসুরের পুত্র ও সদ্য সমাপ্ত নৌ-বিজয়ের সফল অধিনায়ক আমীর আবু ইয়াকুবের অন্তর ক্রোধ ও ঘৃণায় ভরে গেল। তিনি ইবনুল আহমারকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবং গ্রানাডা থেকে তার শাসনক্ষমতা নিঃশেষ করে দিতে খৃস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ার চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং এ বিষয়ে অনুমতি নিতে মাগরেবে তার পিতার কাছে বার্তা পাঠালেন। কিন্তু আলমানসুর এতে সরাসরি অসম্মতি জানালেন এবং এ প্রস্তাব পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

ঠিক একই সময় খৃস্টানশক্তিও ইবনুল আহমারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হল এবং বনু আশকিলুলার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে গ্রানাডায় হামলা চালাল। অবশ্য ইবনুল আহমার এ হামলা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন।

এভাবে ইবনুল আহমার নিজেই নিজের জন্য চারিদিক থেকে পরিস্থিতি প্রতিকূল করে তুললেন এবং সকলকেই নিজের শত্রুতে পরিণত করলেন। নিজের একমাত্র পরীক্ষিত মিত্র ও সাহায্যকারী বনু মারীনের বিরুদ্ধেও তিনি জোট গড়ার প্রচেষ্টা চালালেন এবং আন্দালুসের খৃস্টানশক্তি ও বনু আশকিলুলার সঙ্গে শত্রুর তালিকায় তাদেরকেও যুক্ত করলেন। কিন্তু এই চরম নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতাপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও ইবনুল আহমার এক মহান ব্যক্তিত্বের উদার মনের পরিচয় লাভ করলেন। সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনীর কাছ থেকে আগত একটি বার্তা যেন ইবনুল আহমারের অস্থির ও পেরেশান হৃদয়ের জন্য পরম স্বস্তি ও শান্তির পরশ বয়ে নিয়ে এল।

বার্তায় আলমানসুর ইবনুল আহমারের পেছনের সব আচরণ উপেক্ষা করে

Scanned with CamScanner

নতুন করে তার সঙ্গে মিত্রতা ও সন্ধি স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং পরস্পরের বিভেদ আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য কতটা ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে, সে বিষয়ে সতর্ক করলেন।

ইবনুল আহমার তো এখন চারিদিক থেকে শত্রুর আক্রমণে দিশেহারা ও মিত্রহীন। এমন উদার মনের পরিচয় পেয়ে এবং এমন সুমহান ইসলামী আখলাকের বহিঃপ্রকাশ দেখে সাড়া না দেওয়ার মতো ফিকহ-শূন্য তো তিনি নন! যে মহান মিত্র বহুবার তার রাষ্ট্রকে সহায়তা করেছেন, আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, নির্বুদ্ধিতা করে তিনি তাকে নিজের শত্রুতে পরিণত করেছেন এবং ফলাফল হাতে-নাতে ভোগ করেছেন; এখন যখন তিনিই উদারতার পরিচয় দিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে মিত্রতার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, ইবনুল আহমার কোন মুখে তা প্রত্যাখ্যান করবেন?![৩৭২]

ফলে কিছু সময়ের জন্য আলমানসুর ও ইবনুল আহমারের মাঝে সম্পর্ক স্বাভাবিক হল। এদিকে খৃস্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টোলাতে খোদ খৃস্টানদের মধ্যেই শুরু হল গৃহবিবাদ। দশম আলফোন্সোর পুত্র স্যাঞ্চো তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ভীত আলফোন্সো সুলতান ইয়াকুবের আশ্রয় কামনা করলেন। খৃস্টানদের এই পারস্পরিক বিবাদের সদ্ব্যবহার এবং আলফোন্সোকে সহায়তা করতে সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর আন্দালুসে পদার্পণ করলেন।

পরবর্তী সময়ে দশম আলফোন্সোর মৃত্যুর পর তিনি তৃতীয়বারের মতো আন্দালুসে আগমন করেন এবং এ সময় খৃস্টানশক্তি তার সঙ্গে সমঝোতা করে শান্তি ও সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে।[৩৭৩]

এর কিছুদিন পর ক্যাস্টোলার নতুন শাসক স্যাঞ্চোর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আমীরুল মুসলিমীনের দরবারে আগমন করলে তিনি স্যাঞ্চোর কাছে আন্দালুসের মুসলিম ভূমি থেকে ইতঃপূর্বে খৃস্টানশক্তি কর্তৃক ছিনিয়ে নেওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ যাবতীয় গ্রন্থভাণ্ডার ফেরত দিতে অনুরোধ জানালেন। অনুরোধে সাড়া দিয়ে দেশে ফেরার পর স্যাঞ্চো তেরটি বাহন বোঝাই কিতাব সুলতান ইয়াকুবের দরবারে প্রেরণ করলেন।[৩৭৪]

---

[৩৭২] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২০১-২০৪, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ২৮৯ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/১০২-১০৩।

[৩৭৩] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২০৫-২০৬।

[৩৭৪] প্রাগুক্ত, ৭/২০৯।

Scanned with CamScanner

ইবনুল আহমার আলফকীহের পুনঃবিশ্বাসঘাতকতা এবং তারীফ দ্বীপের পতন

এর একবছর পর ৬৮৫ হিজরীতে সুলতান ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী ইন্তেকাল করলে বনু মারীন সাম্রাজ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার পুত্র ইউসুফ বিন আলমানসুর।[৩৭৫] তৎক্ষণাৎ ইবনুল আহমার আলফকীহ তার কাছে আগমন করলেন এবং মিত্রতা ও আনুগত্যের আবেদন জানালেন। ইতঃপূর্বে ইউসুফ বিন আলমানসুর যখন মাগরেবী বাহিনী নিয়ে আন্দালুসে গমন করেছিলেন এবং খৃস্টান নৌবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল এবং আমীর ইউসুফ বিন ইয়াকুব আলমানসুর জাযিরাতুল খাযরা ও তারীফ দ্বীপ বাদে মাগরেবী সাম্রাজ্যের অধীন আন্দালুসের সকল সীমান্তশহর ইবনুল আহমারকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ।

এর কিছুদিন পর ৬৮৬ হিজরীতে সুলতান ইউসুফ আলমারীনী ওয়াদিয়ে আশ-এর কর্তৃত্বও ইবনুল আহমারকে প্রদান করলেন।[৩৭৬]

এ সময় মাগরেবের সুলতানের নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোলযোগ দমনে ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ক্যাস্টোলা-শাসক স্যাঞ্চো বনু মারীনের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করলেন এবং মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালালেন। সংবাদ পেয়ে সুলতান সমুদ্র পার হয়ে আন্দালুসে উপস্থিত হলেন এবং খৃস্টান রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করলেন।

এবার স্যাঞ্চো চাললেন খৃস্টানদের চিরাচরিত চাল। তিনি ইবনুল আহমারকে বার্তা পাঠিয়ে ভয় দেখালেন যে, মারীনী সুলতান তার রাষ্ট্র দখল করে নেবেন। তিনি ইবনুল আহমারকে মিত্রতার প্রস্তাব দিলেন এবং জানালেন যে, তারা উভয়ে মিলে বনু মারীনকে ভবিষ্যতে আন্দালুসে আগমনে বাধা দেবেন। এর ফলে ইবনুল আহমারের গ্রানাডা রাষ্ট্রও বনু মারীনের দখলদারিত্বের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে। আর এর একমাত্র পথ হল, তারীফ দ্বীপ থেকে বনু মারীনের সামরিক ঘাঁটি উচ্ছেদ করা এবং তারীফ দ্বীপ দখল করে নেওয়া।

---

[৩৭৫] ইবনুল খতীব, *রক্বমুল হুলাল*, পৃ : ৮৯-৯০ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২১০।
[৩৭৬] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২১১।

Scanned with CamScanner

স্যাঞ্চোর প্ররোচনায় নতুন করে মুহাম্মাদ আলফকীহের অন্তরে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তিনি খৃস্টান শাসকের পাতা মরণ ফাঁদে আটকে গেলেন। বেচারা একটুও ভাবলেন না যে, এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তিনি আত্মহননের পথই বেছে নিচ্ছেন। তিনি স্যাঞ্চোর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন এবং শর্ত দিলেন যে, দখল করার পর তারীফ দ্বীপের মালিকানা তার হাতে থাকবে। বিনিময়ে তিনি ক্যাস্টোলা-শাসককে তার অধিকারে থাকা ছয়টি দুর্গের নিয়ন্ত্রণভার হস্তান্তর করবেন। চুক্তি অনুযায়ী স্যাঞ্চো তারীফ দ্বীপ অবরোধ করলেন এবং ইবনুল আহমার রসদ, খাবার ইত্যাদি প্রদান করে খৃস্টান বাহিনীকে সহায়তা করলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর দ্বীপবাসীর শক্তি নিঃশেষ হয়ে এলে তারা বাধ্য হয়ে কিছু শর্তসাপেক্ষে ক্যাস্টোলা বাহিনীর কাছে নতি স্বীকার করল।

আগেরবার ব্যর্থ হলেও এবার আর খৃস্টান বাহিনী তারীফ দ্বীপে এসে ব্যর্থ হল না। তারা তারীফ দ্বীপ দখল করে নিল। কিন্তু দখল করার পর তারা আর সেখান থেকে ফিরে গেল না এবং ইবনুল আহমারকেও এর নিয়ন্ত্রণ বুঝিয়ে দিল না। ইবনুল আহমার দু' কূলই হারালেন এবং তার এই অমার্জনীয় অপরাধ ও চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তারীফ দ্বীপের পতন ঘটল।[৩৭৭]

ভৌগোলিক দিক থেকে তারীফ দ্বীপের অবস্থান ছিল মুসলিম আন্দালুসের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাবালে তারিক প্রণালী পর্যন্ত এর সীমানা প্রলম্বিত। সুতরাং তারীফ দ্বীপের পতনের অর্থ হল আন্দালুসের সঙ্গে মাগরেবের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং মাগরেব থেকে মুসলিম আন্দালুসে সামরিক সাহায্য আগমনের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া।

আবু আবদুল্লাহ ইবনুল হাকীম ও ভয়াবহ কিছু পদক্ষেপ

৭০১ হিজরীতে (১৩০২ খৃস্টাব্দে) গ্রানাডা-শাসক ইবনুল আহমার আলফকীহ ইন্তেকাল করলেন।[৩৭৮] তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তৃতীয় মুহাম্মাদ, যার উপাধি ছিল আ'মাশ।[৩৭৯] অবশ্য আলমাখলূ' বা অপসারিত শাসক নামে

---

[৩৭৭] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২১৬ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ৩/৭১।

[৩৭৮] ইবনুল খতীব, আলই'হাতা, ১/৫৬৬, আললামহাতুল বাদারিয়্যা, পৃ : ৪৫ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২২৮।

[৩৭৯] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা*, ১/৫৪৪-৫৪৫, *আললামহাতুল বাদারিয়্যা*, পৃ : ৪৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২২৮।

Scanned with CamScanner

তিনি ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল মনোভাবসম্পন্ন একজন শাসক। তার শাসনামলে প্রকৃতপক্ষে গ্রানাডার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল উযীর আবু আবদুল্লাহ ইবনুল হাকীমের হাতে।[৩৮০] 'হাকীম' পরিচয় ধারণকারী এই উযীর সাহেব কিন্তু মোটেই হাকীম (প্রজ্ঞার অধিকারী) ছিলেন না। তিনি মাগরেবের সুলতানের পরিবর্তে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন ক্যাস্টোলার শাসকের সঙ্গে।[৩৮১]

উযীর আবু আবদুল্লাহ কেবল মাগরেবী সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা ত্যাগ করেই শান্ত হলেন না; বরং বনু আহমারের পূর্ববর্তী শাসকবৃন্দের কীর্তিকে (!) অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হলেন এবং এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, যা ভাবলেও পরিণতি-আশঙ্কায় ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। তিনি সিউটাবাসীকে সুলতান ইউসুফ আলমারীনীর আনুগত্য ত্যাগ করে ইবনুল আহমারের আনুগত্যে নিয়ে আসার জন্য হস্তক্ষেপ করতে তার চাচাতো ভাই মালাগার প্রশাসককে প্ররোচিত করলেন। এরপর নিজেই সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধ করতে রওয়ানা হলেন। পাঠক মনে প্রশ্ন– কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে?! গ্রানাডার স্বার্বভৌমত্বের জন্য সার্বক্ষণিক হুমকি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে, নাকি অন্য কারও বিরুদ্ধে?!

উত্তর বড় বেদনাদায়ক। তিনি তার বাহিনী নিয়ে বনু মারীনের সাম্রাজ্যে হামলা চালালেন এবং জাবালে তারিক প্রণালীতে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সিউটা নগরী দখল করে নিলেন। এরপর সিউটাবাসীর নিরাপত্তা ঘোষণা করে সিউটার অপসারিত প্রশাসককে গ্রানাডায় পাঠিয়ে দিলেন।[৩৮২]

বনু মারীনের শাসনব্যবস্থাকে আরও নড়বড়ে করার লক্ষ্যে এরপর এক মাগরেবী ব্যক্তিই অগ্রসর হল। আন্দালুসে বসবাসরত বনু মারীন গোত্রেরই উসমান বিন আবিল আ'লা নামক জনৈক ব্যক্তি সিউটা থেকে মাগরেব দখল করতে রওয়ানা হল। মাগরেবের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তাকে সহায়তা করল। এই প্রেক্ষাপটেই সুলতান ইউসুফ আলমারীনী নিহত হলেন এবং তার মৃত্যুর পর ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তার দু' পুত্র আবু সালিম ও আবু সাবিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত আবু সাবিত বিজয়ী হলেন

---

[৩৮০] ইবনুল খতীব, আলই'হাতা, ১/৫৪৯, আললামহাতুল বাদারিয়্যা, পৃ : ৫১ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২২৮।

[৩৮১] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২২৮।

[৩৮২] প্রাগুক্ত, ৭/২২৮-২২৯।

Scanned with CamScanner

এবং তিনিই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই আবু সাবিতের মৃত্যু হলে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার ভাই আবুর রবী' সুলাইমান। বিদ্রোহী উসমান বিন আবিল আ'লাকে তিনিই পরাজিত করলেন। পরাজিত উসমান বিন আবিল আ'লা বিফল মনোরথে আন্দালুসে চলে গেল।[৩৮৩]

নিঃসন্দেহে এ ঘটনাপ্রবাহ ছিল দৃষ্টান্তহীন চরম নির্বুদ্ধিতার ফলাফল। বিবেকের দৃষ্টিকোণ বলুন কিংবা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, কোন দিক থেকেই এ ধরনের নির্বুদ্ধিতাকে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু যা হওয়ার নয়, তা-ই হল। এদিকে গ্রানাডা-শাসক ও গ্রানাডার উযীরের এই নির্বুদ্ধিতার অনিবার্য পরিণতিতেই গ্রানাডায় আলমাখলু'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হল এবং তার অপসারণের পর তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার ভাই আবুল জুয়ূস নাস্‌র। খৃস্টানশক্তি এ পরিস্থিতির সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাল এবং জাবালে তারিকে হামলা চালাল। ৭০৯ হিজরীতে (১৩০৯ খৃস্টাব্দে) খৃস্টান বাহিনীর হাতে জাবালে তারিকের পতন ঘটল এবং মুসলিম আন্দালুস তার একমাত্র মুসলিম প্রতিবেশী ওপারের মাগরেব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুরু হল গ্রানাডার অবধারিত ও সুনিশ্চিত পরিণতির প্রহর গোনার পালা।[৩৮৪]

---

[৩৮৩] প্রাগুক্ত, ৭/২৩৬-২৩৮।

[৩৮৪] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা*, ৩/৩৪৯, *আললামহাতুল বাদারিয়্যা*, পৃ : ৬২ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/২৪০।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পতনের সঙ্গে সংগ্রাম

মাগরেব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় দুই শ' বছর অর্থাৎ ৭০৯ হিজরী থেকে ৮৯৭ হিজরী (১৩০৯-১৪৯২ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত গ্রানাডার পরিস্থিতি এমনই ছিল এবং মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলেও গ্রানাডার চূড়ান্ত পতন বিলম্বিত হচ্ছিল।

এই সুদীর্ঘ সময় গ্রানাডার নিরাপদ থাকার অন্তর্নিহিত রহস্য ও মূল কারণ হল উত্তরের দুই খৃস্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টোলা ও অ্যারাজোনার মধ্যকার প্রচণ্ড বিরোধ ও দীর্ঘ সংঘাত। আন্দালুসের ইসলামী খেলাফতের ভগ্নাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই দুই প্রতাপশালী রাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সংঘাতই মূলত গ্রানাডার সুনিশ্চিত পতনকে বিলম্বিত করছিল।

দীর্ঘকাল গ্রানাডার সার্বভৌমত্ব টিকে থাকার কার্যকারণসমূহ এবং গ্রানাডার তৎকালীন পরিস্থিতির বিবরণ[৩৮৫]

এ দীর্ঘ সময়কালে আন্দালুস উপদ্বীপের একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডা শক্তি ও দুর্বলতা, পরাজয় ও অটলতা, নিরাপত্তা ও উৎকণ্ঠা এবং শান্তি ও অস্থিরতার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দীর্ঘ প্রায় আড়াই শ' বছর স্থায়িত্ব লাভকারী গ্রানাডা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ভরপুর। সম্পদ ও স্বচ্ছলতার প্রাচুর্যে পুরো দেশ যেন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সাধ্য ও সামর্থ্যের স্বল্পতা, পরিস্থিতির কঠোরতা এবং শত্রুর বিশালতা ও ভয়াবহতা সত্ত্বেও গ্রানাডা এ সময় বিজয় ও প্রভাব বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কিছু নমুনাও প্রত্যক্ষ করেছিল।

এই সংকটপূর্ণ কাল এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতার মাঝেও গ্রানাডা আপন

---

[৩৮৫] আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ৫৫৯-৫৬২।

Scanned with CamScanner

সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী সভ্যতার অগ্রযাত্রার মিছিলে শরীক হয়েছিল এবং উল্লেখযোগ্য কর্ম ও কীর্তির এমন কিছু বিচিত্র নমুনা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল, যা মুসলিম উম্মাহর মাঝে সুপ্ত ইসলামী চেতনা ও মর্ম-অনুভূতির পরিমাণ অনুসারে এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি অনুসারে মুসলিম উম্মাহর অপূর্ব প্রাণশক্তি এবং কর্মদক্ষতারই প্রমাণ বহন করে। মুসলিম জাতি কেবল গ্রানাডার ইতিহাসেই নয়; বরং সর্বযুগে সকল পরিবেশে নিজেদের শত্রুপক্ষ কর্তৃক যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিজেদের অবহেলা, শিথিলতা এবং ইসলামের কাঙ্ক্ষিত অনুপম মানবিক স্তর থেকে নিম্নগামিতার কারণে।[৩৮৬] এই আত্মত্রুটিই তাদের পতন ত্বরান্বিত করেছে, ইসলামের অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে, ইসলামী সভ্যতাকে নিষ্পেষিত করেছে এবং পরিণত করেছে এমন শুষ্ক ধুলিকণায়, বাতিলের ঝড়ো হাওয়ায় যা উড়ে গেছে নিমিষেই।

এ সময়কার গ্রানাডার মুসলমানদের প্রথম কীর্তি ছিল এই সঙ্গীন পরিবেশে অবশিষ্ট মুসলিম আন্দালুসকে রক্ষা করার জন্য সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মোটামুটি একটি মজবুত লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া। কিছু বিষয় তো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, চলমান সময়ের মহান ব্যক্তিগণ তা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন আর কিছু আবিষ্কার গ্রানাডা রাষ্ট্রের আমলেই, যার পেছনে অবদান ছিল গ্রানাডার যোদ্ধা প্রশিক্ষকগণের[৩৮৭], যারা বিভিন্ন বিজয়ের পাশাপাশি অনন্য বীরত্বের নমুনাও রেখে গেছেন।

কখনো সঙ্কীর্ণ, কখনো-বা বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক নির্মাণ ও বিনির্মাণের সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। আর এ বিষয়টিই কয়েক প্রজন্ম ধরে এই কঠিন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে গ্রানাডাবাসীকে অটল-অবিচল থাকতে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি তারা যেসব অঙ্গনের তত্ত্বাবধান করেছেন, তা জীবনের বিস্তৃত নানা ক্ষেত্রে সুবিশাল সভ্যতা বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, মাঝে মধ্যেই এই উপচে পড়া ধারায় অধোগমনও ঘটেছে।

---

[৩৮৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫০৯-৫১০ ও *আযহারুর রিয়ায*, ১/৫৩-৫৫।

[৩৮৭] مشيخة الغزاة বা যোদ্ধা প্রশিক্ষকগণের ইতিহাস এবং মুসলিম গ্রানাডা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৭/৩৬৬-৩৬৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৫২-৪৫৪।

Scanned with CamScanner

একাডেমিক জ্ঞানচর্চার বহুমুখী অঙ্গনে গ্রানাডা রাষ্ট্র উপহার দিয়েছে কালজয়ী নানা রচনাকর্ম, বিশাল বিশাল অভিসন্দর্ভ। পাশাপাশি গ্রানাডার আলিমসমাজ পূর্বতন আলিমগণের রেখে যাওয়া ইলমী মিরাসের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা থেকে উপকার অর্জনের কাজও করেছেন সফলতার সঙ্গে।

এ সময়কালে কর্ম ও কীর্তিতে উজ্জ্বল ব্যক্তিদের নামের দীর্ঘ তালিকার কিছু আমরা পেতে পারি ইবনুল খতীবের 'আলই'হাতা' ও মাক্কারীর 'নাফহুত তীব' গ্রন্থে। পাশাপাশি গ্রানাডার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন মাদরাসা ও বহুমুখী জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আবিষ্কৃত হয়েছিল নিত্য-নতুন সব সামরিক অস্ত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক ধরনের কামান, যা দিয়ে বিশেষ ধরনের গোলাকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করা যেত। এছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছিল বারুদকে নিক্ষেপক শক্তিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি। এসব আবিষ্কার গ্রানাডা থেকেই ইউরোপে আমদানি হত।[৩৮৮] মাদ্রিদের সামরিক জাদুঘরে এখনও সেসব বন্দুক সংরক্ষিত আছে, যেগুলো গ্রানাডার তৎকালীন মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত।

গ্রানাডায় শিল্পখাতেও বিভিন্নমুখী উন্নতি সাধিত হয়েছিল। গ্রানাডায় ছিল জাহাজ-নির্মাণ কারখানা, বস্ত্র-বুনন কারখানা, কাগজ ও স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত বিস্ময়কর মৃৎশিল্পের কারখানা।[৩৮৯] রং, চামড়া পরিশোধন, অলঙ্কার-শিল্পসহ জটিল ও নিপুণ বিভিন্ন শিল্পেও গ্রানাডা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে নানা আবিষ্কার। চাষাবাদ, সেচ পদ্ধতি, সেচ যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গ্রানাডার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

নির্মাণ ও স্থাপত্যের অঙ্গনেও গ্রানাডার ছিল উল্লেখযোগ্য পদযাত্রা। মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, ঘর-বাড়ি, সেতু ইত্যাদি বিভিন্ন শৈলীর স্থাপনা নির্মাণে গ্রানাডার অনন্য অবদান রয়েছে। বিশেষত নিপুণতা ও অনুপম কারিগরি দক্ষতার ধারক কারুকার্যে সমৃদ্ধ আলহামরা রাজপ্রাসাদের কথা না বললেই নয়, যা আজও পৃথিবীর বুকে অক্ষত আছে। এ ছাড়া এ সময়কালে দুর্গ, নগর-প্রাচীর

---

[৩৮৮] দেখুন : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২১১।
[৩৮৯] ইবনে বতুতা, *রিহলাতু ইবনি বতুতা*, ৪/২১৮।

Scanned with CamScanner

ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ারসহ বিভিন্ন সামরিক স্থাপনাও নির্মিত হয়েছিল।

গ্রানাডা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কীর্তি হল, এ সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিতেও বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল। সড়ক ও রাস্তা-ঘাট, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও উদ্যান-বাগান, সামাজিক ও জনহিতকর বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদির বিচারে গ্রানাডা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সুন্দরতম শহরগুলোর একটি। গ্রানাডায় তখন প্রায় দশ লক্ষ মানুষ বসবাস করত। ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রানাডা রফতানি করত বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী।

মানসিক ও নৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সেকালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর গ্রানাডার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। গ্রানাডায় নিয়মিত আয়োজন করা হত অশ্বচালনা ও অশ্ববিদ্যাসংক্রান্ত নানাবিধ কলা-কৌশল ও কসরতের মনোজ্ঞ প্রদর্শনী। এতে অশ্বচালনার নিপুণতা, ক্ষিপ্রতা ও বিভিন্ন রীতি প্রদর্শন করা হত, যা থেকে ইউরোপ অনেক কিছুই অর্জন করেছে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য

ইসলামী রাষ্ট্র গ্রানাডার ইতিহাসের এই জটিল ও কঠিন সময়কালের আলোচনা করার পূর্বে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণটি আন্দালুসে মুসলমানদের এই সর্বশেষ আশ্রয়স্থলটির দ্রুত পতন ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা দরকার মনে করছি। আর সে কার্যকারণটি ছিল দীর্ঘদিন ধরে বিবাদমান ও সংঘাতরত আন্দালুসের দুই পরাক্রান্ত খৃস্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টোলা ও অ্যারাজোনার ঐক্য ও একীভূত হওয়া।

উভয় রাষ্ট্র একই ধর্মবিশ্বাস ও একই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাত, যুদ্ধ ও অপরকে নিঃশেষ করার চেষ্টায় রত ছিল। অধিকাংশ লক্ষ্য ও স্বার্থের বিচারেও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মিল ছিল। উভয়ের সবচে' বড় লক্ষ্য ছিল যে কোন মূল্যে আইবেরিয়ান উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্বকে নির্মূল করা। কারণ, উভয় রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকগণের অন্তরেই এ ভয় ছিল যে, পূর্বের ন্যায় ইসলাম হয়তো আরও একবার আইবেরিয়ান উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে তাদের শাসনক্ষমতার সমাপ্তি।

৮৭৯ হিজরীতে (১৪৭৪ খৃস্টাব্দে) যখন ক্যাস্টোলা-শাসক চতুর্থ হেনরী মৃত্যবরণ করেন, মূলত তখন থেকেই উভয় রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ প্রতিভাত হতে থাকে। চতুর্থ হেনরীর মৃত্যু হলে ক্যাস্টোলা সিংহাসনকে ঘিরে জটিল এক সমস্যার উদ্ভব হয়। হেনরী কোন পুত্র সন্তান রেখে যাননি। উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন একমাত্র কিশোরী কন্যা জোয়ান্নাকে (Joanna)। অবশ্য জোয়ান্নার পিতৃত্বের বিষয়টিও যথেষ্ট ধোঁয়াশাপূর্ণ। জোয়ান্নার বংশীয় পরিচয় সম্বন্ধিত করা হত হেনরীর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডিউক ব্যাল্টরান ডি লা কুয়েভা (Beltrán de la Cueva)-এর দিকে। এ কারণেই জোয়ান্না পরিচিত ছিল 'জোয়ান্না লা ব্যাল্টরানিজা' (Joanna la Beltraneja) নামে।

Scanned with CamScanner

ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে জোয়ান্নার পক্ষে সমর্থন জানান। কিন্তু মৃত হেনরীর বোন রাজকুমারী ইসাবেলা ছিলেন এর বিরুদ্ধে। ক্যাস্টোলার জনগণের আবেগ-অনুভূতিও তার পক্ষে ছিল। অধিকন্তু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বড় একটি অংশ ছিল তার পক্ষে। এমনকি তার ভাই সদ্য মৃত হেনরীও মৃত্যুর পূর্বে সিংহাসনে ইসাবেলার অধিকারের বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন। ক্যাস্টোলার কার্টিজ (বিধানসভা)-ও ইতঃপূর্বে ১৪৬৮ খৃস্টাব্দে তার অপর ভাই আলফোন্সোর মৃত্যুর পরপরই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে ইসাবেলার অধিকারের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। সুতরাং হেনরীর মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ক্যাস্টোলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে রাজকন্যা ইসাবেলার অগ্রাধিকার নিয়ে কোন সংশয় ছিল না।

ইসাবেলা তার ভাইয়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে অ্যারাজোনার নৃপতি দ্বিতীয় জন-এর পুত্র এবং আপন চাচাতো ভাই যুবরাজ ফার্ডিনান্ড-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিবাহের পেছনেও আছে এক ইতিহাস। সংক্ষেপে এর বিবরণ হল, যেহেতু ইসাবেলার ক্যাস্টোলার সিংহাসন লাভের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, তাই প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর থেকেই তার প্রতি অনেকের দৃষ্টি ছিল। আরাজোনার তৎকালীন শাসক দ্বিতীয় জন পূর্ব থেকেই তার পুত্র ফার্ডিনান্ড-এর জন্য ইসাবেলার পানি প্রার্থনার আগ্রহী ছিলেন। কেননা, একে তো উভয় রাজপরিবারের মধ্যে পূর্ব থেকেই আত্মীয়তার দৃঢ় ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, অপরদিকে স্বাভাবিকভাবেই এর মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের ঐক্য ও একতার প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। এ কারণে ফার্ডিনান্ড ছিলেন ক্যাস্টোলা-রাজকন্যা ইসাবেলার প্রথম সারির পানিপ্রার্থীদের একজন। কিন্তু ইসাবেলার ভাই হেনরী ফার্ডিনান্ড-এর সঙ্গে তার বোনের বিয়েতে রাজী ছিলেন না।

ভবিষ্যতে ক্যাস্টোলার সিংহাসন দখল-প্রত্যাশী আরও অনেকেই এক্ষেত্রে ফার্ডিনান্ড-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাবাহ দুর্গের বিখ্যাত বীর ও পর্তুগালের রাজা আলফোন্সো। নৃপতি হেনরীও তার বোনকে রাবাহ দুর্গের এই বিখ্যাত বীরের সঙ্গে বিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তবে স্বয়ং

Scanned with CamScanner

ইসাবেলার এতে দ্বিমত ছিল। তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পর তার চাচা দ্বিতীয় জন যেসব কারণে এ বিয়েতে আগ্রহী ছিলেন, সেসব কারণেই আপন চাচাতো ভাই অ্যারাজোনার ফার্ডিনান্ডকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া পিতামহের দিক থেকে উভয়ের এক রাজপরিবারভুক্ত হওয়ার দিকটিও ইসাবেলাকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

নৃপতি হেনরী যেহেতু এ বিয়েতে রাজী ছিলেন না, তাই ইসাবেলা অত্যন্ত গোপনে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বিয়ের শর্তাবলি নির্ধারণ করেন। শর্তাবলির মধ্যে ছিল, ফার্ডিনান্ড ক্যাস্টোলার আইন-কানুন ও ঐতিহ্য-রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন, নিজের বসবাসের স্থান হিসেবে ক্যাস্টোলাকেই নির্বাচন করবেন, ইসাবেলার অনুমতি ছাড়া ক্যাস্টোলা ছাড়বেন না এবং রাষ্ট্রীয় যে কোন বিষয়ে ইসাবেলার অনুমতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিশেষভাবে ফার্ডিনান্ড-এর কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয় যে, তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুশেড যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন।

১৪৬৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে (৮৭৪ হিজরীতে) ইসাবেলার তৎকালীন আবাসস্থল ওয়ালিদ শহরে অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিতে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর কয়েকদিন পর ইসাবেলা তার ভাই হেনরীকে পত্রের মাধ্যমে নিজের বিয়ের বিষয়টি অবগত করেন এবং বর হিসেবে ফার্ডিনান্ডকে বেছে নেওয়ার কারণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

১৪৭৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হেনরীর মৃত্যুর পরপরই ইসাবেলার তৎকালীন আবাসস্থল শুকুবিয়াতে ইসাবেলাকে ক্যাস্টোলা ও লিওন সাম্রাজ্যের রানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আরও কিছু নগরী তার আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতি একেবারে নিষ্কণ্টক ছিল না। ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের একদল নীতি-নির্ধারক প্রয়াত সম্রাটের কন্যা জোয়ান্নার পক্ষাবলম্বন করে। এদিকে ইসাবেলার স্বামী যুবরাজ ফার্ডিনান্ডও ক্যাস্টোলার রাজপরিবারের একমাত্র পুরুষ উত্তরাধিকারী হিসেবে ক্যাস্টোলার সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু ইসাবেলা শক্ত হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি যৌথ রাজতন্ত্রের চর্চায় সম্মত হন। অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

ইসাবেলাই হবেন ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের মূল মালিকান, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তার মতামতই হবে চূড়ান্ত মত; তবে ফরমান জারী হবে উভয়ের নামে এবং রাষ্ট্রীয় মুদ্রাতে উভয়ের নাম উৎকীর্ণ থাকবে।

টলেডোর আর্চ বিশপের নেতৃত্বে এ সময় ইসাবেলার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ পর্তুগালের শাসক পঞ্চম আলফোন্সোর সঙ্গে সমঝোতা করে এবং জোয়ান্নাকে ক্যাস্টোলার সম্রাজ্ঞী পদে বসানোর জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, জোয়ান্না ছিল পঞ্চম আলফোন্সোর ভাগ্নি। ১৪৭৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে পর্তুগাল-নৃপতি আলফোন্সো ক্যাস্টোলা ভূমিতে হামলা চালান এবং ক্যাস্টোলার পাহাড়ী এলাকা সামুরা নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যান। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা দ্রুত তাদের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সামুরার পাশ্ববর্তী টেরো-র নিকটবর্তী এলাকায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে ক্যাস্টোলা বাহিনী প্রবল চাপের মুখোমুখি হয়ে পরাজয়ের উপক্রম হলেও পর্তুগাল-নৃপতি এর সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ কয়েক মাস উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে এবং শেষে ক্যাস্টোলা বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়।

পর্তুগিজ বাহিনীর পরাজয়ের ফলে ক্যাস্টোলার সিংহাসন নিয়ে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এরপর ১৪৭৯ খৃস্টাব্দে অ্যারাজোনার নৃপতি দ্বিতীয় জন মৃত্যুবরণ করেন। সিংহাসনে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ফার্ডিনান্ড। এর ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা দীর্ঘ সংঘাত ও হানাহানির পর দুই খৃস্টান রাষ্ট্র একীভূত ও এক সিংহাসনের শাসনভুক্ত হয়।

ক্যাথলিক ফার্ডিনান্ড নামে পরিচিত পঞ্চম ফার্ডিনান্ড যদিও রাজনীতি, প্রশাসন পরিচালন-নীতি ও সামরিক নীতিতে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু পাশাপাশি তিনি ছিলেন এমন একজন শাসনকর্তা, যার আপাত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ছিল তার স্বভাব-রীতি। নিজের আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে কোন পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত ছিলেন, চাই তা চারিত্রিক নীতিমালা, পৌরুষ ও বিশ্বস্ততার পূর্ণ বিরোধীই হোক না কেন; যেমনটি তার অতীত জীবনেতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে এবং সামনেও আন্দালুসের

Scanned with CamScanner

পরাজিত জাতির সঙ্গে তার কৃত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পাবে।

তার স্ত্রী রানী ইসাবেলা ছিলেন অত্যন্ত চৌকস মেধা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের অধিকারিনী। আপন কোমলতা ও কমনীয়তা, শোভন ও ভব্যতা এবং লাজুকতার মাধ্যমে তিনি ক্যাস্টোলার জনগণের আবেগ ও মুগ্ধতার জগতে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড গোঁড়া ও অন্ধ মনোবৃত্তি তার মধ্যে কাজ করত। পাশাপাশি তিনি সর্বদা একদল চরম সাম্প্রদায়িক অনুচর ও বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং তাদের নির্দেশনা ও প্ররোচনায় কাজ করতেন। আন্দালুসে ইসলাম ধ্বংস করার পরিকল্পনা এই খৃস্টান রানীর (যিনি ক্যাথলিক রানী পরিচয়েও খ্যাত ছিলেন) অন্তরে প্রচণ্ড নিকৃষ্ট ও হীনস্তরের সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছিল এবং তাকে স্প্যানিশ তদন্ত কমিশন (যা ভুলবশত The Tribunal of the Inquisition বা জেরা আদালত নামে পরিচিতি লাভ করেছে)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্ররোচিত করেছিল। খৃস্টবাদ সংরক্ষণের নামে এই কমিশন যত অপরাধ করত, তিনি তার সবকিছুকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতেন।

দুই গোঁড়া ক্যাথলিক রাষ্ট্র যখন এক পতাকাতলে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হয়, মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডা তখন প্রবেশ করে গৃহযুদ্ধের এক নতুন পরিক্রমায়। তৎকালীন গ্রানাডা-শাসক আবুল হাসান আলী বিন সা'দ ইবনুল আহমার রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে আমোদ-প্রমোদে ডুবে ছিলেন এবং ইসলাম ও ইসলামী ভূখণ্ডের এই চরম দুর্যোগ ও বিভক্তিকালীন সময়েও ভোগ-বিলাসের পেছনে অর্থ ও মেধা ব্যয় করছিলেন। আর তাই উভয় ক্যাথলিক রাষ্ট্র এক ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর কালবিলম্ব না করে গ্রানাডা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় মুসলিম আন্দালুস ও গ্রানাডার মুসলমানদের জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়।[৩৯০]

---

[৩৯০] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/১৮০-১৮৫।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
গ্রানাডা-অভ্যন্তরে সংঘাত[৩৯১]

গ্রানাডার পতনের প্রায় ছাব্বিশ বছর পূর্বে ৭৮১ হিজরীতে (১৪৬৭ খৃস্টাব্দে) গ্রানাডার শাসনকর্তা ছিলেন আবুল হাসান আলী বিন সা'দ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার। গ্রানাডার শাসকগণের প্রথা অনুযায়ী তার উপাধি ছিল গালিব বিল্লাহ[৩৯২]। তার এক ভাইয়ের নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ এবং তার উপাধি ছিল যাগ্‌ল (যাগ্‌ল শব্দের অর্থ বীর সাহসী)। অর্থাৎ এক ভাই ছিলেন গালিব বিল্লাহ বা আল্লাহর দয়ায় বিজয়ী আর অপর ভাই ছিলেন যাগ্‌ল বা সাহসী।

বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গের মতো এ দু' ভাইও দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ক্ষমতা নিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং দুই প্রবল ক্ষমতাধর খৃস্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টোলা ও অ্যারাজোনা দ্বারা পরিবেষ্টিত দুর্বল ও ভগ্নপ্রায় গ্রানাডা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হন।

---

[৩৯১] প্রসঙ্গত আমরা অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান সাহেবের, যিনি আন্দালুস-ইতিহাসের এই চূড়ান্ত অধ্যায়টুকুর প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহকে ইতিহাসের গহীন অন্ধকার থেকে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। এক্ষেত্রে তার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। কেননা, ইতিহাসের এ অংশটির আলোচনা আরবী উৎসগ্রন্থগুলোতে একেবারেই বিরলপ্রায়। তাই এক্ষেত্রে প্রফেসরের আলোচনাকে মূল উৎসের স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। তিনিই প্রথম নাগালভুক্ত ও সম্ভাব্য যাবতীয় ইংরেজি ও ক্যাস্ট্রোলিক বর্ণনাসমূহকে সামনে রেখে এ সময়কালের ঘটনাপ্রবাহের যোগসূত্র স্থাপন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। অধিকন্তু তিনি স্পেন, মরক্কো এবং তৎকালীন আন্দালুস ও মাগরেবের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে আরবী ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন হস্তলিখিত নথিপত্র খুঁজে বের করেছেন এবং আপন গবেষণাকর্মে সেগুলো থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তার এই অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টার পর যিনিই ইতিহাসের এ অধ্যায় নিয়ে কলম ধরবেন, নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, তাকে প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনানের গবেষণা-কর্মের ওপর নির্ভর করতে হবে।

[৩৯২] গ্রানাডায় বনু আহমার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন নাস্‌রের উপাধিও ছিল আলগালিব বিল্লাহ আর এই সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলীর উপাধিও ছিল আলগালিব বিল্লাহ! আবু আবদুল্লাহ পরবর্তীতে স্প্যানিশ ইতিহাসে 'কিশোর শাসক' নামে খ্যাতি লাভ করেন। প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান আবু আবদুল্লাহর এই উপাধি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, এটি ছিল গ্রানাডার অন্যান্য শাসকবর্গেরও প্রতীক।

Scanned with CamScanner

রীতি মেনেই যেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ যাগ্‌ল তার ভাই গালিব বিল্লাহর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে ক্যাস্টোলা-শাসকের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এর পরপরই উভয়ের মধ্যে ঘোরতর লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সন্ধির মাধ্যমে দু' ভাইয়ের এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু হায় আফসোস! তারা উভয়ে সন্ধি করেন এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। সন্ধি হয় গ্রানাডার উত্তর অংশ, যা রাষ্ট্রের মূল প্রদেশও বটে, এর কর্তৃত্ব থাকবে গালিব বিল্লাহর হাতে আর মালাগা ও অন্যান্য প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ অংশের নিয়ন্ত্রণভার থাকবে আবু আবদুল্লাহ যাগ্‌ল-এর হাতে।[৩৯৩]

এই বণ্টনের তিন বছর পর ৮৭৪ হিজরীতে (১৪৬৯ খৃস্টাব্দে) মুসলিম আন্দালুসের ভাগ্য বিপর্যয়কর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে; অ্যারাজোনার যুবরাজ পঞ্চম ফার্ডিনান্ড বিয়ে করেন ক্যাস্টোলা-সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিপতি ইসাবেলাকে। এর ফলে উভয় রাষ্ট্রের এক হওয়ার পথ সুগম হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটে। ১৪৭৯ খৃস্টাব্দে বাস্তবেই উভয় রাষ্ট্র একীভূত হয়ে স্প্যানিয়া রাষ্ট্র নাম ধারণ করে। উভয় ক্যাথলিক রাষ্ট্রের এই সম্মিলন মূলত ছিল গ্রানাডার শেষের শুরু।

গালিব বিল্লাহর প্রদেশে পারিবারিক সংঘাত

অপরদিকে এই একই সময়ে অর্থাৎ ৮৭৯ হিজরীতে (১৪৭৪ খৃস্টাব্দে) গ্রানাডা ছিল দু'টি অংশে বিভক্ত। এক অংশ ছিল যাগ্‌লের দখলে, অপর অংশ গালিব বিল্লাহর দখলে। এ সময় গ্রানাডায় এক প্রবল বন্যা হয়। আর এই বন্যার সময় থেকেই শুরু হয় গালিব বিল্লাহর অনাচার। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন আমোদ-প্রমোদ ও নর্তকী নারীর প্রণয়ে; ঝুঁকে পড়েন বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে; সেনাবাহিনী ও বিখ্যাত সব বীর সেনাপতিদের শেষ করে ফেলেন; জনগণের ওপর কর ও জরিমানার হার বাড়িয়ে দেন; বাজার-ঘাটের ওপর উচ্চহারে খাজনা আরোপ করেন, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকেন। গালিব বিল্লাহ রাষ্ট্রীয় মঞ্জুরী প্রদানে কার্পণ্য করতে থাকেন। এ ধরনের আরও অনেক এমন সব কাজ তিনি করতে থাকেন, যা করে কেউ কোন দিন রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। আবুল হাসান গালিব বিল্লাহর

---

[৩৯৩] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/১৯৪।

Scanned with CamScanner

জনৈক উযীর তার এসব কাজে সমর্থন করত এবং মানুষের সামনে তাকে সৎ ও নিষ্কলুষ শাসকরূপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করত।

আবুল হাসানের অসংখ্য অনাচারের একটি হল, তিনি তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে সুরাইরা নাম্নী এক খৃস্টান নারীর প্রণয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন এবং তার কারণে নিজের স্ত্রী (যিনি তার চাচাতো বোন ছিলেন) ও সন্তানদের ত্যাগ করেছিলেন। এভাবেই গ্রানাডার পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিল আর শাসক আবু আবদুল্লাহ মগ্ন ছিলেন আমোদ-প্রমোদ ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে।

তার উযীর তার ভোগের ব্যয়ভার উসুল করছিল জনগণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। উযীর জনগণের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ প্রদান করত তাদেরকে, যারা এর হকদার নয়; আর প্রকৃত হকদার যারা, তারা সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছিল। বীর-লড়াকু সৈনিকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পূর্ণ অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছিল। তাদের কোন প্রকার সরকারী বেতন-ভাতা প্রদান করা হত না। ফলে সৈনিকগণ বাধ্য হয়ে তাদের সামরিক পোশাক, অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে দেয় এবং অর্জিত অর্থ দিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়।

এই দুষ্ট উযীর গ্রানাডা ও আশেপাশের বিভিন্ন দুর্গের অধিনায়ক, সেনাপতি, নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেছে বেছে হত্যা করে। রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেনাবাহিনী শেষ হয়ে যাচ্ছে আর শাসক আবুল হাসান তখনও নিমজ্জিত আপন আমোদ-প্রমোদে। একসময় শেষ হয়ে যায় খৃস্টানদের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তির মেয়াদ। কিন্তু শাসক-উযীর কারোরই এ বিষয়ে কোন অনুভব-অনুভূতিই যেন নেই। অবশেষে যখন খৃস্টান বাহিনী হিম্মাহ শহরে প্রবেশ করে, তখন যেন সবার হুঁশ হয় যে, চুক্তির মেয়াদ তো শেষ হয়ে গেছে![৩৯৪]

গ্রানাডার সুলতান খৃস্টান নেতাদের মাঝে চলমান মতবিরোধ ও সংঘাতের ওপর ভরসা করে মনোতুষ্টিতে ভুগছিলেন। খৃস্টান নেতৃবৃন্দ কেউ কর্ডোভা, কেউ সেভিল, কেউবা শারিশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। আর এ সুযোগে সুলতান আবুল হাসান দেশের দায়িত্ব ভুলে ডুবে গিয়েছিলেন আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসী জীবনে। সেনাবাহিনীকে তিনি একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে

---

[৩৯৪] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ৪৫-৫০।

Scanned with CamScanner

দিয়েছিলেন উযীরের হাতে। নিজে চলে গিয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। রাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভাবখানা এমন যে, তাকদীরে যা আছে, তা-ই হবে। জনসাধারণের ওপর বিশাল অংকের করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জুলুম-নিপীড়নে দেশের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আবুল হাসান গ্রানাডার সুদক্ষ ও বিচক্ষণ সব সেনাপতিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আন্দালুসের খৃস্টান জাতি তার দেশে কখনোই হামলা করবে না। তাদের মধ্যে বিদ্যমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হানাহানি-সংঘাত কখনোই শেষ হবে না। কিন্তু এরপরই ক্যাস্টোলা-শাসক দীর্ঘ যুদ্ধের পর তার দেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হন। বিরোধী সকল খৃস্টান নেতৃবৃন্দ এবার তার অনুগত্য গ্রহণ করে নেয়। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হয় এবং গ্রানাডা দখলের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।[৩৯৫]

গ্রানাডার শাসক আবুল হাসান গালিব বিল্লাহর স্ত্রীর নাম ছিল আয়েশা। ইতিহাসে তিনি আয়েশা আলহুররা (স্বাধীনচেতা আয়েশা) নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। অপরদিকে তার সুরাইয়া নাম্নী এক খৃস্টান ক্রীতদাসী ছিল। তিনি এ দাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।[৩৯৬]

গালিব বিল্লাহর অনাচারের কথা উল্লেখ করে তার সমকালীন জনৈক ঐতিহাসিক *'নুবযাতুল আছর'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> আবুল হাসানের অনাচার এ পর্যায়ে পৌঁছল যে, তিনি তার স্ত্রীর ওপর খৃস্টান দাসীকে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন এবং স্ত্রী-সন্তানকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। স্বাভাবিকভাবেই একজন সতী নারী হিসেবে আবুল হাসানের মহীয়সী স্ত্রী আয়েশার আত্মমর্যাদাবোধে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল ও বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছল। দু' পুত্র মুহাম্মাদ ও ইউসুফ স্বাভাবিকভাবেই মায়ের পক্ষ নিল।
>
> সুলতান আবুল হাসান ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী ও কঠোর প্রকৃতির মানুষ। তাই মা আয়েশা তার পুত্রদ্বয়ের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কিছুদিন এভাবেই কেটে গেল। আবুল হাসান আগের

---

[৩৯৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫১১-৫১২।

[৩৯৬] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২০০।

Scanned with CamScanner

মতোই আমোদ-প্রমোদ ও দাসীর প্রণয়ে ডুবে রইলেন। আজ (৮৮৭ হিজরীর ২৭ জুমাদাল উলা) লোশা এলাকা থেকে সংবাদ এসেছে, আবুল হাসানের দু' পুত্র মুহাম্মাদ ও ইউসুফ তাদের পিতার ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। কিছু দুষ্ট লোক তাদের মাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং এ কথা বুঝিয়েছে যে, তারা এখানে থাকলে তাদের পিতার অনিষ্টের শিকার হবে। তারা তাকে তার ও খৃস্টান বাঁদীর মধ্যকার বিদ্বেষের কথা বলে বিভ্রান্ত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

রাতের আঁধারে তিনি তার পুত্রদ্বয়কে বাইরে বের করে দিলেন। সেসব লোক তাদেরকে নিয়ে ওয়াদিয়ে আশ পৌঁছলে ওয়াদিয়ে আশের অধিবাসীগণ যুবরাজদ্বয়কে তাদের এলাকায় অবস্থানের অনুরোধ জানাল। পরবর্তী সময়ে গ্রানাডাবাসীও তাদের দু'জনের পক্ষ নিল। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে এক কঠিন ফিতনার উদ্ভব হল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে হানাহানি, যুদ্ধ ছাড়াও এমন সব ঘটনা ঘটল, নিকৃষ্ট সেসব আলোচনা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো মনে করছি। কেননা, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত এত দূর গড়িয়েছে যে, পিতা তার পুত্রকে হত্যা করেছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত এ ফিতনার আগুনে আন্দালুস এখনও জ্বলছে, আর ইসলামের শত্রুরা -আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন- আন্দালুস দখলের পাঁয়তারা করছে। তারা অপেক্ষা করছে কালের সহায়তার এবং তাকদীরের আনুকূল্যের।[৩৯৭]

প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান নির্ভরযোগ্য আরবী বর্ণনা ও ক্যাস্টোলার ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের আলোকে এ সময়ের ঘটনাপ্রেক্ষাপটকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও চমৎকার ভাষায় ধারাবর্ণনার শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন,

গ্রানাডা-পতনের ঘটনাপ্রবাহে আয়েশা আলহুররার চরিত্র এক বিশেষ উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে রেখেছে। অবশ্য আন্দালুসের এই শেষ সময়ের ট্রাজেডিক ইতিহাসে মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধা অর্জন করার মতো চরিত্রের বড় অভাব। এই মহীয়সী ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত রানীর আলোচনা দুঃখ ও অনুতাপের এক অনন্য উপাখ্যান, যা আমাদেরকে

---

[৩৯৭] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ৪৬-৬২। আরও দেখুন মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫১২-৫১৪।

Scanned with CamScanner

এ মহীয়সী নারীর অনন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অত্যুজ্জ্বল অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় দুর্যোগ ও পতনের এই কঠিন সময়েও তার অভূতপূর্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা। এ ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতার উপাখ্যান আমরা কেবল প্রাচীন আমলের রূপকথার বিভিন্ন চরিত্রের ক্ষেত্রেই পড়ে এসেছি। ... আয়েশা হুররা এমন এক সময়ে গ্রানাডার রানী ছিলেন, যখন গ্রানাডার ইসলামী রাষ্ট্র মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছিল এবং নিভে যাওয়ার পূর্বে শেষবারের মতো অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল। ... রানী আয়েশা স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করেছিলেন যে, শাসনভারের আগামী উত্তরাধিকারী তার পুত্রই হবেন। কিন্তু এর পরই এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যা তার এই স্বপ্নকে কঠিনভাবে চোখ-রাঙানি দিচ্ছিল।

সুলতান আবুল হাসান তার শেষ জীবনে বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদে ডুবে গেলেন এবং দ্বিতীয়বারের মতো তার এক সুন্দরী খৃস্টান বাঁদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন। ইসলামী ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এই খৃস্টান বাঁদীটির নাম সুরাইয়া উল্লেখ করা হলেও স্প্যানিশ বর্ণনাগুলোতে তার খৃস্টীয় নাম ইসাবেলা উল্লেখ করা হয়েছে। ... সুলতান তার প্রতি পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। এরপর তিনি তার পূর্বতন স্ত্রী আয়েশাকে বাদ দিয়ে সুরাইয়াকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রানী আয়েশা তখন আয়েশা আল্‌হুররা নামে পরিচিত ছিলেন। হয়তো এর মাধ্যমে আবুল হাসানের অপর স্ত্রী খৃস্টান বাঁদীর সঙ্গে পার্থক্যকরণ উদ্দেশ্য ছিল, কিংবা তার নিষ্কলুষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে হুররা বা স্বাধীনচেতা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ... সুলতান আবুল হাসান ততোদিনে বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বয়সের ভারে অনেকটা কাবু হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি তার তরুণী ও সুন্দরী স্ত্রীর হাতের সহজ ঘুঁটিতে পরিণত হলেন। সুরাইয়া একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, অপরদিকে ছিল ধূর্ত, চতুর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। গ্রানাডার রাজপ্রাসাদে এই বিদেশিনী রানীর উপস্থিতি এবং সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক বিষয়ে তার অযাচিত হস্তক্ষেপ ছিল এই কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলামী রাষ্ট্রটির জন্য বিবাদ-বিসংবাদ ও

Scanned with CamScanner

মারাত্মক হানাহানি সৃষ্টির এক নতুন কার্যকারণ।

সুরাইরা বৃদ্ধ সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে মূলত অনেক সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টায় ছিল। সতীন আয়েশার মতো তার উদর থেকেও সুলতান আবুল হাসানের দু'টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম যথাক্রমে সা'দ ও নাস্‌র। তার পরিকল্পনা ছিল এদের কোন একজনকে আবুল হাসানের পরবর্তী সুলতান হিসেবে সিংহাসনের অধিকারী করা। রানী আয়েশাকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে দূরে রাখতে এবং তার দু' পুত্র মুহাম্মাদ ও ইউসুফকে রাজ-অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে সুরাইয়া তার সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের ষড়যন্ত্র, গোপনে সুলতানের কানভারী করা, তাকে প্ররোচিত করা ইত্যাদি সবকিছু করে যেতে থাকল।

আয়েশার বড় পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ছিল সিংহাসনের মনোনীত যুবরাজ (ওলিয়ে আ'হদ)। গ্রানাডার বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমর্থনও ছিল তার প্রতি। কিন্তু সুরাইয়া এতে মোটেই হতোদ্যম হল না এবং তার প্রচেষ্টা বন্ধও করল না। সে আবুল হাসানকে এমনভাবে কাবু করে ফেলল যে, সুলতান তার কথাতেই উঠতে বসতে লাগলেন এবং স্ত্রী আয়েশা ও তার দু' পুত্রকে সব ধরনের মায়া-মমতা ও তত্ত্বাবধান থেকে দূরে ঠেলে দিলেন।

এরপর সুরাইয়া তার হীনচেষ্টা আরও জোরদার করলে সুলতান তাদেরকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন এবং আয়েশাকে তার দু' পুত্রসহ আলহামরার সবচে' সুরক্ষিত বুরুজ কামারিশ বুরুজের বন্দীশালায় নিক্ষেপ করলেন। তাদের ওপর কঠিন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হল এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠোর ও নির্দয় আচরণ করা হল।

শরীয়তের বিচারে প্রকৃত রানী আয়েশা ও তার পুত্রদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও সমর্থন দানের মাধ্যমে যারা তাদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, সেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবুল হাসানের এসব আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। গ্রানাডা-সমাজে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও সেনাপতিগণ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন; একদল বৈধ রানী ও তার পুত্রদ্বয়ের পক্ষে, আরেকদল সুলতান ও তার উপপত্নীর পক্ষে। বেশ কয়েকদিন

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় দলটি একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে গেল। হিংসা-বিদ্বেষ ও স্বার্থ উদ্ধারের হীন প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আবুল হাসান ও তার উপপত্নী সুরাইয়ার প্রতি জনসাধারণের ক্রোধ চরমে পৌঁছল। ততদিনে সুরাইয়া হয়ে উঠেছেন গ্রানাডার আসল রানী; প্রশাসনের সকল বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সব ক্ষেত্রে নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন।

এরপর সুরাইয়ার অবাধ্য আচরণ চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছল। সে তার পথের কাঁটা যুবরাজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য সুলতান আবুল হাসানকে প্ররোচিত করতে লাগল। কিন্তু রানী আয়েশা ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বীরঙ্গনা নারী। তিনি কিছুতেই নতি স্বীকার করলেন না। ... তিনি তার সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এদের অগ্রভাগে ছিল গ্রানাডার প্রভাবশালী গোষ্ঠী বনু সিরাজ। রানী আয়েশা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পলায়ন ও প্রতিশোধের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। বনু সিরাজের এই অবস্থানের কারণে সুলতান আবুল হাসান তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করেননি। কথিত আছে, তিনি আলহামরার একটি হলরুমে ডেকে এনে তাদেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

রানী আয়েশা তার শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে সুলতানের মনোবাঞ্ছার কথা জানতে পেরে দ্রুত তার দু' পুত্রকে নিয়ে যে কোন উপায়ে আলহামরার বন্দীশালা থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ৮৮৭ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের (১৪৮২ খৃস্টাব্দের) এক রাতে রানী আয়েশা তার দু' পুত্রকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেন। ... রানী আয়েশার নাম, তার উন্নত চরিত্র, অভূতপূর্ব বীরত্ব, তার পলায়নের দুঃসাহসিক কাহিনী প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত ও বিমুগ্ধ করে। তার পুত্র যুবরাজ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ওয়াদিয়ে আশ অঞ্চলে মজবুত ঘাঁটি গড়ে তোলেন। কারণ, তার অধিকাংশ সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী ছিল এ অঞ্চলের। রানী ও তার দু' পুত্রের পলায়নের সময় সুলতান আবুল হাসান গ্রানাডা থেকে দূরে লোশার নগর-প্রাচীরের কাছে খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণ-প্রতিরোধে ব্যস্ত ছিলেন। ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন যেন এক নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করছিল।[৩৯৮]

---

[৩৯৮] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/১৯৬-২০১।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম ফার্ডিনান্ড ও বিভেদ-সংঘাতের সদ্ব্যবহার

গ্রানাডায় মুসলমানদের যখন এই পরিস্থিতি, খৃস্টান নরপতি পঞ্চম ফার্ডিনান্ড এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন এবং আত্মঘাতী হানাহানিতে আক্রান্ত গ্রানাডার দুর্গগুলোতে হামলা শুরু করলেন। বেশ কয়েকটি এলাকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ক্যাস্টোলা বাহিনীর যুদ্ধ হল। কিছু যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করল, কিছু যুদ্ধে পরাজিত হল। এসব পরাজয়ের পেছনে শত্রুপক্ষের শক্তি যতটা না ভূমিকা রেখেছিল, তার চেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল শাসক আবুল হাসানের বিলাসী জীবন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে উদাসীনতার কারণে সৃষ্ট নিজেদের সামরিক দুর্বলতা। সাধারণ জনগণ আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছিল।

এরপর একের পর এক বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনায় দ্রুত পরিস্থিতির পট পরিবর্তন ঘটল। গ্রানাডায় সংঘটিত এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন এবং তার পিতা আবুল হাসান পালিয়ে মালাগায় তার ভাই যাগ্‌লের কাছে চলে গেলেন। মালাগায় যাগ্‌ল খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। এসব যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনী তাদের প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ-সামগ্রীই হারায়নি; বরং কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতিসহ প্রচুরসংখ্যক সৈন্যও হারিয়েছিল। এদিকে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই আবু আবদুল্লাহও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-তৎপরতা শুরু করলেন। তিনি খৃস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে খৃস্টান-ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন। প্রচুর গনীমতসহ প্রত্যাবর্তনের পথে খৃস্টান বাহিনী তার ফেরার পথ বন্ধ করে দিল। ইলইয়াস্‌নার নিকটবর্তী স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হল। মুসলিম আমীর আবু আবদুল্লাহ খৃস্টান বাহিনীর হাতে বন্দী হলেন।[৩৯৯]

আবু আবদুল্লাহ বন্দী হওয়ার পর তার পিতা আবুল হাসান পুনরায় গ্রানাডায়

---

[৩৯৯] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ৫০-৬৭, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫১২-৫১৫, ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২০১-২০৩ ও মাহমুদ আলী মক্কী, *আততারীখুস সিয়াসী লিল আন্দালুস*, পৃ : ১৩ (*আলহাযা-রাতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া ফিল আন্দালুস*-গ্রন্থে প্রকাশিত, সম্পাদক: সালমা আলখাযরা আলজুয়ূসী)।

Scanned with CamScanner

ফিরে এলেন এবং নতুন করে শাসনভার গ্রহণ করলেন। তবে বার্ধক্য ও অসুস্থতা তাকে কাবু করে ফেলেছিল। মৃগী রোগ-জাতীয় এক ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন। এরপর তার শরীরও অবশ হয়ে গেল। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা তাকে বিভিন্ন বিপদ দিয়ে শাস্তি দিলেন। বাধ্য হয়ে তিনি তার ভাই মুহাম্মাদ বিন সা'দ যাগ্‌লের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। এরপর তাকে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় মানকিব শহরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করলেন।[৪০০]

আবুল হাসান পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার পুত্র আবু আবদুল্লাহকে মুক্ত করার চেষ্টাও করেছিলেন। তবে এর পেছনে সন্তানের প্রতি মায়া-মমতার কোন ভূমিকা ছিল না; বরং পুত্রকে নিজের আয়ত্তে রাখতে এবং তার দিক থেকে আশঙ্কামুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ মুক্তিপণ প্রদান ও গ্রানাডায় বন্দী বেশ কয়েকজন খৃস্টান সেনাপতিকে ফেরত প্রদানের বিনিময়ে আবু আবদুল্লাহকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পঞ্চম ফার্ডিনান্ডকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চম ফার্ডিনান্ড তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে বন্দী করে রাখার দিকটিকেই প্রাধান্য দেন।

এদিকে রানী আয়েশাও তার পুত্রকে উদ্ধার করার জন্য তার সমর্থকদের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালালেন। তিনি খৃস্টান রাজা মেনে নেবেন এমন কিছু প্রস্তাবসহ উযীর ইবনে কুমাশার নেতৃত্বে মুক্তি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলেন। অবশেষে অতি গোপনে বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হল। শর্তাবলির মধ্যে ছিল– আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ড ও তার স্ত্রী ইসাবেলার আনুগত্যের স্বীকৃতি দেবেন, প্রতিবছর তাদেরকে কর বাবদ বার হাজার গাধার মূল্যের স্বর্ণ প্রদান করবেন, এখনই গ্রানাডায় বন্দী খৃস্টানদের মধ্য হতে ক্যাস্টোলা-শাসকের বাছাই করা চার শ' বন্দীকে মুক্তি দেবেন, এরপর আগামী পাঁচ বছর প্রতিবছর সত্তরজন করে বন্দীকে মুক্তি দেবেন এবং এসব প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিশ্চয়তা হিসেবে আবু আবদুল্লাহ তার বড় পুত্র ও বেশ কয়েকজন

---

[৪০০] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ৬৭-৬৮, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫১৫ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২০৪।

Scanned with CamScanner

আমীরের সন্তানকে জামিন হিসেবে রাখবেন। বিপরীতে ক্যাস্টোলার শাসকদ্বয় প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা আবু আবদুল্লাহকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবেন, আবু আবদুল্লাহকে রাষ্ট্রীয় কাজে ইসলামী শরীয়তের বিরোধী কোন কিছু করতে বাধ্য করবেন না, গ্রানাডার অভ্যন্তরে বিদ্রোহরত নগরীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় তারা আবু আবদুল্লাহকে সহায়তা করবেন এবং সে নগরীগুলো বিজিত হলে মূল গ্রানাডার মতো সেগুলোও ক্যাস্টোলা সরকারের বশংবদ থাকবে আর সুলতান আবু আবদুল্লাহর মুক্তির তারিখ হতে পরবর্তী দু' বছর এ সন্ধিচুক্তি বলবৎ থাকবে।[৪০১]

স্পেন নৃপতি এবং অবশিষ্ট গ্রাস কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা

গ্রানাডা-পরিস্থিতিতে এখন দৃশ্যপটে আছেন আবু আবদুল্লাহ আসসগীর, তার হাতে আছে গ্রানাডার নেতৃত্ব; আছেন যাগ্‌ল, তার হাতে আছে ওয়াদিয়ে আশ-এর নেতৃত্ব এবং আছেন স্পেন-নৃপতি পঞ্চম ফার্ডিনান্ড, যার অধিকারে আছে মালাগা। নিজের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে ৮৯৫ হিজরীতে (১৪৯০ খৃস্টাব্দে) স্পেন-নৃপতি মালাগা থেকে ভূমধ্যসাগর উপকূলীয় শহর আলমারিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মালাগা থেকে আলমারিয়ার পথের সব গ্রাম ও দুর্গ তিনি দখল করে নিলেন। আলমারিয়াবাসীও তার কাছে আত্মসমর্পণ করল। মুসলমানগণ আপন আপন নগরী রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তুলল। কিন্তু সাধ্য ও যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা তাদেরকে অসহযোগিতা করল এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যতীত তাদের কপালে আর কিছুই জুটল না।[৪০২]

এরপর পঞ্চম ফার্ডিনান্ড সেখান থেকে যাগ্‌লের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়াদিয়ে আশ-এর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। যাগ্‌ল দেখলেন, তিনি খৃস্টান বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং আপন রাষ্ট্রকে রক্ষা করার সামর্থ্য তার নেই। তিনি যেসব মুসলিম শাসকদের কাছে সাহায্য চাওয়া সম্ভব, সবার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কে শোনবে তার আর্তনাদ! খৃস্টান বাহিনী ওয়াদিয়ে আশ-ও দখল করে নিল।[৪০৩]

---

[৪০১] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২০৪-২০৫।

[৪০২] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ৯৮, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২২ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২২৬-২২৭।

[৪০৩] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ৯৯-১০১, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২২-৫২৪ ও ইনান,

Scanned with CamScanner

এর ফলে গ্রানাডা নগরী ও সংলগ্ন গ্রামসমূহ সবদিক থেকে খৃস্টান বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সবদিক থেকে খৃস্টান বাহিনী গ্রানাডা ঘিরে ফেলল। গ্রানাডাবাসীর অবস্থা দাঁড়াল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পূর্বাভাসের বাস্তব রূপ–

«يُوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»

শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন বিভিন্ন জাতিবর্গ তোমাদের বিরুদ্ধে ডাকাডাকি করবে, যেমন একে অন্যকে ডেকে আনে দস্তরখানে।

নবীজী এ কথা বলার পর উপস্থিত জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, তখন কি সংখ্যাস্বল্পতার দরুণ আমরা এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হব? নবীজী উত্তর দিলেন,

«بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ»

না; বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় থাকবে অনেক। কিন্তু তোমরা হবে ঢলে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো। আল্লাহ তাআ'লা অতি অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রভাব-ভীতি তুলে নেবেন এবং আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহ্ন' (অক্ষমতা) ঢেলে দেবেন।

এরপর জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'ওয়াহ্ন' (দ্বারা) কী (উদ্দেশ্য)? নবীজী উত্তর দিলেন,

«حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»

দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যু-বিতৃষ্ণা।[৪০৪]

খৃস্টান রাজন্যবর্গ তৎকালীন অতিক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র গ্রানাডার চারপাশে সমবেত হল। (ক্যাস্টোলা ও অ্যারাজোনার মিলিত রাষ্ট্র) স্পেনের নৃপতি ফার্ডিনান্ড গ্রানাডার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বুরুজ বা টাওয়ার দখল করে নিলেন। একটি হল গ্রানাডার সমুদ্রজাহাজ পর্যবেক্ষণের টাওয়ার, আরেকটি হামাদান গ্রামের টাওয়ার। উভয় টাওয়ারই বেশ বড় ও সুরক্ষিত ছিল। পঞ্চম

দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, ৭/২২৭-২২৮।

[৪০৪] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ৪২৯৭।

Scanned with CamScanner

ফার্ডিনান্ড টাওয়ারদু'টির নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও মজবুত করলেন এবং গ্রানাডাবাসীর ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র মজুতকরণের পাশাপাশি নিজ সৈন্যদের সেখানে এনে জড়ো করলেন। গ্রানাডা নগরী ছিল টাওয়ারদু'টি থেকে একেবারে সন্নিকটে। তাই এগুলো থেকে গ্রানাডাবাসীর ওপর চাপ বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিক নথি-পত্রের ভাষ্য অনুসারে ৮৯৫ হিজরীর শুরুতে (১৪৮৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) উভয় রাষ্ট্রের শাসকবর্গের মাঝে নতুন আরেকটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। স্বয়ং সুলতান আবু আবদুল্লাহ কর্তৃক জারীকৃত ৮৯৫ হিজরীর মুহাররম মাসের (১৪৮৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের) একটি সরকারী ফরমানে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরমানটি আজিজার নগরীর সেনাপতি ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আবু আবদুল্লাহ ফরমানে বিশেষভাবে দু' বছরের জন্য নতুন করে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে 'সৌভাগ্যপূর্ণ সন্ধিচুক্তি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং এ চুক্তিতে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও এ চুক্তির বিস্তারিত ভাষ্য আমাদের জানা নেই; কিন্তু ক্যাস্টোলা-ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনামতে আবু আবদুল্লাহ চুক্তিতে এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বাসতা, আলমারিয়া ও ওয়াদিয়ে আশ-এর আত্মসমর্পণের পর তিনি নিজেই গ্রানাডা রাষ্ট্রকে ক্যাথলিক শাসকদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করবেন। যাই হোক, ১৪৯০ খৃস্টাব্দের শুরুতে (৮৯৫ হিজরীর সফর মাসে) ক্যাথলিক রাজা-রানী সুলতান আবু আবদুল্লাহর কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে গ্রানাডা সমর্পণের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অবশ্য তারা এবার পুরো গ্রানাডার নিয়ন্ত্রণ দাবি করলেন না; দাবি করলেন কেবল গ্রানাডা-সুলতানের রাজপ্রাসাদ ও প্রশাসনিক কেন্দ্র আলহামরা নগরীর নিয়ন্ত্রণ।

ক্যাথলিক শাসকদ্বয়ের দাবির উত্তরে আবু আবদুল্লাহ

আবু আবদুল্লাহর পূর্ব-ভূমিকা ও অবস্থানই মূলত ক্যাথলিক শাসকদ্বয়কে এরূপ নতি স্বীকারের দাবি জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটল সম্পূর্ণ উল্টো। ৮৯৫ হিজরীর ২৯ সফর (১৪৯০ খৃস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি) সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার সেনাপতি আবু কাসেম আলমুলীহকে একটি বার্তাসহ ক্যাথলিক শাসকদ্বয়ের কাছে প্রেরণ করলেন। যদিও পত্রের ভাষা ছিল সংযত ও মার্জিত এবং বার্তা শেষ হয়েছিল আনুগত্য প্রকাশক

Scanned with CamScanner

শব্দাবলির মাধ্যমে; কিন্তু বার্তাটির সারমর্ম ছিল তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান। কিন্তু এরপরও ক্যাথলিক শাসকদ্বয় বারবার আলহামরার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানাতে লাগলেন।

বাধ্য হয়ে আবু আবদুল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মনস্থ করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে সময় নিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলার অনুরোধ করলেন। এরপর সুলতান আবু আবদুল্লাহ খৃস্টান শাসকদ্বয়কে এ দাবি পরিত্যাগ করার জন্য রাজী করাতে তার উযীর ইউসুফ বিন কুমাশা ও তার সঙ্গে গ্রানাডার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে সেভিলে খৃস্টান শাসকদ্বয়ের কাছে প্রেরণ করলেন। উক্ত ব্যবসায়ীর নাম ছিল ইবরাহীম আলকায়সী। খৃস্টানদের সঙ্গে তার ভালো যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। ফলে নতুন করে মুসলিম-খৃস্টান যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

এখানে আমরা আবু আবদুল্লাহর এই নতুন অবস্থানের সামান্য পর্যালোচনা করব। হ্যাঁ, গত কয়েক বছরের মুসলিম আন্দালুসে চলমান দুর্যোগ-দুর্বিপাক সুলতান আবু আবদুল্লাহকে অন্য মানুষে পরিণত করেছিল। এই দুর্বল সুলতান উৎকণ্ঠাভরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি এর মাঝে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন অবশ্যম্ভাবী তাকদীর ও পরিণতি। যদিও চাচা যাগ্‌ল ময়দান থেকে সরে যাওয়ায় তিনি তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন; কিন্তু এর কারণে একই সঙ্গে তিনি প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে নির্ভর করা যায়, এমন সবচে' বড় শক্তিকেও হারিয়েছিলেন। আন্দালুসের অন্য সব ঘাঁটি ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের দখলভুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোর জন্য নতুন খৃস্টান প্রশাসকও নিযুক্ত করা হয়ে গিয়েছিল। সেসব নগরীতে এখনও রয়ে যাওয়া মুসলিম নাগরিকগণ হয় খৃস্টান শাসকের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে কিংবা স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে খৃস্টধর্মের প্রচারণা; বহু মুসলমান আপন ভিটে-মাটির লোভে, স্বার্থ রক্ষায় কিংবা অনিশ্চয়তা ও বিতাড়ন থেকে বাঁচতে মুরতাদ হয়ে গেছে। অনেকেই অবশ্য নিজেদের দ্বীন ও প্রাণ রক্ষার্থে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওপারের মাগরেব ভূমিতে।

আবার এসব মুসলিম নগরীর নাগরিকদের একটি বিরাট অংশ আন্দালুসের একমাত্র মুসলিম দুর্গ গ্রানাডায় ছুটে এসেছে। ফলে গ্রানাডার অভ্যন্তরে নবাগত মানুষের এক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। মূল গ্রানাডার নগরপ্রাচীরের

Scanned with CamScanner

ভেতরে এবং পার্শ্ববর্তী শহরতলিগুলো মিলিয়ে জনগণের সংখ্যা চার লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। হতাশা ও ঘৃণার এক যুগপৎ তরঙ্গ এই লক্ষ মানুষকে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। কোন অপরাধ করা ছাড়াই তারা হারিয়েছেন নিজেদের ভূখণ্ড, সন্তান, ধন-সম্পদ; হয়েছেন নির্যাতিত-নিপীড়িত। আর তাই এই ঘৃণিত শত্রুর কাছে গ্রানাডা রাষ্ট্র তুলে দেওয়ার চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই গণপ্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছিল। সুলতান আবু আবদুল্লাহ এই গণ-চেতনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন না। এ কারণেই ক্যাস্টোলার শাসকদ্বয়ের প্রেরিত প্রতিনিধিদল যখন তার কাছে আলহামরা তুলে দেওয়ার দাবি জানাল, তার হৃদয় এই শঠতা ও প্রতারণা করতে বিদ্রোহ করল।

হয়তো এই প্রথমবারের মতো তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তিনি এই প্রতারক শাসকদ্বয়ের সঙ্গে মিত্রতা করে এবং আপন জনগণ ও মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে কী মারাত্মক ভুল করেছেন। আর তাই পঞ্চম ফার্ডিনান্ড যখন তাকে এই প্রতারণার ফাঁদে আবারও ফেলতে চাইলেন, তিনি রাষ্ট্রের সকল সেনাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ চাইলেন। তারা সকলে একবাক্যে ক্যাথলিক শাসকদ্বয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং নিজেদের মাতৃভূমি ও দ্বীন রক্ষার্থে আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করল। তখন আবু আবদুল্লাহ ক্যাস্টোলা-নৃপতিকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি এবং গ্রানাডার জনগণ আত্মসমর্পণ ও সমঝোতা স্থাপনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে লড়াই ও প্রতিরোধের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছে। সুলতান আবু আবদুল্লাহ এভাবেই ক্যাস্টোলা-শাসকদ্বয়কে উত্তর দিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের দৃঢ় সঙ্কল্পের কারণেই সমঝোতা ও নতি স্বীকারের পরিবর্তে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের পথ বেছে নিয়েছিলেন।[৪০৫]

আবু আবদুল্লাহর নেতৃত্ব হস্তান্তরে অস্বীকৃতির সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র ক্যাস্টোলা-নৃপতি গ্রানাডায় চলে এলেন এবং গ্রানাডা অবরোধ করলেন। মুসলিম বাহিনী খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করল। স্বয়ং সুলতানও প্রতিরোধ-যুদ্ধে শরীক হলেন। মুসলিম বাহিনী স্বেচ্ছাচারী ফার্ডিনান্ডের বাহিনীর মোকাবেলায় বীরত্ব ও অটলতার অনুপম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তাদেরকে ব্যর্থ ও পরাজিত করতে সক্ষম হল এবং

---

[৪০৫] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১০২-১০৩, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৩ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২২৯-২৩৩। আমরা এখানে শেষোক্ত সূত্র হতে সংক্ষেপে বিবরণ উল্লেখ করেছি।

Scanned with CamScanner

দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করল। খৃস্টান বাহিনী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেই মুসলমানগণ আবু আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গ্রানাডাকে ঘিরে রাখা খৃস্টান নগরীগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করল এবং অতি সম্প্রতি খৃস্টানরা যেসব নগরী দখল করে নিয়েছিল, সেখানকার বিদ্রোহরত মুসলমানদের সহায়তা করতে লাগল। এর ফলে মুসলমানরা নতুন করে গ্রানাডার নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি নগরী ও দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হল।

এরপর ফার্ডিনান্ড আবারও আগমন করে গ্রানাডা অবরোধ করলেন। এবারও তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হলেন। মুসলমানগণ পুনরায় তাদের পুনরুদ্ধার অভিযান শুরু করল। এরপর ফার্ডিনান্ড তৃতীয়বারের মতো গ্রানাডা অবরোধ করলেন। এবার তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, গ্রানাডা জয় না করে কিছুতেই ফিরবেন না। তার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার একটি কারণ সম্ভবত এও ছিল যে, তিনি গ্রানাডার এই নতুন জাগরণে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করছিলেন যে, বারবারের অবরোধেও গ্রানাডা মোটেই নতি স্বীকার করছে না; বরং ধ্বংসস্তুপের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেও সাহসিকতা-বীরত্ব ও লড়াকু মনোভাবের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেবল প্রতিরোধই নয়; তারা নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বের হয়ে নিকটবর্তী খৃস্টান নগরীগুলোতেও হামলা চালাচ্ছে। কাজেই যা করার, তা যে দ্রুতই করতে হবে, এ বিষয়টি না বোঝার মতো মানুষ ফার্ডিনান্ড ছিলেন না।[৪০৬]

---

[৪০৬] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১০৩-১১৭, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৩-৫২৪ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২৩২-২৩৬।

Scanned with CamScanner

সপ্তম পরিচ্ছেদ
গ্রানাডা-পতনের পূর্বে প্রতিরোধ-তৎপরতা

এই শেষবারের অবরোধের সময় গ্রানাডার অভ্যন্তরে অত্যন্ত দৃশ্যমান এক প্রতিরোধ-তৎপরতা শুরু হল। এর নেতৃত্বে ছিলেন মুসা বিন আবু গাসসান নামের মহান এক বীর যুবক। তিনি জনসাধারণের অন্তরে ঈমানী প্রেরণা জাগ্রত করতে সচেষ্ট হলেন। তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভে এবং আপন মাতৃভূমি ও পরিচয় রক্ষার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। জনগণ তার আহ্বানে সাড়া দিল এবং গ্রানাডা রক্ষার প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।[৪০৭]

দীর্ঘ সাত মাস গ্রানাডার লড়াকু জনগণ খৃস্টান বাহিনীর প্রচণ্ড হামলার মুখেও গ্রানাডা রক্ষায় নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। সমকালীন বিখ্যাত বীর

---

[৪০৭] প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান লিখেছেন, আমাদের সামনে বিদ্যমান আরবী ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে আমি মুসা ও তার সংগ্রামের আলোচনা পাইনি। এক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে স্প্যানিশ ঐতিহাসিক কোন্‌ডি-এর বর্ণনার উপর। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, মুসার আলোচনা তিনি আরবী উৎসগ্রন্থগুলো হতে নিয়েছেন। কিন্তু অভ্যাসমতো তিনি তার উৎসের নাম উল্লেখ করেননি। উযীর মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব গাসসানী তার সফরনামায় সুলতান হাসানের ভাই হিসেবে মুসার কথা উল্লেখ করেছেন। (ফ্রাঙ্কো একাডেমি থেকে প্রকাশিত *'উযীরের সফরনামা'*, পৃ : ১৩) ... মুসার ঘটনাবলি স্প্যানিশ বর্ণনাসমূহে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ... আমরা এখানে মুসা ও তার বীরত্ব সম্পর্কে ক্যাস্ট্রোলীয় বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করব, যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা শতভাগ যাচাইকৃত নয়। অবশ্য এসব বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের সামনে সে যুগের মুসলমানদের আপন দ্বীন-ধর্ম, মাতৃভূমি ও নিজেদের সর্বশেষ ঘাঁটিকে রক্ষা করার জন্য কৃত সংগ্রামের একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হবে। (প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান-এর উদ্ধৃতি শেষ হল)।

বাস্তবতা হল, আমরা এ আশা মোটেই করতে পারি না যে, স্প্যানিশ উৎসগ্রন্থগুলোতে এমন কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ কীর্তি তুলে ধরা হবে, যিনি গ্রানাডা রক্ষার জন্য অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। বরং সম্ভাব্য বিষয় এটিই যে, পতনের অব্যবহিত পূর্বে অবশ্যই চেতনার জাগরণ, প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের ঘটনা ঘটবে। এ ধরনের আন্দোলন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিরই দাবি। পাশাপাশি এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী উৎসগ্রন্থগুলোর এ সময়কাল সম্পর্কে আগুর্য নীরবতা এ জাতীয় ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণারই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং ইতিহাস বর্ণনাধারার এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য অন্যান্য বর্ণনাসমূহকে কাজে লাগানো এবং অনুমান ও প্রাধান্যদানের পদ্ধতিকে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের কোন উপায়ও নেই।

Scanned with CamScanner

যোদ্ধা ও *'নুবযাতুল আছর'* গ্রন্থের রচয়িতার বিবরণীতে এই অনন্য প্রতিরোধ যুদ্ধের কিছু আলোচনা উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন,

ক্যাস্টোলা-শাসক গ্রানাডা জয়ের অভিযানে বের হলেন এবং আতাকা গ্রামে শিবির স্থাপন করলেন। এরপর সেখানে অল্প কয়েকদিনেই বড় বড় কয়েকটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন। তিনি আশেপাশের গ্রামগুলোতে হামলা চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালালেন এবং সেসব গ্রাম থেকে নির্মাণ কাজে ব্যবহার-উপযোগী যা কিছু পেলেন, সব কিছু গাড়িতে করে তার নির্মিত নগরীতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করলেন। এর পাশাপাশি তিনি গ্রানাডার মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে লাগলেন। মুসলমানরাও তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলল।

ক্যাস্টোলা-নৃপতি গ্রানাডা নগরীকে ঘিরে থাকা গ্রামগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে সেগুলো দখল করে নিলেন। বাকি রইল কেবল ফাখখার গ্রাম। তিনি এ গ্রামটি জয় করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালালেন এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কয়েকবার এর ওপর হামলা চালালেন; অপেক্ষা করলেন উপযুক্ত সুযোগের। কিন্তু সক্ষম তো হলেনই না; বরং তার প্রচুর সৈন্য এ কারণে প্রাণ হারাল। ফাখখার গ্রামের দখলকে কেন্দ্র করে মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে দফায় দফায় যুদ্ধ হল। মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধ-বুহ্য গড়ে তুলল। কারণ তারা উপলব্ধি করছিল যে, এ গ্রামের দখলও খৃস্টান বাহিনীর হাতে চলে যাওয়ার অর্থ হল পাহাড়ের গ্রামগুলো উজাড় হয়ে যাওয়া এবং মূল গ্রানাডা নগরী অবরুদ্ধ হয়ে পড়া। তাই তারা এ গ্রামটির প্রতিরক্ষায় প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল এবং খৃস্টান বাহিনীর যারাই এদিকে অগ্রসর হল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করল। ফলে বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের প্রাণহানি সত্ত্বেও খৃস্টান বাহিনী এ গ্রামের কাছে ভিড়তে ব্যর্থ হল।

প্রতিদিন উভয় বাহিনীর মধ্যে কোন না কোন স্থানে যুদ্ধ হত। কোনদিন ফাখখার গ্রামের কাছে, কোনদিন বিলইয়ানা এলাকায়,

Scanned with CamScanner

কোনদিন রিসানা এলাকায়, কোনদিন তুফাইর এলাকায়, কোনদিন ইয়া'মুর এলাকায়, কোনদিন জাদ্ওয়া এলাকায়, কোনদিন আফলুম এলাকায়, কোনদিন রাবিত, কোনদিন ওয়াদিয়ে মুনতাসিল, কোনদিন গ্রানাডার অন্য কোন এলাকায় যুদ্ধ চলছিল। এসব যুদ্ধের প্রতিটিতেই প্রতিদিন অনেক মুসলিম বীর যোদ্ধা আহত বা শহীদ হচ্ছিল। খৃস্টান বাহিনীতে হতাহতের ঘটনা ঘটছিল আরও কয়েক গুণ।

মুসলিম যোদ্ধাগণ মহান আল্লাহ তাআ'লার সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রতি আস্থা রেখে সাওয়াবের আশায় অবিচল যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। খালিস নিয়ত ও নির্ভেজাল আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। সম্মুখযুদ্ধের পাশাপাশি মুসলিম বাহিনীর অনেকে রাতের অন্ধকারে খৃস্টান ছাউনির দিকে চলে যেত এবং পথে খৃস্টান বাহিনীর ওপর ঝটিকা হামলা চালিয়ে তাদের ক্ষতি করার পাশাপাশি ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, গরু, মেষ যা পেত ছিনিয়ে নিয়ে আসত। ফলে গ্রানাডা নগরীতে গোশতের সরবরাহ এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রতিরিতল[৪০৮] গোশত মাত্র এক দিরহামে বিক্রি হতে লাগল।

এভাবেই মুসলিম ও খৃস্টান বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ চলতে লাগল। দীর্ঘ সাত মাস উভয় পক্ষই ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হল, হতাহত হল প্রচুর। এসব যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রচুর অশ্ব নিহত হওয়ায় এক সময় মুসলিম বাহিনীর অশ্বের সংখ্যা কমে এল। কমে এল দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যাও।[৪০৯]

কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবল সাহসিকতা ও নির্ভীকতাই যথেষ্ট নয়। মুসলমানগণ নিজ নগরীতে দীর্ঘদিন যাবৎ অবরুদ্ধ; প্রয়োজনীয় রসদ ও খাবার সংগ্রহের কোন পথ খোলা নেই। বিপরীতে খৃস্টান বাহিনী নিজ ভূখণ্ডের বাইরে এসে গ্রানাডা অবরোধ করেছে; তাদের নিজ এলাকা থেকে রসদ সরবরাহও চালু রয়েছে। অধিকন্তু গ্রানাডার প্রচুর নাগরিক চলমান অব্যাহত অবরোধ ও যুদ্ধের কারণে ভয় ও আতঙ্কে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

---

[৪০৮] 'রিতল' একটি প্রাচীন পরিমাপ একক। এর পরিমাণ প্রায় ৩৯৭.৮০ গ্রাম। (অনুবাদক)

[৪০৯] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১১৭।

Scanned with CamScanner

ফলে গ্রানাডা আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। এরপর যখন শীতকাল আরম্ভ হল এবং বরফ পড়তে শুরু করল, বাইরে থেকে গ্রানাডায় খাবার সরবরাহের পথ বাশারাহ এলাকার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে গ্রানাডায় মুসলমানদের বাজারে খাবারের অপ্রতুলতা সৃষ্টি হল এবং পণ্যমূল্য অনেক বেড়ে গেল। ক্ষুধায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল, বেড়ে গেল ভিক্ষাবৃত্তি।

গ্রানাডাবাসীর সামনে নিরাপত্তা চেয়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। তাই একদল বিশিষ্ট নাগরিক সুলতান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আসসগীরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে ক্যাস্টোলা-সম্রাটের সঙ্গে নিরাপত্তার বিনিময়ে আত্মসমর্পণের সমঝোতা করার অনুরোধ জানাল। 'নুবযাতুল আছর' গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে সুলতান আবু আবদুল্লাহ পূর্ব থেকেই আত্মসমর্পণে আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু জনরোষের ভয়ে তিনি তা করতে পারছিলেন না। তাই তিনি গোপনে দূত পাঠিয়ে তার অবস্থানের কথা ক্যাস্টোলা-শাসক ফার্ডিনান্ডকে অবগতও করেছিলেন। ফার্ডিনান্ডও এ কারণেই বেশ কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ রেখে কেবল অবরোধ ও কড়াকড়ি আরোপেই সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং অপেক্ষা করছিলেন, কখন আবু আবদুল্লাহ তার জনগণকে নিরাপত্তার বিনিময়ে আত্মসমর্পণে রাজী করাতে পারেন। এখন যখন জনগণের পক্ষ থেকেই এই প্রস্তাব এল, কালবিলম্ব না করে আবু আবদুল্লাহ তাদের প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন এবং তার উযীরদেরকে নিরাপত্তা প্রস্তাবসহ ক্যাস্টোলা-শাসকের কাছে পাঠালেন। ফার্ডিনান্ড তো এর জন্যই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনিও তার চরিত্র রূপায়ণ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন।[৪১০]

'নুবযাতুল আছর'-এর গ্রন্থকারের এই বর্ণনাকেই আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি এবং সত্য বলে গ্রহণ করছি। বিশেষত গ্রানাডা-সুলতানের চরিত্র ও তার উযীরদের স্বভাব-চরিত্র আমাদেরকে এ বর্ণনায় আস্থা রাখতে বাধ্য করেছে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আমরা প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনানকেও এ বিষয়টি সমর্থন করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে এ বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করলেও পরবর্তী সময়ে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত লাভ

---

[৪১০] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১২১।

Scanned with CamScanner

করেছেন, যার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, আবু আবদুল্লাহ, তার পরিবার ও তার মন্ত্রিপরিষদের নিরাপত্তা, বিশেষ প্রতিশ্রুতি ও সম্পদ লাভের বিষয়ে গোপনে সমঝোতার চেষ্টা চলছিল। আবু আবদুল্লাহ, তার পরিবার ও তার মন্ত্রিপরিষদের জন্য জমি-জমা, নগদ অর্থ ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে গোপনে উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর আরেকটি প্রমাণ হল, সংঘাত ও গ্রানাডা অবরোধের প্রাথমিক সময়কাল থেকেই আবু আবদুল্লাহ ও তার বিশেষ উযীরদের অনেকে নিজ নিজ মালিকানাধীন মূল্যবান বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলছিলেন।[৪১১]

নিরাপত্তার বিনিময়ে গ্রানাডার সমর্পণের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেল। মাক্কারী রহ. লিখেছেন,

> ইতঃপূর্বে স্বাক্ষরিত ওয়াদিয়ে আশ-এর চুক্তির সঙ্গে আরও কিছু ধারা যোগ করার বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হল। চুক্তিপত্রের শুরুতে উল্লেখ করা হল যে, ক্যাথলিক নৃপতি গ্রানাডার আলহামরা, অন্যান্য দুর্গের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পর উল্লিখিত যাবতীয় শর্ত মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন এবং খৃস্টান রীতি অনুযায়ী অঙ্গীকার রক্ষার শপথ করবেন। চুক্তিতে মোট সাতষট্টিটি শর্ত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গ্রানাডার বিশিষ্ট-সাধারণ সকল নাগরিকের জান-মাল ও পরিবারের নিরাপত্তা দান করা হবে, প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি ও ক্ষেত-খামার নিজ দখলেই থাকবে। আরও উল্লেখ ছিল, প্রত্যেকে আপন আপন শরীয়ত পালন করতে পারবে, তাদের বিচারকার্য কেবল তাদের শরীয়ত অনুযায়ীই হবে; মসজিদ ও অন্যান্য ওয়াক্বফ সম্পত্তি যেমন আছে, তেমনই থাকবে; খৃস্টানরা কোন মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না, কাউকে অপহরণ করতে পারবে না, মুসলমানদের অভিভাবকত্ব কেবল কোন মুসলমান বা এমন কোন ইহুদি করতে পারবেন, যিনি পূর্ব থেকেই তাদের অভিভাবকত্ব করে আসছেন। গ্রানাডায় বন্দী সকলকে হত্যা করা হবে; তারা কোথা থেকে এসেছে– তার কোন বিবেচনা করা হবে না;

---

[৪১১] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২৪২।

Scanned with CamScanner

বিশেষত চুক্তির সময় যাদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। যেসব মুসলিম বন্দী পালিয়ে গ্রানাডায় আশ্রয় নিয়েছেন, তাদেরকে ক্যাথলিক নৃপতি বা খৃস্টানদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না; সুলতান আবু আবদুল্লাহ তাদের পণমূল্য ক্যাথলিক নৃপতিকে পরিশোধ করবেন। যারা গ্রানাডা ছেড়ে ওপারে মাগরেবে চলে যেতে চাইবে, তাদেরকে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত তারা সুলতানের জাহাজে করেই সাগর পাড়ি দিতে পারবেন, এজন্য তাদের ভাড়া ছাড়া আর কিছু দিতে হবে না। সেই নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কেউ ওপারে যেতে চাইলে ভাড়ার পাশাপাশি বহনকৃত সম্পদের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। একের অপরাধে অন্যকে গ্রেফতার করা যাবে না। কোন খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে খৃস্টধর্মে ফিরে যেতে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। কোন মুসলমান খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে তার প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করা হবে; এরপর তাকে একজন মুসলিম বিচারক ও একজন খৃস্টান বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হবে। যদি সে তখনও ইসলামে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে তার অবস্থায় থাকার সুযোগ দেওয়া হবে। যুদ্ধের দিনগুলোতে যে মুসলমান কোন খৃস্টানকে হত্যা করেছে, তাকে এর জন্য কোন শাস্তি দেওয়া বা তিরস্কার করা যাবে না। পূর্বের শত্রুতার দিনগুলোতে খৃস্টানদের যেসব সম্পদ মুসলমানরা ছিনিয়ে নিয়েছে, তা ফেরত নেওয়া হবে না। কোন মুসলিম নাগরিককে খৃস্টান সৈন্যদের আতিথেয়তার জন্য বাধ্য করা যাবে না। স্বাভাবিক করের তুলনায় অধিক কর তাদের ওপর আরোপ করা যাবে না এবং বর্তমানে বিদ্যমান যাবতীয় অন্যায় ও নিপীড়নমূলক কর-বিধান উঠিয়ে নেওয়া হবে। কোন খৃস্টান প্রাচীরের ভেতরে বা মুসলিম নাগরিকের বাড়ির ভেতরে উঁকি দিতে পারবে না। তারা কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলিম নাগরিকগণ জান-মালের নিরাপত্তা সহকারে খৃস্টান অঞ্চলে যেতে

Scanned with CamScanner

পারবে। কোন মুয়াযযিন, মুসল্লী, রোযাদার বা অন্য কোন ইবাদত পালনকারী ব্যক্তিকে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে কোন রূপ বাধা প্রদান করা যাবে না। মুসলমানদের ইবাদত-কর্ম দেখে কেউ হাসি-ঠাট্টা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। নির্দিষ্ট কয়েক বছর মুসলমানদের কর মওকুফ করা হবে।

ক্যাস্টোলা-নৃপতি সবগুলো শর্ত মেনে নিলেন এবং নিজ হাতে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলেন। এ ধরনের আরও কিছু শর্ত চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল, যা আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না।[৪১২]

মুসা বিন আবু গাসসান ও তার শহীদী মিশন

চলমান ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া হিসেবেই মুসা বিন আবু গাসসান রহ. আলহামরার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত আহলে শুরার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দীপ্ত কণ্ঠে বললেন,

আপনারা আত্মপ্রবঞ্চনার স্বীকার হবেন না। কিছুতেই এ কথা মনে করবেন না যে, খৃস্টানরা তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। আপনারা খৃস্টান নৃপতির কৃত্রিম উদারতা ও মহত্ত্বের প্রতি আস্থা রাখবেন না। মনে রাখবেন, আমি যা আশঙ্কা করছি, মৃত্যু তার মধ্যে সবচে' লঘু ও সহজ বিষয় (অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সামনে মৃত্যুর চেয়েও কঠিনতর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে)। আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে আমাদের নগরীগুলোর লুণ্ঠন ও ধ্বংস, আমাদের মসজিদগুলোর অপবিত্রকরণ, আমাদের বসতি বিরান-করণ, আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্ভ্রমহানি। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মাত্রাহীন জুলুম-নিপীড়ন, হিংস্র ও নোংরা সাম্প্রদায়িকতা, চাবুক ও বেড়ি। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে খৃস্টানদের বন্দীশালা, ফাঁসির মাদুর, চিতার আগুন। আজ যারা সৌভাগ্যের মৃত্যুকে ভয় করছে, সেসব নিকৃষ্ট মানুষগুলো শীঘ্রই এসব বিপদ ও মুসিবত এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন প্রত্যক্ষ করবে; আমি যা বললাম, কমপক্ষে এতটুকু পরিণতির মুখোমুখি শীঘ্রই তারা হবে।

---

[৪১২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৪-৫২৭। আরও দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১১৯ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/২৪৮।

Scanned with CamScanner

> আর আমি ...! আল্লাহর শপথ! আমি কিছুতেই এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা প্রত্যক্ষ করব না।[৪১৩]

মুসা বিন আবু গাসসান বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই অবসন্নতা ও অসহায় পরাজয় মেনে নেওয়ার কারণে দেশ যে লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তিনি কিছুতেই তা দেখবেন না; বরং তিনি শহীদী মৃত্যুকেই বেছে নেবেন।

এরপর তিনি মজলিস ত্যাগ করে বাড়িতে চলে গেলেন এবং অস্ত্রধারণ করে অশ্বে আরোহণ করলেন।

তিনি একাকী খৃস্টানদের একটি দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলে গেলেন এবং পনেরজন খৃস্টান সৈন্যের সঙ্গে একাকী লড়াই করতে লাগলেন। এদের অধিকাংশকে হত্যা করার পর তিনি নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন।[৪১৪]

---

[৪১৩] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২৫৪-২৫৫।

[৪১৪] প্রাগুক্ত, ৭/২৫৫-২৫৬। ক্যাস্ট্রোলীয় বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, মুসা বিন আবু গাসসান আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু মুসা বিন আবু গাসসানের ন্যায় একজন মহান বীর যোদ্ধার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাকে আমরা মোটেই গ্রহণ করতে পারি না।

Scanned with CamScanner

অষ্টম পরিচ্ছেদ
গ্রানাডার পতন

মুসা বিন আবু গাসসানের শাহাদাত ও ইবনুল আহমার আসসগীরের গ্রানাডা সমর্পণ ছিল গ্রানাডায় ইসলামী শাসনামল সমাপ্তির সুস্পষ্ট সংকেত।

আবু আবদুল্লাহ আসসগীর খৃস্টান রাজা-রানী পঞ্চম ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার হাতে গ্রানাডা তুলে দেওয়ার চুক্তিতে সম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বিশেষ কিছু রাজকীয় উপহার পাঠাতেও ভুললেন না।[৪১৫] গ্রানাডা সমর্পণের কয়েকদিন পর খৃস্টান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আড়ম্বরতা ও দাম্ভিকতার সঙ্গে খৃস্টান পাদ্রীদের নিয়ে আলহামরার মূল প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সর্বপ্রথম যে আনুষ্ঠানিক কাজটি তারা করলেন তা হল, তারা আলহামরার সর্বোচ্চ টাওয়ারের ওপর রূপার তৈরি একটি বড় ক্রুশ স্থাপন করলেন। এরপর সেখান থেকে ঘোষণা করা হল যে, গ্রানাডা এখন ক্যাথলিক শাসকদ্বয়ের কর্তৃত্বভুক্ত হয়ে গেল[৪১৬] এবং আন্দালুসে মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটল।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার আসসগীর চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় রাজপ্রাসাদ থেকে বের হলেন এবং দূরের আন্দারাশ[৪১৭] শহরের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে তিনি আলহামরার দিকে প্রলম্বিত এক উঁচু টিলায় পৌঁছলেন। টিলার ওপর থেকে আলহামরার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেখান থেকে তিনি আলহামরার দিকে তাকালেন। তাকালেন ফেলে আসা গৌরব ও ঐতিহ্যের দিকে। ব্যথা ও অনুতাপের আতিশয্যে আবু আবদুল্লাহ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। তার দু' চোখ হতে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। অশ্রুতে সিক্ত হল গণ্ডদেশ ও দাড়ি। আবু আবদুল্লাহর মহীয়সী জননী আয়েশা আলহুররা তখন তাকে ধিক্কারের সুরে বললেন, হ্যাঁ, এখন তো

---

[৪১৫] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/২৫৭।

[৪১৬] প্রাগুক্ত, ৭/২৬০।

[৪১৭] তিনি নিজেই উক্ত শহরে বসবাসের ইচ্ছা করেছিলেন। এ সম্ভাবনাও আছে যে, ফার্ডিনান্ডই তার জন্য এ শহর নির্বাচিত করেছিলেন। দেখুন : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/২৬৪।

Scanned with CamScanner

তোমার কাঁদাই উচিত। পৌরুষের পরিচয় দিয়ে যে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারনি, তার শোকে তো নারীর মতোই ক্রন্দন করা উচিত।[৪১৮]

যে টিলাটির ওপর দাঁড়িয়ে গ্রানাডার সর্বশেষ মুসলিম শাসক আবু আবদুল্লাহ কাঁদছিলেন, তা আজও স্পেনের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। পর্যটকগণ এখনও সেখানে যান, দেখেন একজন মুসলিম শাসকের ব্যর্থ-কান্নার স্মারককে। দেখেন সেই শাসকের কান্নার স্থানটিকে, যিনি তার পূর্বসূরিদের গড়ে যাওয়া রাজত্বকে হেলায় ধ্বংস করেছিলেন। গ্রানাডা ত্যাগকালে আবু আবদুল্লাহর এই কান্নার কারণেই ছোট্ট এই পাহাড়টি 'আরব শাসকের শেষ দীর্ঘশ্বাস' নামে খ্যাতি লাভ করে।[৪১৯]

৮৯৭ হিজরীর ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ খৃস্টাব্দের ২ জানুয়ারি পতন ঘটে আন্দালুসের সর্বশেষ মুসলিম দুর্গ গ্রানাডার।[৪২০]

পরবর্তী সময়ে আবু আবদুল্লাহ মাগরেবে চলে যান। মাক্কারী রহ. লিখেছেন, তিনি সেখানে ফেয নগরীতে বসবাস করেন এবং আন্দালুসের আদলে সেখানে কয়েকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। স্বয়ং মাক্কারী ১০২৭ হিজরীতে সে প্রাসাদগুলো পরিদর্শন করেছেন এবং দরিদ্র-মিসকীন সহায়তা মন্ত্রণালয় থেকে আবু আবদুল্লাহর বংশধরদের সাহায্য গ্রহণ করতে দেখেছেন। অর্থাৎ তখন তারা মাগরেবের ভিক্ষুকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল![৪২১]

আবু আবদুল্লাহর পরিণতি যাই হোক, গ্রানাডার পতনে পৃথিবীর বুক থেকে সেই গৌরবময় সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যার দৃষ্টান্ত ইউরোপ ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করেনি। গ্রানাডার পতনে মহাকালের এক বিস্তৃত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল, যার অবদান পৃথিবী আজও ভুলতে পারেনি। এ সভ্যতা দ্বীন ও দুনিয়ার যুগপৎ সভ্যতা। এ অধ্যায় গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগপৎ অধ্যায়। মুসলিম আন্দালুস সভ্যতার পতন তাই পৃথিবীর অনেক বড় ক্ষতি! আন্দালুসের ইসলামী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি তাই মানবজাতির অনেক বড় দুর্ভাগ্য! ইসলামের পরাজিত প্রাসাদের ওপর উড্ডীন হল ক্রুশচিহ্ন-অঙ্কিত

---

[৪১৮] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/২৬৭।

[৪১৯] প্রাগুক্ত, ৭/২৬৭।

[৪২০] লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১২৫, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৫ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/২৫৮-২৬৭।

[৪২১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৯।

Scanned with CamScanner

পতাকা। আন্দালুসে ডুবে গেল ইসলামী সাম্রাজ্যের ভাগ্য-তারকা, যে তারকা আজও পুনঃউদিত হয়নি।

হায়! যদি আমি জানতাম!
কোথায় আজ মুসা বিন নুসাইর?!
কোথায় আজ তারিক বিন যিয়াদ?!
কোথায় আজ আবদুর রহমান আদদাখিল?!
কোথায় আজ আবদুর রহমান আননাসির?!
কোথায় আজ আলমানসুর বিন আবু আমীর?!
কোথায় আজ ইউসুফ বিন তাশফীন?!
কোথায় আজ আবু বকর বিন ওমর লামতুনী?!
কোথায় আজ ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদী?!
কোথায় আজ ইয়াকুব আলমানসুর আলমারীনী?!
কোথায় আজ তারা সকলে?!
কোথায় আন্দালুসের ও ইসলামের বীর সৈনিকেরা?!

সবাই হারিয়ে গেল দৃশ্যপট থেকে এবং বিলীন হয়ে গেল তাদের রেখে যাওয়া কীর্তি, তাদের গড়া ইসলামী সাম্রাজ্য।

গ্রানাডার পতন ... কিছু কারণ, কিছু কার্যকারণ

আন্দালুসের ইতিহাসে দুর্বলতার প্রতিটি যুগে জাতিসমূহের অধঃপতন, পতন ও ধ্বংস হওয়ার কার্যকারণ অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। সেসব কার্যকারণই আরও প্রকট আকারে গ্রানাডার ইতিহাসে প্রকাশ পেয়েছিল। আর তাই গ্রানাডার পতনও হয়েছে চূড়ান্ত ও সর্বগ্রাসী। এসব কার্যকারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

প্রথম কারণ

বিলাসিতায় ডুবে থাকা, পরকালীন চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে পার্থিব চিন্তায় আচ্ছন্ন হওয়া, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-লালসায় মগ্ন হওয়া এবং অন্যায়ের সামনে নতি স্বীকার ও শিথিলতা ছিল এই মর্মান্তিক পতনের প্রথম কারণ। অধঃপতন ও পতনের আমলগুলোতে সবসময়েই দেখা গেছে সমাজে সম্পদের আধিক্য, মানুষের আমোদ-প্রমোদে নিমগ্নতা, উম্মাহর যুবক শ্রেণির

Scanned with CamScanner

মধ্যে প্রচণ্ড রকমের পরাজিত মনোভাব এবং লক্ষ্যে অবিচলতার পরিবর্তে বড় রকমের নিম্নগামিতা। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ﴾

আমি কত জনপদ পিষ্ট করেছি, যারা ছিল জালেম! তাদের পর আমি অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তির পূর্বাভাস পেল, তখন তারা দ্রুত সেখান থেকে পালাতে লাগল। (তাদেরকে বলা হয়েছিল) পালিয়ো না। বরং ফিরে এসো তোমাদের সেই ঘর-বাড়ি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে, যার মজা তোমরা লুটছিলে। হয়তো তোমাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। [সূরা আম্বিয়া : ১১-১৩]

আয়াতের আলোকেই আমরা গ্রানাডাবাসীকে বলতে পারি, হে গ্রানাডাবাসী! কোথায় যাবে তোমরা? কোথায় ধাবিত হবে? ফিরে এসো আলহামরা প্রাসাদে; ফিরে এসো তোমাদের বাসগৃহে এবং ...। এ দেশ সমর্পণ কর খৃস্টানদের হাতে আর আস্বাদন কর লাঞ্ছনার তিক্ত স্বাদ; যেহেতু তোমরা সম্মান ও মর্যাদার কাজ করনি!

দ্বিতীয় কারণ

কাফিরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ও বিজয়াভিযান পরিত্যাগ। অবশ্য যারা ভোগ-বিলাসিতা এবং ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে ডুবে যায়, সংগ্রামহীন জীবন তাদের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। আন্দালুসের ইতিহাস যিনিই অধ্যয়ন করবেন, অবাক বিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন করবেন, কোথায় সেই জাতি, যারা প্রতিবছর নিয়ম করে এক-দু'বার বিজয়াভিযানে বের হত?! কোথায় ইউসুফ বিন তাশফীন ও আবু বকর বিন ওমর লামতুনী?! কোথায় হাজিব আলমানসুর?! এবং কোথায় আবদুর রহমান আননাসিরের মতো ব্যক্তিত্ব?!

আমরা যখন গ্রানাডার শাসকবর্গের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কিংবা ইতিহাসের সেসব চরিত্রদের অবলোকন করি, যারা সমচরিত্র ও মেজাযের অধিকারী

Scanned with CamScanner

ছিলেন; যখন প্রত্যক্ষ করি যে, সংগ্রামী জীবন পরিত্যাগ করার কারণে তারা লাঞ্ছিত হয়েছেন, অপদস্থ হয়েছেন, তখন নিঃসন্দেহে তা আমাদেরকে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করে। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় আল্লাহর পথে অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাও? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তা-ই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখো,) আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। [সূরা তাওবা : ৩৮-৩৯]

তৃতীয় কারণ

উপরিউল্লিখিত দু'টি কারণের হাত ধরেই এসেছে তৃতীয় কারণটি। আর তা হল সীমাহীন গোনাহ ও অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হওয়া। অথচ চিরন্তন সত্য হল মুসলিম বাহিনী কখনোই অস্ত্র-জনবলে এবং শক্তির প্রাবল্যে জয়লাভ করে না; তারা নুসরতে ইলাহী ও বিজয় লাভ করে তাকওয়ার বলে।

আর তাই মুসলমানগণ যখন রব-প্রদত্ত দ্বীন হতে দূরে সরে যায়, রাসূল-প্রদত্ত পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করে, তখন তাদের ওপর নেমে আসে আসমানী ফয়সালা; ধ্বংস, লাঞ্ছনা ও হীনতার জীবন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

Scanned with CamScanner

«إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَه»

তোমরা তুচ্ছ মনে করা গোনাহসমূহ হতে বেঁচে থাক। কেননা, যখন এ জাতীয় গোনাহ কোন মানুষের স্বভাবে সমবেত হয়ে যায়, তখন তা তাকে ধ্বংস করে ফেলে।[৪২২]

মানুষ যেসব গোনাহ অতি তুচ্ছ হওয়ার কারণে তুচ্ছজ্ঞান করে, সেগুলোর অবস্থাই যদি এত গুরুতর হয় যে, সেগুলো একত্র হয়ে মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়ে, তাহলে নামায পরিত্যাগ, ব্যাভিচার, সুদী কারবার, মদপান, গালিগালাজ ও কটুভাষণ, অভিশাপ প্রদান, হারাম মাল ভক্ষণ ইত্যাদি চরম গর্হিত গোনাহের পরিণতি কী হতে পারে? এ জাতীয় অন্যায়ে দ্বিধাহীন চিত্তে নিমগ্ন থাকার পরও কী করে নুসরাতে ইলাহীর আশা ও প্রত্যাশা করা যায়?!

এগুলোই ছিল আন্দালুসের পতনের মূল ও মৌলিক কারণ। এ ছাড়া আরও কিছু কার্যকারণ হল,

১. পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা

২. খৃস্টান, ইহুদি ও মুশরিকদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন

অথচ আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۭ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ﴾

ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওহীর মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।[সূরা বাকারা : ১২০]

---

[৪২২] ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৩৮১৮, তাবারানী, *আলমু'জামুল কাবীর*, ৫/৪৪৯, ও বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, হাদীস নং ৭০১৭।

Scanned with CamScanner

আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾

তারা কোন মুমিনের ক্ষেত্রেই কোন আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও নয় এবং তারাই সীমালঙ্ঘনকারী । [সূরা তাওবা : ১০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না । [সূরা মায়িদা : ৫১]

পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ের আরও অনেক আয়াত রয়েছে ।

৩. অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ

বিশেষ করে হিশাম বিন হাকামের শাসনামল, আবু ইয়াকুব আলমানসুর মুওয়াহহিদীর পর তার পুত্র আননাসিরের ক্ষমতাগ্রহণ এবং গ্রানাডা রাষ্ট্র শাসনকারী বনু আহমারের সকল শাসকের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে ।

৪. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা

জাতি ও সমাজের বিনির্মাণে ইলম ও আলিমের প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপে সুস্পষ্ট হয়েছিল আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের আমলে এবং হাকাম বিন আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে । এ দুই আমলে ব্যাপক ইলমী চর্চার পর মুসলিম জাতি যে শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল, তা একেবারেই সুস্পষ্ট । তদ্রূপ মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিণতি যে কতটা মারাত্মক, তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল মুরাবিতী আমলের শেষ দিকে এবং মুওয়াহহিদী আমলে । এ সময় মানুষের মাঝে অজ্ঞতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, আশ্চর্য ও বিরল বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শ মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছিল । এছাড়া তারা শুরা ও পরামর্শ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও ছিল

Scanned with CamScanner

পুরোপুরি অজ্ঞ। অথচ 'পরামর্শ' হল মুসলমানদের শাসনের অন্যতম মৌলিক নীতি। ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে তারা নিজেদের মতের ওপর নির্ভর করল?! কীভাবে জনসাধারণ তাদের এই পরামর্শহীন মতামতকে মেনে নিল?!

অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রভাব দেখুন। মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার একজন মুসলিম শাসক হয়ে সেভিল দখলে খৃস্টান বাহিনীকে সহায়তা করলেন আর তার জনগণও নিজেদেরকে সঠিক পথের অনুসারী ও মহান এক দায়িত্বপালনকারী মনে করে তার অনুসরণ করল! দ্বীন সম্পর্কে এর চেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞতা আর কী হতে পারে?!

Scanned with CamScanner

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রানাডার পতনের পর আন্দালুসী মুসলমানদের পরিণতি

আবু আবদুল্লাহ গ্রানাডা ত্যাগ করার পর খৃস্টান জাতি তাদের স্বাভাবিক অভ্যাস, রীতি ও স্বভাবের দাবি হিসেবেই মুসলমানদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। বরং গ্রানাডায় ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা, মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা প্রদানসহ গ্রানাডা সমর্পণের সময় স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে তারা যেসব অঙ্গীকার করেছিল, তা তারা পুরোপুরি অবজ্ঞা ও পরিত্যাগ করে। খৃস্টানরা মুসলমানদের চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে, তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। খৃস্টানদের আচরণ ছিল কোরআনের এই আয়াতের বাস্তব রূপায়ণ,

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

(কিন্তু অন্য মুশরিকদের সঙ্গে) কেমন করে (চুক্তি বলবৎ থাকবে), যখন (তাদের অবস্থা হল) তারা কখনো তোমাদের ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে কোনরূপ আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। [সূরা তাওবা : ০৮]

গ্রানাডা পতনের নয় বছর পর ১৫০১ খৃস্টাব্দে ক্যাথলিক নৃপতি পঞ্চম ফার্ডিনান্ড ও সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা একটি ফরমান জারী করেন, যার সারমর্ম হল– প্রভু যেহেতু তাদের উভয়কে গ্রানাডা ভূমি কাফির (মুসলমান) মুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন, তাই গ্রানাডায় মুসলমানদের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। যদি এখনও গ্রানাডায় কিছু মুসলমান থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হল। কেননা, সেক্ষেত্রে তাদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া বিলম্বিত হবে কিংবা যারা ইতোমধ্যে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা এ ফরমান অমান্য করবে,

Scanned with CamScanner

তারা মৃত্যুদণ্ড বা সম্পদ বাজেয়াপ্তের মতো কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।[৪২৩]

এই ফরমান জারী করার পর খৃস্টান গোষ্ঠী গ্রানাডায় কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

১. খৃস্টধর্মে দীক্ষিতকরণ

গ্রানাডার কিছু মুসলিম নাগরিক স্প্যানিশ খৃস্টান রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে বসবাস করার জন্য খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।[৪২৪] কিন্তু খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পরও তারা স্প্যানিশ খৃস্টানদের মন জয় করতে পারেনি। তাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার কোন পন্থাই খৃস্টানরা বাকি রাখেনি। অবজ্ঞা প্রদর্শন ও মর্যাদাহানির জন্য খৃস্টানরা এই ধর্মত্যাগী মুসলমানদের নাম দিয়েছিল 'মরিস্কো' জাতি। মরিস্কো পরিচয়ধারী খৃস্টানরা কখনোই এলিট স্তরের খৃস্টানদের কাতারে স্থান পেত না।[৪২৫]

স্প্যানিশ তদন্ত কমিশনের ইতিহাস লেখক ডন এস. এ. লিউরেন্টি (Don S. A. Liorente)[৪২৬] বিচার সম্পর্কীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল এক নথিপত্র আমাদের জন্য উদ্ধৃত করেছেন, যাতে তৎকালীন খৃস্টধর্মীয় বিচারক কমিটি কর্তৃক গৃহীত এমন সব নীতি ও ধারার কথা উল্লেখ আছে, যাকে পুঁজি করে তারা খৃস্টধর্ম-গ্রহণকারী আরবদের অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার অপবাদে অভিযুক্ত করত। পাঠকের সামনে সেই দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক দলীলটির ভাষ্য পেশ করা হল–

মরিস্কো বা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত আরবদের মাঝে নিম্নোক্ত কোন একটি নিদর্শন পাওয়া গেলে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের অপরাধী বলে গণ্য করা হবে। নিদর্শনগুলো হল– তাদের কেউ যদি দ্বীনে মুহাম্মাদীর প্রশংসা করে; কিংবা বলে যে, যিশু মসীহ প্রভু নন, তিনি একজন রাসূল মাত্র। প্রত্যেক খৃস্টান নাগরিকের কর্তব্য হল এসব বিষয়ে খেয়াল রাখা এবং কোন কিছু জানামাত্রই তদন্ত কমিশনকে অবহিত করা; কোন মরিস্কো ব্যক্তিকে ইসলামী রীতি-নীতির কোন কিছু করতে দেখলে বা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তা তদন্ত

---

৪২৩ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৩২৪।

৪২৪ দেখুন : *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১৩০ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৭।

৪২৫ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৩২২-৩২৬, ৩৪৫।

৪২৬. তার রচিত গ্রন্থের নাম *Historia Critica de la Inquisicion de Espana* (১৮১৫-১৮১৭)। তিনি দীর্ঘ সময় খৃস্টান তদন্ত কমিশনে কাজ করেছেন এবং শেষ জীবনে কমিশনের সাধারণ সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রচিত এ গ্রন্থটি খৃস্টান তদন্ত কমিশন সম্পর্কে কোন স্প্যানিশ লেখকের রচিত অন্যতম বিশাল রচনা। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

কমিশনকে জানানো। উদাহরণস্বরূপ শুক্রবার দিন বৈধ মনে করে গোশত ভক্ষণ করা, শুক্রবার দিন অন্যান্য দিনের স্বাভাবিক পোশাকের তুলনায় পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা, বিসমিল্লাহ বলে পূর্ব দিকে (অর্থাৎ কাবার দিকে) মুখ করা, যবেহ করার পূর্বে পশুর পা বাঁধা, যবেহহীন প্রাণীর গোশত ভক্ষণ না করা, মহিলা কর্তৃক যবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ না করা, সন্তানকে খতনা করানো, সন্তানদের আরবী নাম রাখা, কিংবা এ জাতীয় কোন রীতি অনুসরণের আগ্রহ প্রকাশ করা, কিংবা এ কথা বলা যে, আল্লাহ ও তার রাসূল মুহাম্মাদ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি বিশ্বাস না রাখা আবশ্যক, কিংবা কোরআনের বিশ্বাসের কসম করা, রমযান মাসে উপবাস থাকা, রমযান মাসে দান-সদকা করা, কেবল সূর্যাস্তের সময় পানাহার করা, সূর্যোদয়ের পূর্বে খাবার খাওয়া, শুকরের মাংস ভক্ষণ ও মদপান থেকে বিরত থাকা, এমন কোন কাজ করা যাতে মনে হয় যে, সে ওযু করছে বা নামায পড়ছে; যেমন: পূর্ব দিকে মুখ করা, রুকূ-সিজদার মতো নত হওয়া, কোরআনের কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা, ইসলামী শরীয়তের রীতি মেনে বিয়ে-শাদী আয়োজন করা, আরবী গান-কবিতা আবৃত্তি করা, আরবী নৃত্য-সঙ্গীতের আয়োজন করা, মহিলারা হাতে বা চুলে মেহেদী ব্যবহার করা, মুহাম্মাদের পাঁচ উসুলের (ইসলামের পঞ্চ ভিত্তি) অনুসরণ করা, ইসলামী রীতি মেনে সন্তান বা কারও মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, নতুন কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া, মৃতদেহ নতুন ভূমিতে দাফন করা, সবুজ বৃক্ষশাখা দ্বারা সমাধি আচ্ছাদিত করা, বিপদে-আপদে মুহাম্মাদকে আল্লাহর নবী বা রাসূল আখ্যায়িত করে তার ওসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করা, অথবা এরূপ বলা যে, কাবা হল সর্বপ্রথম ইবাদতগাহ, কিংবা বলা যে, আমি তো মুকাদ্দাস ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী খৃস্টান নই অথবা আমার পূর্বপুরুষগণ মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করায় আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন, ইত্যাদি।[৪২৭]

২. বাস্তুচ্যুতকরণ

খৃস্টানরা গ্রানাডা দখল করে নেওয়ার পরও আন্দালুস-ভূমিতে মুসলমানদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা ও নিজেদের অতি সীমিত সামর্থ্যকে পুঁজি করে গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। মুসলিম যোদ্ধাগণ প্রথমে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরপর সেখান থেকেই বিভিন্ন সময়

[৪২৭] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৩৪৬।

Scanned with CamScanner

তারা স্প্যানিশ বাহিনীর ওপর গুপ্ত হামলা চালাতেন। এসব অভিযানের মাধ্যমে তারা খৃস্টান আন্দালুসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে প্রভূত সফলতাও অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে পুরো স্পেনকে খৃস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর এ ধরনের তৎপরতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্রোহী যোদ্ধাদের পক্ষাবলম্বনকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। খৃস্টান আন্দালুস সরকার প্রথমে বিদ্রোহীদের দমন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে স্পেন সরকার সকল বিদ্রোহীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ফরমান জারী করে এবং কোন কিছু সঙ্গে না নিয়ে কেবল এক কাপড়ে মাগরেবে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করে। অবশ্য বিদ্রোহী গেরিলা যোদ্ধাগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হিজরত নিষিদ্ধ করে শাহী ফরমান জারী ছিল। এরপর প্রায় এক শ' বছর পর অর্থাৎ ১৬০৯ খৃস্টাব্দে মরিস্কোদেরও নির্বাসিত করার নির্বাহী আদেশ জারী করা হয়।[৪২৮]

৩. তদন্ত কমিশন ... নির্যাতনের এক লোমহর্ষক অধ্যায়

খৃস্টান স্পেন তার মুসলিম নাগরিকদের বড় কঠিন ও লোমহর্ষক পন্থায় খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার নীতি অবলম্বন করেছিল। আর পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়েছিল গির্জা-কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। গ্রানাডা দখলের সময় মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি খৃস্টান জাতির এই ক্রুশেডীয় মনোভাবের সামনে সামান্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এ চুক্তি প্রহসনের চুক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং এ চুক্তি ছিল ধর্ম ও খোদাভীতির পোশাকের অন্তরালে স্প্যানিশ প্রতারণামূলক নীতিতে পরিপূর্ণ। মুসলমানরা যখন খৃস্টানদের বিকৃত ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ ধরনের ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে, তখন স্প্যানিশ খৃস্টানরা তাদেরকে বিদ্রোহী ও মাগরেব-কায়রো-কন্‌স্টানটিনোপলের বহিরাগত পক্ষের কর্মী বলে আখ্যায়িত করে। এরপর শুরু হয় এসব মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা। গ্রানাডা, বাইয়াযিন ও বাশারাতের মুসলমানগণ এ সময় নির্ভীকতার সঙ্গে লড়াই করে যান এবং একপর্যায়ে তাদেরকে নির্মম ও

---

৪২৮ লেখক অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১৩২, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৫২৭-৫২৮ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৩৪৫।

Scanned with CamScanner

নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়।[৪২৯]

খৃস্টান স্পেনের নির্যাতনের ধারা কেবল বাস্তুচ্যুতকরণ ও খৃস্টধর্মে দীক্ষিতকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রচণ্ড গোঁড়া মনোভাবসম্পন্ন স্প্যানিশ কার্ডিনাল ক্যামিন্স কেবল একদিনেই গ্রানাডা ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে আশি হাজার গ্রন্থ একত্র করে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।[৪৩০]

এরপর খৃস্টান স্পেন মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের জন্য চালু করে এক নতুন পদ্ধতি। তারা এ উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যা ইতিহাসে 'তদন্ত কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ সংগঠনের কাজ ছিল সেসব মুসলমানদের খুঁজে বের করা, যারা নিজেদেরকে খৃস্টান বলে দাবি করলেও অন্তরে গোপনে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস লালন করে। যদি তারা এ ধরনের কাউকে পেত, যেমন কারও বাড়িতে কোরআন শরীফ পেত বা কাউকে নামায পড়তে দেখত কিংবা কেউ যদি মদপান না করত, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করত। বন্দীশালায় আটকে রেখে তাকে এমন শাস্তি প্রদান করা হত, যা কোন সুস্থ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কাউকে পানি দ্বারা পেট এমনভাবে পরিপূর্ণ করত, যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কারও শরীরে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা হত, শরীরের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হত, কারও পা গুঁড়িয়ে দেওয়া হত, প্রচণ্ড আঘাত করে কারও চোয়াল ভেঙে ফেলা হত।

নির্যাতনের জন্য তাদের কাছে লোহার বড় বড় পেরেক-যুক্ত এক ধরনের বাক্স ছিল। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে দেওয়া হত; ফলে লোহার পেরেকগুলো ধীরে ধীরে তার শরীরে ঢুকে যেত। কাউকে হাত-পা বেঁধে হাউজের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত; এরপর ফোঁটা ফোঁটা করে অল্প অল্প পানি পড়তে পড়তে এক সময় হাউজটি পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। এভাবে নির্যাতিত ব্যক্তিটি প্রথমে আতঙ্কে, তারপর তীব্র যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করত। তদন্ত কমিশন অনেককে জীবন্ত প্রোথিত করত। অনেককে কাঁটাযুক্ত লোহার চাবুক দ্বারা প্রহার করত। বিশেষ এক ধরনের যন্ত্র দ্বারা কারও কারও জিহ্বা কেটে ফেলা হত।

---

[৪২৯] আলী সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুওয়াহহিদীন*, পৃ : ২০৯।

[৪৩০] শাওকী আবু খলীল, *মাছরাউ গারনাতা*, পৃ : ৯৮ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৩১৬।

Scanned with CamScanner

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের বাহিনী যখন পরবর্তী সময়ে স্পেন বিজয় করেছিল, তখন তারা নির্যাতনের এসব মারাত্মক যন্ত্রপাতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং নিজেদের লেখায় এগুলোর বিবরণ উল্লেখ করেছে। তারা লিখেছে, এসব যন্ত্রপাতি এত মারাত্মক ছিল যে, এগুলো দ্বারা কোন মানুষকে শাস্তি দেওয়া হত এ কথা কল্পনা করেই নেপোলিয়ান বাহিনীর অনেক সৈন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অনেকে বমি করেছে; বরং অনেকে মূর্ছাও গেছে। অথচ আন্দালুসের মুসলিম জনগোষ্ঠী কল্পনা নয়; বাস্তবেই এসব যন্ত্রপাতির নির্মম পরীক্ষার শিকার হয়েছে।[৪৩১]

ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে, তদন্ত কমিশন কর্তৃক অভিযুক্ত মুসলিম নারীদের জন্য সেখানে বিশেষ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। অভিযুক্ত নারীর কেবল সতর ব্যতিরেকে পুরো শরীর বিবস্ত্র করা হত। এরপর তাকে বিরান ও পরিত্যক্ত কোন গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হত এবং কোন কবরের ওপর বসানো হত। তারপর অভিযুক্ত মহিলাটির মাথা দু' হাঁটুর মাঝে রেখে এমন শক্ত করে বাঁধা হত, যেন নড়াচড়া করার সামান্য শক্তিও না থাকে। তদন্ত কমিশনের লোকেরা তাকে লোহার শিকল দ্বারা কবরের সঙ্গে বেঁধে ফেলত এবং তার মাথার চুল এমনভাবে ছড়িয়ে দিত, যেন পুরো শরীর ঢেকে যায়। দূর থেকে বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে এই বিষণ্ন নারীকে দেখলে মনে হত, যেন কোন অপ্রকৃতিস্থ মহিলা বসে আছে। মহিলাটিকে এভাবেই ফেলে রাখা হত, যতক্ষণ না সে ভয়ে ও ক্ষুধায় পাগল হয়ে যায় কিংবা মৃত্যুবরণ করে।[৪৩২]

স্প্যানিশ খৃস্টানরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে পুরো আন্দালুস উপদ্বীপ খৃস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং অন্তরে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে ব্যতীত কালিমায়ে তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করার মতো কেউ বাকি ছিল না।

যে মিনারগুলো হতে আযানের সুমহান-সুমধুর ধ্বনি উচ্চারিত হত, সেখানে গির্জার ঘণ্টা স্থাপন করা হয়। যে মসজিদগুলো কালের এক দীর্ঘ পরিক্রমায় আল্লাহর যিকর ও কোরআন তেলাওয়াতের গুঞ্জরণে মুখরিত ছিল, সেখানে প্রতিমা ও ক্রুশ স্থাপন করা হয়।

---

[৪৩১] শাওকী আবু খলীল, *মাছরাউ গারনাতা*, পৃ : ১০৯-১১৩।
[৪৩২] আলী মুযহির, *মাহাকিমুত তাফতীশ*, পৃ : ৯৮।

Scanned with CamScanner

হায়! না জানি কত চোখ নীরবে অশ্রু ঝরিয়েছে! না জানি কত ব্যথিত হৃদয় অক্ষমতার নিষ্ফল মর্মযাতনায় দহন-কষ্ট শিকার করেছে! হিজরত করে মুসলিম ভাইদের কাছে আশ্রয় নিতে অক্ষম দুর্বল ও অসুস্থ কত মুসলমান না জানি সেখানে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে! তাদের হৃদয়ে জ্বলছিল বেদনার দাউ দাউ আগুন! নয়ন জুড়ে কষ্টের অশ্রুমালা! চোখের সামনে আপন সন্তান ক্রুশের পূজা করছে, মূর্তির সামনে মাথা নত করছে, শুকর ও মৃত পশু ভক্ষণ করছে, যাবতীয় গোনাহ ও মন্দের গোড়া মদ দেদারসে গিলছে; কিন্তু কিছু করার নেই! বাধা দেওয়ার বা নিষেধ করার কোন শক্তি নেই! টুঁ শব্দটিও করলে নেমে আসছে শাস্তির খড়গ। হায়! কী ভয়ানক দুর্যোগ! কী বিশাল দুর্বিপাক! যেন এক মহাপ্রলয়![৪৩৩]

স্প্যানিশ তদন্ত কমিশন ছিল নির্যাতন-নিপীড়ন ও জুলুম-অত্যাচারের এক সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। তদন্ত কমিশনের লোকেরা মুসলমানদের পেছনে লেগে থাকত এবং এমন কুৎসিত ও বিকৃত সব পন্থায় তাদেরকে শাস্তি দিত যে, শুনলেও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কারও সম্পর্কে যদি জানা যেত যে, সে শুক্রবার দিন গোসল করেছে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। ঈদের দিন কেউ ভালো পোশাক পরিধান করলে তাকে মুসলিম বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এমনকি তারা কাউকে মুসলিম বলে সন্দেহ করলে তাকে বিবস্ত্র করে ফেলত। যদি তাকে বা তার তার পরিবারের কাউকে খতনাকৃত পেত, তাহলে তার ও তার পরিবারের অবধারিত পরিণতি হত মৃত্যুদণ্ড।[৪৩৪]

দিওয়ানে তাহকীক (তদন্ত কমিশনের পোশাকী নাম)-এর গঠনতন্ত্রে মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের বিচার করার বৈধতাও ছিল। জীবিত ব্যক্তিদের ন্যায় মৃত ব্যক্তিদের ওপরও আইন জারী হত এবং বিভিন্ন শাস্তিদণ্ড ঘোষিত হত। তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হত, তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করে শাস্তি হিসেবে তা পোড়ানো হত, কবর খুঁড়ে তাদের দেহাবশেষ বের করে বিশেষ শোভাযাত্রার মাধ্যমে তা ভস্ম করা হত। তদ্রূপ কারও ওপর আরোপিত শাস্তির বিধান তার অনুপস্থিতিতে তার সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ওপর আরোপ করা হত। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ও বংশধরদেরকে

---

[৪৩৩] অজ্ঞাত, *নুবযাতুল আছর*, পৃ : ১৩০-১৩১।
[৪৩৪] সাল্লাবী, *দাওলাতুল মুওয়াহহিদীন*, পৃ : ২১১।

Scanned with CamScanner

সাধারণ পেশাসমূহ হতে সরিয়ে হীন ও নিম্নমানের নির্দিষ্ট কিছু পেশায় নিয়োগ দেওয়া হত।[৪৩৫]

আন্দালুস পতনের চার শতাব্দী পর ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান স্পেনে অভিযান চালান এবং ১৮০৮ খৃস্টাব্দে এক রাজকীয় ফরমান জারী করে স্পেনে তদন্ত কমিশনের সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও বাতিল ঘোষণা করেন।

ফরাসী অভ্যুত্থানের পর স্পেনে প্রবেশকারী ফরাসী সেনাবাহিনীর জনৈক সামরিক কর্মকর্তার বর্ণনায় আমরা সে সময়ের কিছু বিবরণ জানব। স্পেনে ফ্রেঞ্চ অভিযানে কর্মরত সামরিক কর্মকর্তা কর্নেল লেমোটেস্কি বলেছেন,

আমি ১৮০৯ খৃস্টাব্দে স্পেনে যুদ্ধরত ফরাসী বাহিনীতে ছিলাম। রাজধানী মাদ্রিদে যেসব সেনা ডিভিশন কাজ করছিল, তার মধ্যে আমার ডিভিশনও ছিল। সম্রাট নেপোলিয়ান ১৮০৮ খৃস্টাব্দে স্পেনে তদন্ত কমিশনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারী করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাস্তবে এ ফরমান কার্যকর হতে বিলম্ব হচ্ছিল।

বাতিল ঘোষিত তদন্ত কমিশনের দায়িত্বশীল ক্যাথলিক পাদ্রীগণ (The Society of Jesus) এ ঘোষণায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং এ সিদ্ধান্তের প্রতিশোধ নিতে ও ফরাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করতে যে কোন ফরাসীকে ধরতে পারলেই হত্যা করার ও কঠিন শাস্তি প্রদানের সংকল্প করে। তাদের ধারণা ছিল এর ফলে হয়তো ফরাসী সেনাবাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে স্পেন ছেড়ে চলে যাবে এবং পরিস্থিতি আবারও তাদের অনুকূলে চলে আসবে।

একদিন রাতে টহল দেওয়ার সময় আমি মাদ্রিদের এমন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, যেখানে লোক চলাচল খুব কম। হঠাৎ অস্ত্রধারী দু'জন ব্যক্তি আমার ওপর হামলা চালাল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা করা। জীবন বাঁচাতে আমি কঠিনভাবে রুখে দাঁড়ালাম। ঠিক সে সময় যদি শহরে টহলের দায়িত্ব পালনরত আমাদের একটি সেনাদল সেখানে উপস্থিত না হত, তাহলে আমি প্রাণে বাঁচতে পারতাম না। টহলরত এ দলটি ছিল একটি অশ্বারোহী স্কোয়াডন। তারা আলো হাতে টহল দিচ্ছিল এবং রাত জেগে শহরের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছিল। তাদেরকে আসতে দেখেই আমার ওপর আক্রমণ করা আততায়ী দু'জন রাতের অন্ধকারে

---

[৪৩৫] দেখুন : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৭/৩৩৮।

Scanned with CamScanner

পালিয়ে গেল। তাদের পোশাকে মনে হচ্ছিল তারা তদন্ত কমিশনের সদস্য। এরপর আমি দ্রুত মাদ্রিদে আমাদের সেনাপ্রধান মার্শাল সোল্ট-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাকে বিস্তারিত জানালাম। সব শুনে তিনি বললেন, প্রতিদিন রাতেই যে আমাদের কিছু সৈন্য আততায়ী হামলায় মারা যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে তা এসব দুষ্কৃতিকারীদেরই কাজ। সুতরাং এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা এবং সম্রাটের (নেপোলিয়ান) ফরমান বাস্তবায়ন করে এদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তুমি এখনই এক হাজার সৈন্য ও চারটি কামান নিয়ে তদন্ত কমিশনের আশ্রমে অভিযান পরিচালনা কর এবং এসব ফাদার-পাদ্রীদের আটক কর।

আমরা তাদের আশ্রমে অভিযান চালালে তারা ভেতর থেকে গুলি নিক্ষেপ করতে লাগল। ফলে বাধ্য হয়েই শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে হল। আমি আমার সৈন্যদের আদেশ করলাম, সামরিক আদালতে বিচারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করার জন্য তোমরা এসব পাদ্রী ও তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বপালনকারী প্রহরীদেরকে জীবিত গ্রেফতার করবে। এরপর আমরা ভেতরের প্রতিটি হলরুম ও কক্ষে অনুসন্ধান চালালাম। সারিবদ্ধ চেয়ার, মেঝেতে বিছানো ইরানী কার্পেট, দেয়ালে স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিমা, বড় বড় অফিসরূম কিছুই আমাদের অনুসন্ধানের বাইরে রইল না। কক্ষগুলোর মেঝে তৈরি করা হয়েছিল মোমপালিশ করা সুমসৃণ কাঠ দ্বারা। কামরাগুলো বিশেষ ধরনের সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত ছিল। পুরো প্রাঙ্গনটিকে মনে হচ্ছিল যেন কোন জাকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদের অংশ, যেখানে অতি বিলাসী শাসকবর্গই কেবল বসবাস করেন। পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, পাদ্রীদের প্রতিকৃতির সামনে জ্বলতে থাকা মোমগুলো থেকে এই সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। এসব মোমবাতিতে গোলাপজল মেশানো হয়েছিল।

আমরা অনুসন্ধান করে তাদের নির্যাতন সেল আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। আমরা পুরো আশ্রম, বিভিন্ন করিডোর, খিলান ও অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান চালালাম। কিন্তু তদন্ত কমিশনের কার্যক্রমের কোন আলামতই খুঁজে পেলাম না। ব্যর্থ ও অপারগ হয়ে আমরা আশ্রম থেকে বের হয়ে আসার মনস্থ করলাম।

তল্লাশী চলাকালে পাদ্রীগণ শপথ করে দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার বলছিল যে, তাদের আশ্রম সম্বন্ধে যা প্রচার করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা অপবাদ। আশ্রমের প্রধান পাদ্রী ক্ষীণ ও দুর্বল স্বরে তার ও তার অনুসারীদের

Scanned with CamScanner

নিরপরাধ বলে দাবি করছিল। তার মাথা ছিল অবনত, চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে টলমল! আমি আমার সৈন্যদেরকে আশ্রম ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিতে আদেশ করলাম।

কিন্তু লেফটেনেন্ট ডি লিল্ আমাকে সামান্য বিলম্ব করার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, কর্নেল! আমি কি এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি?! আমি তাকে বললাম, আমরা তো পুরো আশ্রমে তল্লাশি চালিয়েছি; কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাইনি। সুতরাং লেফটেনেন্ট! আপনি ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন?! উত্তরে তিনি বললেন, আমি এ কক্ষগুলোর মেঝে পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছি। আমার মন বলছে, সব রহস্য এই মেঝের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

লেফটেনেন্ট যখন এ কথা বললেন, পাদ্রীরা আমাদের দিকে অস্থির ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আমি তাকে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখার অনুমতি দিলাম। তিনি প্রথমে সৈন্যদেরকে মেঝেতে পেতে রাখা দামী দামী কার্পেটগুলো তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এরপর নির্দেশ দিলেন প্রতিটি কামরার মেঝেতে প্রচুর পরিমাণ পানি ঢালতে। আমরা পানির গতিবেগ পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, একটি কামরার মেঝে পানি চুষে নিচ্ছে! আনন্দের আতিশয্যে লেফটেনেন্ট ডি লিল হাততালি দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, দেখুন, এটাই হল (ভূগর্ভস্থ কামরার) দরজা। আমরা দেখতে পেলাম মেঝের একটি অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল। আশ্রম-পরিচালকের অফিসকক্ষে পায়ের কাছে স্থাপিত একটি ছোট আংটার মাধ্যমে অতি সুক্ষ্ম কৌশলে এ দরজাটি খোলা হত।

আমাদের সৈনিকরা বন্দুকের বেয়নেট দিয়ে দরজাটি ভাঙতে লাগল। আমি দেখতে পেলাম, ভয়ে উপস্থিত পাদ্রীদের চেহারা পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে।

দরজা ভাঙার পর আমাদের সামনে ভূগর্ভে চলে যাওয়া একটি সিঁড়ি দৃশ্যমান হল। এবার নিচে নামার পালা। আমি দ্রুত এক মিটারের অধিক লম্বা একটি মোমবাতি নিলাম। মোমবাতিটি তদন্ত কমিশনের সাবেক একজন প্রধানের প্রতিকৃতির সামনে প্রজ্বলিত ছিল। আমি যখন নিচে নামতে উদ্যত হলাম, জনৈক খৃস্টান পাদ্রী আমার কাঁধে কোমলভাবে হাত রেখে বলল, বৎস! এটি অত্যন্ত পবিত্র মোমবাতি! যুদ্ধের রক্তে রঞ্জিত তোমার অপবিত্র হাতে এটি বহন করো না।

Scanned with CamScanner

উত্তরে আমি তাকে বললাম, হ্যালো ম্যান! বরং এভাবে বল যে, অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের রক্তে কলুষিত তোমাদের এই মোমবাতি স্পর্শ করে আমার হাত অপবিত্র করা উচিত হবে না। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব, আমাদের মধ্যে কারা অপবিত্র; কারা খুনি-স্যাডিস্ট?!

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে আমি নিচে নামতে লাগলাম। আমাদের সমস্ত অফিসার ও সৈনিকরা কোষমুক্ত উদ্যত তরবারি হাতে আমার অনুসরণ করল। সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর-দর্শন এক বিশাল হলরুম। এটাই তাদের ভাষায় তদন্ত ও বিচার-কক্ষ। হলরুমটির মাঝ বরাবর বড় বড় লোহার আংটা লাগানো শ্বেত মর্মর পাথরের একটি স্তম্ভ। তাদের আইনে অপরাধী ব্যক্তিদের বিচারের সময় বেঁধে রাখার জন্য প্রতিটি আংটার সঙ্গে শিকল যুক্ত করা আছে।

স্তম্ভটির সামনে একটি মঞ্চ ছিল। নিরপরাধ মানুষদের বিচার করার জন্য তদন্ত কমিশনের প্রধান ও বিচারকগণ এখানে বসতেন। এরপর আমরা আশ্রমের মেঝের নীচে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অবস্থিত নির্যাতন সেলে প্রবেশ করলাম, যেখানে আটক ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের নামে সহজ ভাষায় মানব-শরীরের হাড় গুঁড়ো করা হত।

নির্যাতন সেলগুলোতে যা দেখলাম, তাতে আমরা পুরোপুরি নির্বাক হয়ে গেলাম। সে স্মৃতি মনে করলে সারা জীবনই দেহ-মন কেঁপে ওঠবে, ঘৃণায় ভরে যাবে।

আমরা মানুষের শরীরের আকৃতির সমান ছোট ছোট কিছু কক্ষ দেখতে পেলাম। কিছু কামরা ছিল অনুভূমিক, কিছু কামরা উল্লম্ব। অনুভূমিক কামরাগুলোতে বন্দীকে মৃত্যু পর্যন্ত দাঁড় করিয়েই রাখা হত। আর উল্লম্ব কক্ষগুলোতে বন্দীদেরকে আমৃত্যু সটান শুইয়ে রাখা হত। সংকীর্ণ কক্ষগুলোতে বন্দী ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার মৃতদেহ সেখানেই পড়ে থাকত; একসময় হাড় থেকে গোশত খসে পড়ত এবং কীট-পতঙ্গ তা খেয়ে ফেলত। মৃতদেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধ দূর করতে তারা বাইরের দিকে ছোট ছোট কিছু জানালা করে রেখেছিল।

কক্ষগুলোতে আমরা এমন অনেক কঙ্কাল আবিষ্কার করেছি, যা তখনও শিকল পরিহিত ছিল।

বন্দীদের মাঝে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির মানুষ ছিল। তাদের বয়স ছিল

Scanned with CamScanner

চৌদ্দ থেকে সত্তরের মধ্যে। অনেক বন্দীকে আমরা শৃঙ্খল ভেঙে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তাদের অবস্থা তখন জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়।

সীমাহীন নির্যাতনের কারণে তাদের অনেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। বন্দীগণ সকলেই ছিল বিবস্ত্র। তাদের অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈনিকগণ নিজেদের পোশাক খুলে তাদেরকে পরিয়ে দিচ্ছিল।

আমরা বন্দীদেরকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর মুক্ত আলোতে বের করে আনলাম, যেন দীর্ঘদিন পর হঠাৎ আলোর স্পর্শে তাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট না হয়ে যায়। মুক্ত পৃথিবীর ছোঁয়ায় এসব বন্দীদের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছিল। যেসব সৈন্যগণ তাদেরকে এই ভয়ঙ্কর নির্যাতনের কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিল এবং বলতে গেলে নতুন জীবন দান করেছিল, তারা তাদের হাতে-পায়ে চুমু খাচ্ছিল। এটি ছিল এমন এক দৃশ্য, যা কঠিন হৃদয়কেও অশ্রুজলে সিক্ত করবে।

এরপর আমরা অন্যান্য কক্ষগুলোর দিকে গেলাম। সেখানে আমরা যা দেখলাম, তাতে শরীর কেঁপে উঠল। নির্যাতনের অভিনব সব যন্ত্রপাতি আমরা আবিষ্কার করলাম। এর মধ্যে ছিল মানুষের শরীরের হাড় গুঁড়ো করার যন্ত্র। প্রথমে তারা বন্দীর পায়ের হাড় গুঁড়ো করত। এরপর একে একে বুক, মাথা ও হাতের হাড় ভেঙে ফেলত। এভাবে নির্যাতিত লোকটির পুরো শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। যন্ত্রের আরেক পাশ দিয়ে চূর্ণ হাড়গুলোর দলা, টুকরো টুকরো গোশত-মিশ্রিত রক্ত বের হয়ে আসত। নিরীহ অসহায় নিরপরাধ বন্দীদের সঙ্গে তারা এমন নির্মম আচরণই করত।

এরপর আমরা একজন মানুষের মাথার আকৃতির সমান একটি বাক্স উদ্ধার করলাম। তারা যাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করত, তার হাত-পা শিকল দ্বারা এমনভাবে বেঁধে ফেলত, যেন নড়াচড়া করার সামান্য শক্তিও না থাকে। এরপর তার মাথা বাক্সের মধ্যে রাখত। বাক্সের উপরের দিকে কয়েকটি ছোট ছোট ছিদ্র ছিল। ছিদ্রগুলো দিয়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে এক মিনিট পর পর বেচারা বন্দীর মাথার ওপর ঠাণ্ডা পানির ফোঁটা পড়তে থাকত। এই বিচিত্র শাস্তিতে অধিকাংশ বন্দীই পাগল হয়ে যেত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই তার মাথা বাক্সে আটকানো থাকত।

নির্যাতনের আরেকটি যন্ত্র হল ধারালো কয়েকটি ছুরিবিশিষ্ট কফিন আকৃতির একটি বাক্স। যুবক বয়সী বন্দীদেরকে তারা এ বাক্সে শোয়াত। এরপর

Scanned with CamScanner

বাক্সের উপরের ঢাকনা বন্ধ করে দিত। উপরের অংশটিতে ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির ছুরি লাগানো ছিল। ঢাকনা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অসহায় বন্দীর শরীর কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেত এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে আলাদা হয়ে যেত।

আমরা হুকের আকৃতির কিছু যন্ত্রপাতিও উদ্ধার করেছি, যেগুলো বন্দীদের জিহ্বায় গাঁথা হত; এরপর তা ধরে টান দিলে জিহ্বাসুদ্ধ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বের হয়ে আসত। কিছু হুক এমন ছিল, যেগুলো মহিলাদের স্তনে বিদ্ধ করে প্রচণ্ড জোরে টান দেওয়া হত; ফলে তা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অনেক নারীর স্তন ছুরি দিয়েও কাটা হত।

আমরা সেখান থেকে লোহার কাঁটাযুক্ত কিছু চাবুকও আবিষ্কার করলাম। বন্দীদেরকে বিবস্ত্র করে এসব চাবুক দ্বারা পেটানো হত। ফলে তাদের শরীরের গোশত খসে পড়ত এবং হাড় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত।

খৃস্টান পাদ্রীদের এই আশ্রমে নির্যাতন-সেল আবিষ্কারের সংবাদ মাদ্রিদে পৌঁছতেই হাজার হাজার মানুষ শাস্তি দেওয়ার এসব উপকরণ দেখার জন্য ছুটে এল। তারা প্রধান পাদ্রীকে ধরে হাড় ভাঙার মেশিনের মধ্যে ফেলে দিল; ফলে মুহূর্তের মধ্যে তার শরীরের হাড়গোড় কিমা হয়ে গেল। নির্যাতন কেন্দ্রের তথ্য গোপনকারীকে ধরে জনগণ ছুরিযুক্ত বাক্সে ভরে বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে দিল। ফলে ছুরির আঘাতে তার প্রাণহীন দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। এ দু'জনের মৃতদেহ বাক্স থেকে বের করে উত্তেজিত জনগণ অন্যান্য পাদ্রীদেরকেও এভাবে হত্যা করল। মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যেই উন্মত্ত জনসাধারণের হাতে তেরজন পাদ্রী মারা গেল। এরপর সকলে আশ্রমটি ভাঙতে শুরু করল।[৪৩৬]

---

[৪৩৬] আলী মুযহির, *মাহাকিমুত তাফতীশ*, পৃ : ১৩২-১৩৯।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দশম পরিচ্ছেদ

সমকালীন গ্রানাডার যুগসচেতন কয়েকজন আলিমের কথা

১. শরীফ ইদরীসী রহ.

তার পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইদরীসী হাসানী আততালিবী। জন্ম ৪৯৩ হিজরীতে (১১০০ খৃস্টাব্দে)। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিশারদ। সিউটায় জন্মগ্রহণ করলেও শিক্ষা-দীক্ষা ও বেড়ে ওঠা কর্ডোভায়। ন্যায়গতভাবেই শরীফ ইদরীসীকে মুসলিম ভূগোলবিদগণের স্তম্ভ বলে গণ্য করা হয়। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক সুবিশাল ভূগোলকোষ, তার কালজয়ী গ্রন্থ- 'নুযহাতুল মুশতাক্ব ফী ইখতিরাক্বিল আফাক্ব' (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)।

তিনি আন্দালুস উপদ্বীপ চষে বেড়িয়েছেন এবং প্রচুর সফর করেছেন। তিনি ফ্রান্স ও দক্ষিণ ইংল্যান্ডের উপকূলীয় অঞ্চলেও পৌঁছেছিলেন। এরপর তিনি আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মরক্কোয় পৌঁছেন এবং মরক্কোর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে সফর করেন। কিছুদিন তিনি মার্‌রাকিশে বসবাস করেন, কিছুদিন বসবাস করেন কাসানতিনায়[৪৩৭]। এরপর তিনি প্রাচ্যে সফর করেন এবং এশিয়া মাইনর অঞ্চলে যান। বিস্তৃত ও সুগভীর ভৌগোলিক জ্ঞান বিনির্মাণে তার এসব ভ্রমণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল এবং তার অমর রচনা 'নুযহাতুল মুশতাক' সংকলনে প্রাথমিক ভূমিকারূপে কাজ করেছিল।

সিকিল্লিয়া দ্বীপে এসে শরীফ ইদরীসীর ভ্রমণ শেষ হয়। সেখানে সিকিল্লিয়া দ্বীপের তৎকালীন শাসক দ্বিতীয় রজার নিজ প্রাসাদে তাকে স্বাগত জানান এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রদানের পাশাপাশি তার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সিকিল্লিয়া দ্বীপে পৌঁছার পরই একজন পরিব্রাজক ও

---

[৪৩৭] পূর্ব আলজেরিয়ার একটি নগরী।

Scanned with CamScanner

অনন্যসাধারণ ভূগোলবিশারদ আলিম হিসেবে ইদরীসীর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিকিল্লিয়াতে অবস্থানকালেই ইদরীসী বিশ্বের এমন একটি মানচিত্র অঙ্কনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যা নিকট অতীতেও সবচে' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ মানচিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এরপর তিনি ভূগোল বিষয়ে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাতে তৎকালীন আবিষ্কৃত বিশ্বের নানা তথ্য উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটিতে তৎকালীন বিশ্বের ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রসমূহের পরিস্থিতি ও চিত্র, সাগর-পাহাড়, ফসলাদি, বিস্ময়কর নিদর্শনাদির বিবরণসহ প্রতিটি এলাকার অধিবাসীদের অবস্থা, দেহকাঠামো, ধর্ম, পোশাক, ভাষা ইত্যাদির বিবরণও প্রদান করা হয়েছে। পনের বছর সময় ব্যয় করে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন এবং ৫৪৯ হিজরীতে (১১৫৪ খৃস্টাব্দে) এর সংকলন সমাপ্ত করেন।

তার এই কালজয়ী গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা যিরিক্‌লী মন্তব্য করেছেন,

> তার এ গ্রন্থটি ইউরোপ ও ইটালিয়ান অঞ্চলসমূহের বিবরণ সম্পর্কে আরবীতে লেখা সবচে' বিশুদ্ধ গ্রন্থ। প্রতীচ্য সম্পর্কে যেসব আরব আলিম কলম ধরেছেন, তারা সকলেই তার এই গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন।[৪৩৮]

ফরাসী বিশ্বকোষে ইদরীসীর আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে,

> ইদরীসীর গ্রন্থটি হল আমাদের জন্য আরব আলিমগণের রেখে যাওয়া সবচে' সমৃদ্ধ ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্ধারণের পাশাপাশি এমন সব সূক্ষ্ম বিবরণ রয়েছে, যা গ্রন্থটিকে মধ্যযুগের ভৌগোলিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম দলীলে পরিণত করেছে।

শরীফ ইদরীসীর বিখ্যাত রচনাসমূহ হল,

- নুযহাতুল মুশতাক্ব ফী ইখতিরাক্বিল আফাক্ব (نزهة المشتاق في اختراق الأفاق)
- আলজামি' লি সিফাতি আশতাতিন নাবাত[৪৩৯] (الجامع لصفات أشتات النبات)

---

[৪৩৮] যিরিক্‌লী, *আলআ'লাম*, ৭/২৪।

[৪৩৯] উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিত *'আলজামি' লি সিফাতি আশতাতিন নাবাত'* গ্রন্থটিতে ৫৬০ প্রজাতির উদ্ভিদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনুল বাইতার (৫৯৩-৬৪৬ হি.) তার এ গ্রন্থের উপরই নির্ভর করেছেন। ইদরীসী যদি ভূগোলশাস্ত্রে তার সুবিশাল কর্ম অবদানের জন্য খ্যাতি লাভ না করতেন, নিশ্চিত করেই তার নাম পৃথিবীখ্যাত শ্রেষ্ঠতম উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের তালিকায়ও লিপিবদ্ধ হত।

Scanned with CamScanner

- রাওযুল উনস ওয়া নুযহাতুন নুফুস(روض الأنس ونزهة النفس)
- উনসুল মুহাজ ওয়া রাওযুল ফারাজ (أنس المهج وروض الفرج)

এ ছাড়াও তিনি রৌপ্যগোলকের ওপর পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। শরীফ আলইদরীসী ৫৬০ হিজরীতে (১১৬৫ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।

২. লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ.

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আসসিলমানী। তিনি ছিলেন একাধারে উযীর, ঐতিহাসিক ও প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক। তার পূর্বপুরুষগণ 'বনু উযীর' বা মন্ত্রিপরিবার নামে পরিচিত ছিল। জন্ম ৭১২ হিজরীতে (১২১২ খৃস্টাব্দে)। জন্ম ও বেড়ে ওঠা গ্রানাডাতেই। ৭৩৩ হিজরীতে গ্রানাডার সুলতান আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন ইসমাঈল এবং পরবর্তীতে তার পুত্র আলগনী বিল্লাহ মুহাম্মাদ তাকে উযীর নিযুক্ত করেন এবং তাকে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করেন। কিন্তু হিংসুকদের কুৎসা ও পরনিন্দায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি মাগরেবের তৎকালীন মারীনী সুলতান আবদুল আযীয বিন আলী মারীনীর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তার রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এরপর তিনি গোপনে আন্দালুস ত্যাগ করে তিলিমসানে চলে যান। সুলতান আবদুল আযীয তখন তিলিমসানে অবস্থান করছিলেন। তিনি পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে লিসানুদ্দীনকে স্বাগত জানান এবং লিসানুদ্দীনের সন্তান ও পরিবারকে নিয়ে আসতে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল গ্রানাডায় পাঠান। তারা তিলিমসানে পৌঁছার পর তাদেরকেও তিনি যথাযথ সম্মান প্রদান করেন। এরপর লিসানুদ্দীন প্রাচীন ফেয এলাকায় বসবাস করতে থাকেন।

ঐতিহাসিক মাক্কারী তার সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি হলেন বিখ্যাত উযীর লিসানুদ্দীন আলমুযারী, যার সুনাম ও সুখ্যাতি প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আম্বর-আবীরে সুবাসিত তার যশ ও খ্যাতি। গদ্য বলুন বা পদ্য; চিকিৎসাবিজ্ঞান কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত অন্যান্য শাখা, সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। তার রচনাবলিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (অবশ্য প্রকৃত বাস্তবতা হল,) সর্বজ্ঞ সত্তার (আল্লাহর) ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না। তিনি ছিলেন আলিমকুলের পতাকাবাহী; অসি-

Scanned with CamScanner

মসির সেবাধন্য এক বিখ্যাত উযীর। যার সুখ্যাতি জগতজোড়া, তার পরিচিতি তুলে ধরারই-বা কী দরকার! যার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন জ্ঞানী-গুণী বোদ্ধাগণ, তার সম্বন্ধে কিছু বলা যে বেকার!

ইবনুল খতীবের দুর্যোগ

সুলতান আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাঈদ বিল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি পদচ্যুত হন এবং মাগরেবের শাসনভার গ্রহণ করেন সুলতান আলমুসতানসির আহমদ বিন ইবরাহীম। সুলতান আলমুসতানসিরের শাসনামলে কিছু দুর্যোগের সময় গ্রানাডার শাসক গনী বিল্লাহ তাকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে সহায়তা করেন। এসব শর্তের মধ্যে এটিও ছিল যে, ইবনুল খতীবকে গ্রানাডা-সুলতানের হাতে তুলে দিতে হবে। শর্ত মতো আলমুসতানসির লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবকে গ্রেফতার করে এ বিষয়ে গ্রানাডার সুলতানকে অবহিত করলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র গনী বিল্লাহ তার উযীর ইবনে যারমাককে ফেয নগরীতে প্রেরণ করেন। সেখানে ইবনুল খতীবের ভাগ্য নির্ধারণী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকেও সভায় উপস্থিত করা হয়। সভায় তাকে ধর্মত্যাগ ও দার্শনিকদের মতবাদ গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। সভায় উপস্থিত ফকীহগণের কেউ কেউ তাকে হত্যার ফতোয়া প্রদান করেন। এরপর তাকে পুনরায় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐতিহাসিক আননাসিরী রহ.-এর ভাষ্যমতে এরপর শুরাপ্রধান সুলাইমান বিন দাউদ তার অনুচরদের মধ্য হতে কিছু দুষ্কৃতিকারীকে দিয়ে চক্রান্ত করেন এবং তারা রাতের বেলা জেলখানায় প্রবেশ করে ইবনুল খতীবকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। এভাবে ৭৭৬ হিজরীতে (১৩৭৪ খৃস্টাব্দে) নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ.। তাকে ফেয নগরীর বাবুল মাহরূক কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব সর্বকালে উৎসগ্রন্থ বলে স্বীকৃত মূল্যবান অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

- আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা (الإحاطة في أخبار غرناطة),
- আ'মালুল আ'লাম ফী মান বূই'য়া ক্বলাল ইহতিলাম মিন মুলূকিল ইসলাম (أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام)
- আললামহাতুল বাদারিয়্যা ফিদ দাওলাতিন নাসরানিয়্যা (اللمحة البدرية في الدولة النصرانية)

Scanned with CamScanner

- রক্বমুল হুলাল ফী নায্মিদ দুয়াল (رقم الحلل في نظم الدول)
- মুক্বনিআ'তুস সা-ইল আ'নিল মারাযিল হা-ইল (مقنعة السائل عن المرض الهائل)
- রাওযাতুত তা'রীফ বিল হুব্বিশ শারীফ (روضة التعريف بالحب الشريف)
- আ'মালু মান তাব্বা লিমান আহাব্বা (عمل من طب لمن أحب)
- আত্তাজুল মুহাল্লা ফী মুসাজালাতিল ক্বাদহিল মুআ'ল্লা (التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى)
- আলউসূল লি-হিফযিস সিহ্হাতি ফিল ফুসূল (الوصول لحفظ الصحة في الفصول)
- মি'য়ারুল ইখতিয়ার ফী যিকরিল মাআ'হিদি ওয়াদ দিয়ার (معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار)
- আলকাতীবাতুল কা-মিনাহ (الكتيبة الكامنة)
- খাতরাতুত তাইফ ফী রিহলাতিশ শিতা ওয়াস সাইফ (خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف)
- দুর্‌রারুত তানযীল (درة التنزيل) ইত্যাদি ।[৪৪০]

৩. ইবনে বতুতা রহ.

তার পুরো নাম শায়খ ফকীহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আললিওয়াতী আততান্‌জী। তিনি ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৪ খৃস্টাব্দে) তানজায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন বিখ্যাত বার্বার গোত্র লিওয়াতা বংশোদ্ভূত। লিওয়াতা গোত্রের শাখা-প্রশাখা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে লিবিয়া পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত উপকূলীয় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

ইবনে বতুতাকে সবচে' বিখ্যাত আরব পরিব্রাজক হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং সন্দেহাতীতভাবেই তিনি হিজরী অষ্টম শতাব্দী ও খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক ছিলেন। জীবনের আটাশটি বছর তিনি তৎকালীন আবিষ্কৃত-বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার এই দীর্ঘ ভ্রমণ-পরিক্রমার সূচনা হয় মাতৃভূমি তানজা থেকে। উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকা পাড়ি দিয়ে তিনি প্রথমে মিশরে পৌঁছেন। এরপর সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে আরব উপদ্বীপ, শাম, পারস্য, বাহরাইন, ওমান, পূর্ব

---

[৪৪০] লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব-এর বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত জানতে দেখুন *'আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা'* গ্রন্থের সম্পাদনায় ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান-এর লিখিত ভূমিকা।

Scanned with CamScanner

আফ্রিকা সফর করেন। এরপর তিনি এশিয়া মাইনর, ক্রিমিয়া, ভলগা (Volga) নদীর দক্ষিণ অববাহিকা হয়ে কনস্টানটিনোপলে প্রবেশ করেন। এরপর পূর্বদিকে রওয়ানা হয়ে খাওয়ারযিম, বোখারা, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান সফর করেন।

এরপর তিনি পৌঁছেন ভারতবর্ষে। সেখানে আট বছর অবস্থান করার পর মালদ্বীপ, পূর্ব ভারতের কিছু দ্বীপ ও চীন সফর করেন। ১৩২৫ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে শুরু হওয়া তার এ সফর ছিল মূলত মাতৃভূমি তানজার উদ্দেশে প্রত্যাবর্তনের সফর। ১৩৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি তানজায় ফিরে আসেন। ইবনে বতুতা তার এই সুদীর্ঘ সফরে বিভিন্ন দেশের শাসক-প্রশাসকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে তাদের গুণকীর্তন করে তাদের কাছ থেকে সফরের জন্য অনুদান কামনা করতেন।

এরপর তিনি আরও দু'বার সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন। প্রথমবার ১৩৫০ খৃস্টাব্দে আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়বার ১৩৫২ খৃস্টাব্দে সুদান ও মধ্য আফ্রিকায়। ১৩৫৪ খৃস্টাব্দে তিনি ফেয নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরবর্তী সময়ে সেখানেই অবস্থান করেন। ফেযে অবস্থানকালেই তিনি তার ভ্রমণবৃত্তান্তের সংকলন 'তুহফাতুন নায্যার ওয়া গারাইবুল আমছার ওয়া আ'জাইবুল আসফার' (تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجائب الأسفار) (যা আমাদের কাছে 'ইবনে বতুতার সফরনামা' নামে সমধিক পরিচিত)-এর শ্রুতলিপির কাজ সমাধা করেন। মাগরেবী সুলতান আবু আফ্ফান আলমারীনীর রাজপ্রাসাদের লিপিকার আলী ইবনুল জুযী তার মুখ থেকে শুনে শুনে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি ১৩৫৬ খৃস্টাব্দের কথা।

ইবনে বতুতা তার সুদীর্ঘ পরিব্রাজক-জীবনে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। প্রিয় পাঠক! ইবনে বতুতা যে যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তার কথা একটু কল্পনা করুন। ভাবুন, কেমন ছিল সে যুগের পথ-ঘাট এবং কেমন ছিল যাতায়াত-বাহন? এরপর কল্পনা করুন প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার দৃশ্য। আল্লাহু আকবার! কী বিস্ময়কর তার এই সফর! কী বিস্ময়কর সংকল্প ও মানসিক দৃঢ়তার অধিকারী এই মহান পরিব্রাজক ইবনে বতুতা!

'তুহফাতুন নায্যার' গ্রন্থের বিবরণের ভিত্তিতে আমরা ইবনে বতুতার পুরো ভ্রমণকালকে তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

Scanned with CamScanner

প্রথম সফর: এ সফরের ব্যাপ্তিকাল ১৩৩৪ থেকে ১৩৪৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সফরে তিনি উত্তর আফ্রিকা, মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ ও ইয়ামেন ভ্রমণ করেন। এরপর ইস্তাম্বুল সফর করে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন। এরপর ভারতবর্ষ সফর করেন। এরপর তৎকালীন ভারত-নৃপতি মুহাম্মাদ শাহ-এর প্রেরিত কুটনৈতিক মিশনের সদস্যদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন উপদ্বীপ, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও চীন ভ্রমণ করেন।

দ্বিতীয় সফর: ১৩৫১ থেকে ১৩৫২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এ সফরে তিনি আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন।

তৃতীয় সফর: ১৩৫২ থেকে ১৩৫৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এ সফরে ইবনে বতুতা সুদান ও পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণ করেন।

পূর্ববর্তী অন্যান্য পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তের তুলনায় ইবনে বতুতার সফরনামার স্বাতন্ত্র ও ঐতিহাসিক উচ্চ মূল্যমানের কারণ হল তিনি তার ভ্রমণবৃত্তান্তে অর্জিত শিক্ষা ও অর্জনের কথা অন্যদের তুলনায় নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ছোট-বড় যা কিছু তিনি দেখেছেন, শুনেছেন, উপলব্ধি করেছেন, কিছুই বাদ দেননি; বরং বিস্তারিতভাবে নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে তুলে এনেছেন। আর তাই ইবনে বতুতাকে যদিও 'আরব সপ্ত-পরিব্রাজক'[৪৪১]-এর একজন বলে গণ্য করা হয়; কিন্তু ভ্রমণ করা দেশ ও সমাজসমূহের সামাজিক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরাসহ অন্যান্য বিবেচনায় সাতজনের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম স্বাতন্ত্রের অধিকারী।

ইবনে বতুতার শিষ্য এবং তার গ্রন্থের লিপিকার ইবনুল জুযী বলেছেন,

> এ বিষয়টি বোদ্ধামহলের কাছে সুস্পষ্ট যে, শায়খ (ইবনে বতুতা) ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক। যারা তাকে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন, (আমার ধারণা) তারা মোটেও অতিশয়োক্তি করেন না। সুদীর্ঘ ভ্রমণের পর তিনি ফেয নগরীকে নিজের আবাসভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

ইবনে বতুতা ৭৭৯ হিজরীতে (১৩৭৭ খৃস্টাব্দে) মার্‌রাকিশে ইন্তেকাল করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গ্রন্থাবলি ও মানচিত্রসমূহে ইবনে বতুতাকে 'মুসলিম পরিব্রাজকগণের প্রধান' অভিধায় ভূষিত করেছে।

---

[৪৪১] আরব সপ্ত-পরিব্রাজক হলেন, আলমাকদিসী, ইদরীসী, ইবনে জুবায়র, সামআনী, ইয়াকুত, আলবিরুনী ও ইবনে বতুতা।

Scanned with CamScanner

৪. ইবনুল বান্না মার্‌রাকিশী রহ.

তিনি হলেন শায়খ মুহাক্কিক আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন উসমান ইবনুল বান্না আযদী মার্‌রাকিশী। তার পিতা রাজমিস্ত্রী ছিলেন বিধায় তিনি ইবনুল বান্না নামে পরিচিতি লাভ করেন। জন্ম ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃস্টাব্দে) মার্‌রাকিশে। তার রচিত বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হল,

- হাশিয়াতুন আ'লাল কাশশাফ (حاشية على الكشاف)
- মুনতাহাস সুলূক (منتهى السلوك في علم الأصول)
- কুল্লিয়াত ফিল মানতিক ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (كليات في المنطق وشرحها)
- কুল্লিয়াত ফিল আ'রাবিয়্যাহ (كليات في العربية)
- আলমাক্বালাত ফিল হিসাব (المقالات في الحساب)
- আললাওয়াযিমুল আ'ক্বলিয়্যা ফী মাদারিকিল উলূম (اللوازم العقلية في مدارك العلوم)
- আররাওযুল মুরী' ফী সিনাআ'তিল বাদী' (الروض المريع في صناعة البديع)
- উ'নওয়ানুদ দালীল মিন মারসূমি খাত্তিত তানযীল (عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل)
- রিসালাতুন ফিল মাকায়ীল (رسالة في المكاييل)
- জুযউন ফিল মাসাহাত (جزء في المساحات)
- মাক্বালাতুন ফী ইলমিল ইসত্বিরলাব (مقالة في علم الاسطرلاب)
- ক্বানূনুন ফী মা'রিফাতিল আওক্বাতি বিল হিসাব (قانون في معرفة الأوقات بالحساب)
- তালখীসু আ'মালিল হিসাব (تلخيص أعمال الحساب)

ইবনে আ'যারী রহ. শেষোক্ত গ্রন্থটির কাব্যসংকলন করেছেন এবং কাব্যসংকলনের ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেছেন। ফেয থেকে কাব্যসংকলনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ ছাপা হয়েছে। গ্রন্থটিকে হিজরী দশম শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত (খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) ইউরোপে গণিতশাস্ত্রের মৌলিক উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হত। পাশ্চাত্যের গণিতজ্ঞ বোদ্ধামহল হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত (খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দী) তার এই গ্রন্থের ওপর সম্পাদনা ও গবেষণার কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন ভাষায় একে রূপান্তর

Scanned with CamScanner

করেছেন। জর্জ সারটন (George Alfred Leon Sarton) তার *A History of Science* (জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস) গ্রন্থে জোর দিয়ে লিখেছেন যে, ইবনুল বান্না মার্‌রাকিশী লিখিত 'তালখীসু আ'মালিল হিসাব' গ্রন্থটিতে গণিতশাস্ত্র ও বীজগণিতের অত্যন্ত উপকারী কিছু তত্ত্ব রয়েছে। কেননা, ইবনুল বান্না এ গ্রন্থে গণিতশাস্ত্রের অত্যন্ত দুর্বোধ্য কিছু বিষয়কে এমন সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা তার পূর্বে অন্য কেউ পারেননি। এ কারণেই জর্জ সারটন এ গ্রন্থটিকে গণিতশাস্ত্রে প্রকাশিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপরদিকে ডেভিড ইউগ্যান স্মিথ (David Eugene Smith) তার *History of Mathematics* (গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনুল বান্নার 'তালখীসু আ'মালিল হিসাব' গ্রন্থে ভগ্নাংশ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ প্রচুর আলোচনা, বীজগণিতের বর্গ ও ঘন (squares and cubes)-বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ করার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সূত্রসমূহ এবং প্রথম ঘাতবিশিষ্ট সমীকরণের (Equation) সমাধানের জন্য সমান চিহ্নের নিয়ম রয়েছে।

ফ্রান্সিস ক্যাজোরি (Francis Cajori) তার *'আলমুক্বাদ্দামাত ফির রিয়াযিয়্যাত'* গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনুল বান্না আলমার্‌রাকিশী গণিতশাস্ত্রে অজ্ঞাত রাশির আনুমানিক মান বের করার বিষয়ে সঠিক গাণিতিক সমাধান নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে মানবজাতির জন্য সুমহান কর্ম-অবদান রেখে গেছেন। অপরদিকে আল্লামা ইবনে খালদূন রহ. ইবনুল বান্নার 'তালখীসু আ'মালিল হিসাব' গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সূক্ষ্ম ও সুপ্রতিষ্ঠিত দলীলসমৃদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুটা জটিল। এমনিতে গ্রন্থটি যথেষ্ট উপকারী। দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা মূলত সৃষ্টি হয়েছে সমাধানসমূহের প্রমাণ আলোচনা করতে গিয়ে। গ্রন্থটির গাণিতিক সমাধানসমূহ একেবারেই সুস্পষ্ট। লেখক যখন গ্রন্থে উল্লিখিত গাণিতিক সমাধানগুলোর ব্যাখ্যা তথা সমাধানসমূহের কারণ ও দর্শন বর্ণনায় মনোনিবেশ করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে এমন কাঠিন্য ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, যা মূল গাণিতিক সমাধান-আলোচনায় ছিল না।

ওমর রেযা কাহালা তার *'আলউলূমুল বাহতা ফিল উসূরিল ইসলামিয়া'*

Scanned with CamScanner

(العلوم البحتة في العصور الإسلامية) গ্রন্থে এ কথা যুক্ত করেছেন যে, ইবনুল বান্নার 'তালখীসু আ'মালিল হিসাব' গ্রন্থটিতে বিভিন্ন গাণিতিক গবেষণা স্থান পেয়েছে। কিছু কিছু গাণিতিক সমাধান অত্যন্ত সুকঠিন হলেও ইবনুল বান্না সেগুলোকে অত্যন্ত সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষত জটিল তত্ত্ব ও সুকঠিন নিয়মাবলিকে তিনি এমন সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যা তার পূর্বে কেউ পারেননি। তার এসব আলোচনায় পূর্ববর্তীদের মতো জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা একেবারেই নেই।

ইবনুল বান্না ৬৭ বছর বয়সে ৭২১ হিজরীতে (১৩২১ খৃস্টাব্দে) মাররাকিশে ইন্তেকাল করেন।

Scanned with CamScanner

❁

দশম অধ্যায়

আন্দালুসের ইতিহাস
উপলব্ধি ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক

প্রথম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সূত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অতীতের যুদ্ধ ও বর্তমানের যুদ্ধ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আজকের ফিলিস্তিন অতীতের আন্দালুস

Scanned with CamScanner

পূর্বের কয়েক শ' পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত আলোচনায় আট শ' বছরেরও অধিক সময়ের আন্দালুসের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল, এ সুবিশাল ইতিহাস-সম্পদের প্রতিটি স্তরে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকানো, ইতিহাসের প্রতিটি বাঁক থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা, আন্দালুস ইতিহাসের মহান ব্যক্তিগণের মাধ্যমে যেসব মহান কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটানো এবং একই সঙ্গে আন্দালুস ইতিহাসের নিন্দিত ব্যক্তিগণের স্খলন ও পদস্খলনের প্রতিটি ঘটনা, বিশেষত যা আন্দালুসের শেষ যুগে অধঃপতন ও পতনের কারণ হয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ জাতীয় বিষয় পরিহার করা।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আন্দালুসে মুসলমানদের পতন আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না। দুই শ' বছরেরও পূর্ব থেকেই এ পতন ছিল অনিবার্য ও প্রত্যাশিত। অবশ্য একবার আটলান্টিকের ওপারের বনু মারীনের সাহায্যের কারণে, আরেকবার খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহের দীর্ঘ ও জটিল সংঘাত পরিস্থিতির কারণে এ পতন বিলম্বিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু শেষে যা ঘটেছে, তা-ই ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

আর তাই আমাদের কর্তব্য হল এই পতন ও ধ্বংসের কারণসমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করা। কেননা, এসব কারণ ও কার্যকারণের স্বভাবধর্ম হল, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন সময় এসব কারণ ও কার্যকারণের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, সেখানেই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পুনরাবৃত্তি ঘটবে একই রকম পতন ও ধ্বংসের; একই রকম পরিণতি ও পরিণামের। রাষ্ট্র ও মহাদেশের ভিন্নতা এবং কাল ও সময়ের পরিবর্তনে পরিণতি সংঘটনে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না।

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সূত্র

আন্দালুসের ইতিহাসে এই যে দুর্বলতা ও ভাঙন, হীনতা ও লাঞ্ছনার স্তর, এর মাঝেও রয়েছে একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। বিজয়ের কাল থেকে নিয়ে এই পতনের কাল– আন্দালুসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় আছে অনুভব ও উপলব্ধির অনেক কিছু। আল্লাহ তাআ'লার যে চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান ব্যাপকভাবে সকল জাতির ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে মুসলিম জাতির ক্ষেত্রে সদা কার্যকর, তা আমরা এখান থেকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে পারি। কুদরতি এই নেযাম জাতিসমূহের প্রতিষ্ঠা ও পতনের; এ রীতি উত্থান ও অধঃগমনের। এ রীতি ও নিয়মের বাস্তবায়ন বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাসে।

বাস্তবতা হল, ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত বরং কিয়ামত পর্যন্ত জাতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাধারণ নীতি হল প্রথমে প্রতিষ্ঠা ও উত্তরণ, তারপর ধ্বংস ও পতন; প্রথমে উন্নতি, তারপর কালের অতল গহ্বরে বিস্মৃতি। মানুষের মাঝে বেশ কিছু ব্যাপক মানবিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতি আছে, যা পরস্পর সংযুক্তরূপে একই সঙ্গে মানবজীবনের গতিপথ এবং জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের পথপরিক্রমা নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান হল, যতক্ষণ কোন জাতি ও সভ্যতা এসব নিয়ম-নীতি মেনে চলবে, ততক্ষণ তারা কল্যাণ ও সৌভাগ্যের রাজপথে অবস্থান করবে। আর যখনই এসব নিয়ম-নীতি হতে বিচ্যুত হবে, তখনই নেমে আসবে উপযুক্ত ও সমুচিত শাস্তি; অধঃপতন ও পতনের ঘনঘটা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। [সূরা আলে-ইমরান : ১৪০]

Scanned with CamScanner

মুসলিম উম্মাহও এই সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন কুদরতি নেযাম-বহির্ভূত নয়। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মুবারক রেসালাত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মুসলমানগণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও উত্থানের কার্যকারণ ও নিয়ম-নীতি আঁকড়ে ধরেছিলেন বিধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সফল ও কল্যাণকর এক খেলাফতব্যবস্থা। পরবর্তীগণ তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বিধায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভাগ্যে নেমে এসেছে দুর্বলতা ও পতন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকার কারণ ও কার্যকারণ অনেক, যা আমরা পূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল,

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তার কুদরত ও নুসরতের প্রতি পূর্ণ ও অটল আস্থা।
২. একতা, ঐক্যবদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অবলম্বনের পাশাপাশি বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ।
৩. শাসক-শাসিতের মাঝে সাম্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকা।
৪. ইলমের সার্বজনীন চর্চা ও জনগণের মাঝে দ্বীনের ব্যাপক প্রসার।
৫. ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থাকরণে সচেষ্ট থাকা। আল কোরআনের ভাষায়–

﴿ وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴾

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের (মোকাবেলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেসব লোককেও, যাদেরকে তোমরা এখনও জান না; (কিন্তু) আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সূরা আনফাল : ৬০]

মুসলিম জাতি যখন এসব কার্যকারণসমূহ অবলম্বন করবে, তখন অতি দ্রুত

Scanned with CamScanner

উঠে দাঁড়াবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠার পর্বটি হয় ধীরগতিসম্পন্ন ও পর্যায়ক্রমিক। অনেক ত্যাগ ও কোরবানী, ধৈর্য ও অটলতা এবং সহিষ্ণুতা ও অবিচলতার পর প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানের বাহ্যিক রূপ প্রতিভাত হয়। এর পরবর্তী স্তরে ইসলামী সাম্রাজ্য লক্ষণীয় দ্রুত মাত্রায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং এর ফলে পৃথিবী মুসলিম জাতির সামনে উন্মুক্ত হতে থাকে। আর তখন খুব কমসংখ্যক মুসলমানই পার্থিব সম্পদ ও চাকচিক্যের প্রলোভনের সামনে অটল থাকতে পারে; বরং অধিকাংশই নিপতিত হয় ফিতনার মাঝে।

«إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ»

প্রত্যেক জাতির-ই একটি ফিতনা (বা পরীক্ষার বস্তু) আছে; আমার উম্মাহর ফিতনা হল ধন-সম্পদ।[৪৪২]

আর যখনই মুসলিম জাতি ফিতনায় নিমজ্জিত হয়, তখনই নতুন করে আগমন ঘটে প্রথমে দুর্বলতা এবং শেষে পতনের। বস্তু ও সভ্যতার ফিতনার পরিমাণ-ভয়াবহতা যেমন হয়, উন্নতি ও অবনতি এবং উত্থান ও পতনও তেমনই হয়।

পার্থিব মোহাচ্ছন্নতার এই ফিতনার বিষয়টি পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.। এই ফিকহ ও প্রজ্ঞাবলেই তিনি ১৭ হিজরী মোতাবেক ৭৩৫ খৃস্টাব্দে এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যার নজীর ইতিহাসে বিরল। ফারুকী আদর্শে উজ্জীবিত যারা, সেই সীমিতসংখ্যক মহান ব্যক্তিত্বই পেরেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। তিনি যখন দেখলেন যে, পার্থিব সম্পদের দ্বার মুসলিম জাতির জন্য অবারিত হয়ে গেছে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের রূপ ধারণ করে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে, তখন তিনি পারস্যে বিজয়াভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করলেন।

খলীফাতুল মুসলিমীন আশঙ্কা করেছিলেন যে, পার্থিব সম্পদ-প্রীতি মুসলমানদের হৃদয়-জগত দখল করে ফেলবে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তারা সম্পদের মোহে আক্রান্ত হয়ে নিজেদের পরকাল নষ্ট করবে এবং নিজেদের ইসলামী সাম্রাজ্যও হারিয়ে ফেলবে। তার অভিপ্রায় ও আগ্রহ ছিল তার সকল প্রজার জান্নাতে প্রবেশ নিশ্চিত করা, পারস্যে প্রবেশ নিশ্চিত করা

---

[৪৪২] *জামে' তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩৩৬।

Scanned with CamScanner

নয়। যদি পারস্যে প্রবেশ জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে ধিক তাকে! তাই তো তিনি বলেছেন,

«وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَارِسٍ جَبَلًا مِنْ نَارٍ لَا نَصِلُ إِلَيْهِمْ مِنْهُ وَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْنَا»

আমার কামনা, যদি আমাদের ও পারস্যের মাঝে আগুনের একটি পাহাড় থাকত! তাহলে সে পাহাড় পাড়ি দিয়ে আমরাও তাদের কাছে পৌঁছতে পারতাম না; তারাও আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত না।[৪৪৩]

পরবর্তী সময়ে পারসিকরা যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করল এবং খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর রাযি. মুসলমানদের পরাজয় ও সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করলেন, কেবল তখনই তিনি পুনরায় পারস্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

অন্যান্য জাতির সঙ্গে মুসলিম জাতির একটি মৌলিক পার্থক্য হল মুসলিম জাতি চির জীবন্ত জাতি। মুসলিম জাতির অস্তিত্ব কখনোই কালের গর্ভে বিলীন হওয়ার নয়; পৃথিবী কখনোই মুসলিম জাতির পদচারণা হতে বঞ্চিত হবে না। মুসলিম জাতির বিনাশ নেই, বিস্মৃতি নেই। মুসলিম জাতি মৃত্যুঞ্জয়ী, চির অমর। মুসলিম জাতির ভাগ্যে পরাজয় আসতে পারে, পতন আসতে পারে; কিন্তু পতনের পরই মুসলিম জাতি উঠে দাঁড়ায় নতুন করে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। পতনের পর আর পুনঃঅস্তিত্ব ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে না; মুসলিম উম্মাহ ব্যতীত অন্য সকল জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটলেও মুসলিম জাতির ক্ষেত্রে এটি মহান আল্লাহ তাআ'লার সুন্নাত নয়। পৃথিবীতে এমন বহু জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, যাদের ছিল সমৃদ্ধ ইতিহাস, উন্নতি ও অগ্রগতির সুদীর্ঘ কালের পদচারণা এবং তারপর পতন। পতনের পর পুনরায় তারা উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তারা হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে এবং ইতিহাসের বিস্মৃত পাতায়। এর সুস্পষ্ট ও প্রোজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে ফিরআউনী সাম্রাজ্য, গ্রিক সাম্রাজ্য, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং এই সেদিনের বৃটিশ সাম্রাজ্য। হ্যাঁ, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য, যার বিশালতা ও ক্ষমতার ব্যাপকতা বোঝাতে প্রবাদ রচিত হয়েছিল, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না'। যে সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হত না, সেই সাম্রাজ্যের সূর্যও অস্তমিত হয়েছে!

---

[৪৪৩] তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ২/৪৯৮ ও ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ২/৩৮২।

Scanned with CamScanner

মুসলিম জাতি ও অন্যান্য জাতিবর্গের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশ্বজনীন রীতি, যার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে–

﴿كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ﴾

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। [সূরা মুজাদালা : ২১]

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۭ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـــًٔا ۭ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। [সূরা নূর : ৫৫]

ইসলামী সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাআ'লার এই সুন্নাহর বিষয়টিই সুপ্রমাণিত হয়েছে নবীজীর এ হাদীসেও,

«إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا»

আল্লাহ তাআ'লা এ উম্মাহর জন্য প্রতি এক শ' বছরের মাথায় এমন

Scanned with CamScanner

কোন (মহান) ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি উম্মাহর দ্বীনী অবনতির সংস্কার করবেন।[৪৪৪]

হাদীসের অন্তর্নিহিত ভাষ্য হচ্ছে– এ উম্মাহর ভাগ্যে পতন আসবে এবং পতনের পর পুনরায় উত্তরণ ও উন্নতিও আসবে। আর এ উত্তরণ ও উন্নতি ঘটবে কোন সংস্কারক বা সংস্কারক-কাফেলার হাত ধরে। কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

উত্থান ও পতন, এরপর পুনরায় উত্থান ও পতন– ইসলামী ইতিহাসের পরতে পরতে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এ ধরনের চলমান ধারার দৃষ্টান্ত যে কেবল আন্দালুসের ইতিহাসে আছে এমন নয়; বরং স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-ও এর দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরপরই সংঘটিত হয়েছিল এক ব্যাপক পতন ও ভীতিপ্রদ ভাঙনের ঘটনা; পুরো আরব উপদ্বীপের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের ফিতনা। কেবল মক্কা, মদীনা ও (বর্তমান বাহরাইনের অন্তর্গত) হাজার নামক ছোট্ট একটি গ্রাম বাদে কোন জনপদেই তখন ইসলাম বাকি ছিল না।

কিন্তু এ পতনের পরই সূচিত হয়েছিল নতুন করে অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম। সূচিত হয়েছিল প্রতাপপূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং অনেক অনেক বিজয়ের পদযাত্রা। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. ইরতিদাদের ফিতনা দমন করার পর নতুন পথচলার সূচনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের বীজ রোপণ করেছিলেন। এরপর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাযি.-এর আমলে অবারিত সম্পদের জগত মুসলমানদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আবারও মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফিতনা ও ভাঙনের সৃষ্টি হয়, যার পরিণতিতে মহান খলীফায়ে রাশিদ ও নবীজীর সার্বক্ষণিক সহচর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকালেও বজায় থাকে এ ফিতনা।

এরপর আবারও পরিস্থিতি অনুকূল হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় উমাইয়া সাম্রাজ্য, ইসলামী বিজয়াভিযান পৌঁছয় সাফল্যের শীর্ষচূড়ায়। কিছুকাল পর আবারও পতন; এবার কার্যকারণ বনু উমাইয়ার বিশৃঙ্খল শাসন। একই সময় উত্থান ঘটে বনু আব্বাসের, তারা নতুন করে ইসলামের মর্যাদা ও গৌরব

---

৪৪৪ *সুনানে আবি দাউদ*, হাদীস নং ৪২৯১।

Scanned with CamScanner

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এরপর নিয়ম মেনেই একসময় বনু আব্বাসের সাম্রাজ্যও শিকার হয় দুর্বলতা ও পতনের। এরপরের প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের গল্পের শিরোনাম একই– 'উত্থান-পতনের গল্প'। এর ব্যতিক্রম নয় আইয়ুবী সাম্রাজ্য কিংবা সর্বশেষ সৎ-পথাশ্রয়ী উসমানী খেলাফতের সুবিশাল সাম্রাজ্যও, যা পুরো পূর্ব ইউরোপকে জয় করেছিল এবং পরিণত হয়েছিল সমকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রে।

সুতরাং উত্থান ও পতনের এ ধারা এবং নতুন করে জেগে ওঠার এ প্রয়াস মুসলিম জাতির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাআ'লার শাশ্বত এক সুন্নাত। মুসলিম জাতি কখনোই একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে না। বরং প্রতিটি পতনের পরই মুসলিম জাতিকে জেগে উঠতে হবে নতুন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে; এটাই চির সত্য, যেমন চির সত্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠার পরই তাদের ভাগ্যে আসবে পতনের পালা। কারণ, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে আল্লাহ তাআ'লার কোন বংশ-সম্পর্ক নেই!

«يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[৪৪৫]

আমাদের যাপিত কালের শ্রেণিবিন্যাস (Classification)

অনেক মুসলমানের মনেই এই আত্মজিজ্ঞাসা জাগে যে, উত্থান-পতন কিংবা প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তির বিগত দিনের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী যাপিত কালের মুসলিম নাগরিক হিসেবে আমরা এখন কোন স্তরে অবস্থান করছি?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে যে প্রকৃত বাস্তবতা আমাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় তা হল, ইসলামী উম্মাহ এখন অধঃপতন ও পতনের এক দীর্ঘ স্তর অতিক্রম করছে; মুসলিম জাতির মাঝে এখন বিরাজ করছে প্রচণ্ড দুর্বলতা ও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। আর বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উসমানী খেলাফতের পতনের মাধ্যমে সরাসরি যে পতন দৃশ্যমান হয়েছিল, তা ছিল ইসলামী ইতিহাসের চলমান স্বাভাবিক ধারারই একটি অংশ এবং

[৪৪৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৬০২, *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২০৪।

Scanned with CamScanner

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাশ্বত ও চিরন্তন রীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু এবারের এই সর্বশেষ পতনের সঙ্গে এমন দু'টি বিষয় যুক্ত হয়েছে, যা ইতঃপূর্বের কোন ইসলামী রাষ্ট্রের বেলায় হয়নি এবং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের পতনের কোনটির ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটনা ঘটেনি। বিষয়দু'টি হল,

১. খেলাফতব্যবস্থার বিলুপ্তি। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মুসলমানগণ এমন কোন রাষ্ট্র-বঞ্চিত হয়েছে, যা তাদেরকে একতার বন্ধনে জড়িয়ে রাখতে পারে। মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় অনেক ঝড়-ঝাপটা এসেছে, এসেছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি, পতন ঘটেছে বিভিন্ন ইসলামী সাম্রাজ্যের; কিন্তু হিজরী প্রথম শতাব্দীর উমাইয়া সাম্রাজ্যকাল থেকে শুরু করে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর উসমানী খেলাফতের পতনকাল পর্যন্ত কোনকালেই মুসলিম উম্মাহর মানসপট থেকে খেলাফতের রূপ ও স্বরূপ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি। এই দীর্ঘ চৌদ্দ শ' বছর ধরে ইসলাম ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমান্তরাল নীতি।

২. ইসলামী শরীয়াব্যবস্থার বিলুপ্তি। পূর্বের কোন পতনকালই যেমন খেলাফতে ইসলামিয়ার নকশাশূন্য ছিল না; তেমনই কোন কালের কোন ইসলামী রাষ্ট্রই ইসলামী শরীয়ামুক্তও ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পতনের যে কোন যুগে মুসলিম জাতি যতই অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার হোক না কেন, শরীয়তব্যবস্থা কখনোই পুরোপুরি বাতিল বা অদৃশ্য হয়নি। হ্যাঁ, কখনো কখনো ইসলামী শরীয়তের বিশেষ কোন শাখার প্রায়োগিক অঙ্গনে সীমালঙ্ঘন হয়েছে কিংবা স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু শরীয়তকে দূরে এক পাশে সরিয়ে রেখে আপন দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় অধিকতর নমনীয় ও উপযোগী মানবরচিত কোন জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করার শ্লোগান কখনোই এভাবে ব্যাপকহারে উচ্চারিত হয়নি।

এ দু'টি কার্যকারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্কার ও পরিশুদ্ধির কার্যক্রমকে বহুগুণে জটিল ও কঠিন করে তুলেছে। কিন্তু পূর্বেও যেমন বলে এসেছি, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সংস্কার ও পরিশুদ্ধি মোটেও অসম্ভব নয়। কেননা, ইসলামের জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে অসম্ভব মনে করা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই শাশ্বত সুন্নাহর সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক, যার সারমর্ম হল, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রাজপথেই থাকবে।

Scanned with CamScanner

অধিকন্তু বর্তমানে নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনেক অনেক পূর্বাভাস চারিদিকে দৃশ্যমান হচ্ছে। ১৩৪২ হিজরীতে (১৯২৪ খৃস্টাব্দে) উসমানী খেলাফতের পতনের পর ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ ভূখণ্ডে অবশ্যই বিরাট এক নিম্নগামিতা ও অধঃপতন সংঘটিত হয়েছে। উসমানী খেলাফতের পতনের পর এক সউদী আরব বাদে সকল মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মডেলে অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির ওপর। সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল। কিন্তু সত্তর দশকের মধ্যভাগ হতে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত ইসলামী উম্মাহর প্রতিটি প্রান্তে নতুন করে জেগে ওঠা এক চেতনা প্রতিভাত হচ্ছে।

মসজিদগুলোর দিকে একনজর তাকিয়ে দেখুন ক্রমবর্ধমান মুসল্লির সংখ্যা, বিশেষ করে যুবক শ্রেণির ব্যাপক উপস্থিতি; ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে রাস্তা-ঘাটে হিজাবপরিহিতা পর্দানশীন নারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামিক সেন্টারের ব্যাপক বিস্তার; তিন শ' বছরেরও অধিক সময় ধরে খৃস্টান ও কমিউনিস্ট শাসনের পর সাবেক গণতান্ত্রিক রাশিয়ায় ইসলামের নব জোয়ার– এক পলকে দেখা এসব দৃশ্য যেন এক নবপ্রতিষ্ঠার পূর্বাভাসই দিচ্ছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অতীতের যুদ্ধ ও বর্তমানের যুদ্ধ

মুসলমানদের বিজয়-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কী?

নিঃসন্দেহে যাল্লাকা প্রান্তর কিংবা ওয়াদিয়ে বারবাতের যুদ্ধক্ষেত্রের মতো আন্দালুসের মুসলমানদের অতীত বিজয়গাথা বরং ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়-ঘটনা আমাদের মাঝে মর্যাদা ও গৌরব জাগ্রত করে। কিন্তু অতীতের সেসব বিজয় তো ঢাল-তরবারি, বর্শা ও ঘোড়ার যুদ্ধের বিজয়; সৈনিকের সঙ্গে সৈনিকের সম্মুখ লড়াইয়ের বিজয়! এখন যে এসব বিষয় দৃশ্যপট থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে; পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যুদ্ধ এখন আর যুদ্ধ নেই, শক্তি এখন শক্তির নাম নয়। এখন যুদ্ধ মানে ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার বা প্রযুক্তির যুদ্ধ; ঢাল-তরবারি ও ঘোড়ার স্থান দখল করেছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বিমান, গুচ্ছবোমা, দূরপাল্লার ও দূরনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্র ইত্যাদি; পূর্বের যুদ্ধ-ইতিহাসে যেগুলোর অস্তিত্ব দূরে থাক, ধারণাও ছিল না।

সুতরাং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিত্য-নতুন আবিষ্কারের যুগেও কি মুসলমানরা পূর্বের ন্যায় বিজয়ের মুখ দেখবে? সমকালীন সামরিক শক্তির বিবেচনায় চরম পশ্চাৎপদ ও পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতি কি পারবে তাদের পূর্বসূরিদের বিজয় ধারা ফিরিয়ে আনতে?!

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রশ্ন এবং এ জাতীয় চিন্তার কারণ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কার্যকারণ সম্পর্কে অনবগতি ও অসচেতনতা। পূর্বেও আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কার্যকারণদু'টি হল,

১. মুসলিম উম্মাহ মৃত্যুঞ্জয়ী এক জাতি

পূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি যে, পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাশ্বত বিধানের দাবি হল মুসলিম উম্মাহ কখনোই নিঃশেষ ও বিস্মৃত হবে না; বরং সর্বদাই প্রতিষ্ঠা ও উত্থানের নিরন্তর সংগ্রামে নিমগ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠার পর যেমন পতন এসেছে ও আসছে, প্রতিটি পতনের পরও অবশ্যই

Scanned with CamScanner

আসবে নবপ্রতিষ্ঠার পালা। কাফির-গোষ্ঠীর শক্তি ও ক্ষমতা কতটা বৃদ্ধি পেল, মুসলিম জাতি কতটা দুর্বল হয়ে পড়ল, এসব বিবেচনা এখানে একেবারেই গৌণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তো সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। (এটা) সামান্য ভোগ (যা তারা লুটছে), অতঃপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা নিকৃষ্টতম বিছানা।[সূরা আলে-ইমরান : ১৯৬-১৯৭]

২. এ লড়াই হক-বাতিলের লড়াই

মুসলমানদের সঙ্গে অন্যদের যুদ্ধ কোন ব্যক্তি-লড়াই বা রাষ্ট্রীয় লড়াইয়ের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং এ লড়াই হচ্ছে বিশ্বাসের লড়াই, হক ও বাতিলের লড়াই, ন্যায়-অন্যায়ের চিরন্তন যুদ্ধ। একেবারে সহজ করে বললে– আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের দোসরদের লড়াই।

লড়াইয়ের প্রকৃত রূপ যখন এই, তাহলে এর ফলাফল কী হতে পারে? শক্তির যতই ব্যবধান থাকুক, এ যুদ্ধে জয়লাভ করবে কি আল্লাহ ও তার বন্ধুদের দল, না ইবলিস ও তার তাগুতিবাদী দল? আল্লাহর দলের সৈনিকদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটা দুর্বল এবং শয়তানী বাহিনীর কাছে শক্তি ও লড়াইয়ের উপকরণের কতটা আধিক্য, তা এখানে মূল বিবেচ্য নয়; জয়-পরাজয়ের মূল নিয়ামক হল উভয় দলের পরিচিতি।

ইতিহাস ও ইসলামের অতীত যুদ্ধগুলোর পরিবেশ-প্রতিবেশ ও ফলাফল বিবেচনায় রাখলে আমাদের এ দাবির স্বপক্ষে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উদাহরণ ও প্রমাণ পাওয়া যাবে। বলুন, অতীতের যতগুলো যুদ্ধে মুসলিম জাতি জয়লাভ করেছে, পূর্বানুমান ও সামরিক শক্তি-বিবেচনায় কি সেসব যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ছিল?! উদাহরণস্বরূপ কাদিসিয়ার যুদ্ধের কথাই ধরুন। তৎকালীন প্রবল পরাশক্তি পারসিক বাহিনীর দুই লক্ষ প্রশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র বত্রিশ হাজার সদস্যের মুসলিম বাহিনীর পরিণতি স্বাভাবিক বিবেচনায় কী হতে পারত?! অতীত বিবেচনা, সার্বিক

Scanned with CamScanner

অনুমান, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি- কোন বিবেচনাতেই কি কাদিসিয়ার ইসলামী বিজয়কে সম্ভাব্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায়? তাও আবার কোথায়? সুপার পাওয়ার পারস্যের মাটিতে, পারসিক বাহিনীর ঘরের মাঠে!

কিংবা ভেবে দেখুন ইয়ারমুকের যুদ্ধের কথা। একদিকে তৎকালীন আরেক পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্য; দুই লক্ষ সৈন্যের রোম বাহিনী, অপরদিকে মাত্র উনচল্লিশ হাজার মুসলমান। সামরিক শক্তির বিচারে কি মুসলিম বাহিনীর বিজয়কে সম্ভাব্য বলা যায়?

কিংবা দেড় বছরে একবার নয়, দু'বার নয়; একটানা আশিবার খোজেস্তানের (Shushtar) রণাঙ্গনে পঞ্চাশ হাজার পারসিক সৈন্যকে ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের পর্যুদস্ত করার সেই অনন্য উপাখ্যান? তাও আবার পারস্যের ভূমিতে?!

আন্দালুসের ইতিহাসই-বা বাদ দেবেন কেন? ওয়াদিয়ে বারবাতের যুদ্ধে এক লক্ষ গোথ সৈন্যের বিরুদ্ধে তারিক বিন যিয়াদের মাত্র বার হাজার মুসলমানের জয়লাভকে আপনি কোন বিবেচনায় স্বাভাবিক বলবেন?!

কাদিসিয়া, ইয়ারমুক, খোজেস্তান বা ওয়াদিয়ে বারবাত; বরং ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি বিজয় কেবল বর্তমান সামরিক অনুমান নয় বরং অতীত বিবেচনায়ও যদি অসম্ভব নাও হয়; সুকঠিন যে ছিল– তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধারাবাহিক বিজয়-ঘটনা ইতিহাসের এমন এক রহস্যজনক অধ্যায়, কেবল একটি উত্তর ব্যতিরেকে যার কোন সমাধান আমাদের কাছে নেই। আর তা এই যে, আমরা মুসলমানগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি ও জানি, কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা!

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

এবং (হে নবী!) তুমি যখন (তাদের ওপর মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। [সূরা আনফাল : ১৭]

﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ﴾

আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন; কিন্তু (তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন এ জন্য যে,) তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। [সূরা মুহাম্মাদ : ০৪]

Scanned with CamScanner

সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা কাফিরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের যুদ্ধে মূলত মুমিনদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে, ইহুদি-খৃস্টানদের বিরুদ্ধে, আমেরিকা-রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিংবা পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতি, যারা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, তাদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহা পরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহ তাআ'লা কখনোই আমাদের মুখাপেক্ষী নন। এটা তো আমাদের প্রতি দয়াময় আল্লাহর পরম দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তার সৈনিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমাদের ভূমিকা তো হল,

كَمَنْ يَسْتُرُ الْقُدْرَةَ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ!

অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লাই আপন কুদরতে কাফিরদের পরাজিত করেন; আমরা কিছুই করি না, কেবল কুদরতুল্লাহকে আচ্ছাদন করে রাখি। কাফিরদের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলতা– ব্যাস, এতটুকুর বিনিময়েই আমরা লাভ করি 'আজরে আযীম' ও মহা পুরস্কার।

মুসলমানদের মন-মানসিকতা জুড়ে এ বিষয়টিই বদ্ধমূল থাকা উচিত এবং সর্বশেষ যে পতনের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তার পরবর্তী উম্মাহর বিনির্মাণ প্রচেষ্টায় ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজকের ফিলিস্তিন অতীতের আন্দালুস

আন্দালুসের ইতিহাস থেকে অর্জিত তৃতীয় বার্তাটি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। এ বার্তাটির নিদর্শন ও রূপরেখা মূলত প্রতিভাত হয় সেই প্রশ্নের মাঝে, যা অনেকের মস্তিষ্ককেই ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। আর তা হল– আন্দালুস ভূখণ্ড থেকে ইসলাম পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেল কেন?!

আন্দালুস ভূখণ্ড (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল) বর্তমানে বিশ্বের সর্বনিম্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এ অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মাত্র এক লক্ষের মতো; অর্থাৎ আমেরিকার কোন কোন শহরের চেয়েও কম।

আমেরিকার কেবল ডালাস শহরেই মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা এক লক্ষের মতো। অথচ আমেরিকা কোন কালেই ইসলামী সরকার-শাসিত ছিল না। অপরদিকে যে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (স্পেন ও পর্তুগাল) সুদীর্ঘ আট শতাব্দী মুসলিম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, আজ সেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এক লক্ষের ঊর্ধ্বে নয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিস্ময়কর বিষয়।

এখান থেকেই প্রশ্ন জাগে– ব্যক্তি-বিচারে বলুন কিংবা জাতিসত্তার বিচারে, সর্ব বিবেচনায় এভাবে আন্দালুস-ভূমি হতে ইসলাম কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল? অথচ অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেনি। এমনকি যেসব অঞ্চলে দীর্ঘদিন ক্রুশেডীয় আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বজায় ছিল, সেসব অঞ্চলেও এরূপ ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ, আলজেরিয়া এক শ' ত্রিশ বছর অধিকৃত ছিল, মিশর অধিকৃত ছিল সত্তর বছর, ক্রুশেড আমলে ফিলিস্তিন প্রায় দুই শ' বছর অধিকৃত ছিল। এ ধরনের আরও অনেক পরাজিত ইসলামী রাষ্ট্রের কথাই বলা যায়। কিন্তু এসব এলাকায় যত নির্মম ও নির্দয় পন্থায়ই মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়নি। নিজেদের মুসলিম পরিচয়কে তারা এখনও পর্যন্ত ধরে রেখেছে এবং শত ঝঞ্ঝার মুখেও অবিচল থেকেছে। তাহলে আন্দালুসে কেন ..?!

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা আন্দালুসে স্প্যানিশ উপনিবেশবাদের আচরণ কী ছিল, তার দিকে ফিরে তাকাব। আন্দালুসে

Scanned with CamScanner

স্প্যানিশ উপনিবেশবাদ ছিল সম্পূর্ণই বসতিস্থাপন ও প্রতিস্থাপনমূলক সাম্রাজ্যবাদ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আন্দালুসের খৃস্টানশক্তি যে মুসলিম শহরেই প্রবেশ করেছে, প্রথমেই পূর্ণ নির্মূল অভিযান চালিয়ে সেখানকার সকল মুসলিম নাগরিককে হত্যা করেছে কিংবা বিতাড়ন করে অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এরপর আন্দালুস ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে খৃস্টান নাগরিকদের এনে মুসলমানদের রেখে যাওয়া এসব নগরীতে প্রতিস্থাপন করেছে এবং সেখানে তাদের স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করেছে। এভাবে এক সময় পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, পুরো ভূখণ্ডে কোন মুসলিম নাগরিক বাকি ছিল না।

পরবর্তীতে এসব অঞ্চলে বসবাস ও শাসনকার্য পরিচালনার কাজ খৃস্টানরাই করেছে। অন্যান্য ইসলামী ভূখণ্ডে পরিচালিত আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে এর সম্পূর্ণ উল্টো। মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনীর মাধ্যমে, জনগণের মাধ্যমে নয়। আর চিরন্তন সত্য কথা হল, সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের চূড়ান্ত পরিণতি প্রত্যাগমন ও বিলুপ্তি ছাড়া অন্য কিছু হয় না।

আন্দালুসে দখলদারিত্বের এই অভিনব রূপ আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। আর তা হল আন্দালুসে যেমন প্রতিস্থাপনমূলক উপনিবেশবাদের প্রকাশ ঘটেছে, তেমন ঘটনা পৃথিবীর আরেকটি ভূখণ্ড ছাড়া অন্য কোথাও ঘটেনি। সে ভূখণ্ডটিও একটি মুসলিম ভূখণ্ড, যার নাম ফিলিস্তিন!

আজ ফিলিস্তিনে যা ঘটছে, তা মূলত আন্দালুস-ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। ফিলিস্তিন ভূমিতে আজ ইহুদিরা যা করছে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রতিস্থাপন করছে, ফিলিস্তিনী জনগণকে হত্যা, বিতাড়ন ও বাস্তুচ্যুতকরণের মাধ্যমে নির্মূল করছে, ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে এবং অধিকৃত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে স্থাপনা নির্মাণ করছে– এ সবকিছু মূলত ফিলিস্তিনীদের স্থানে ইহুদি জনগণের বসতিস্থাপন-পরিকল্পনারই অংশ।

ফিলিস্তিনী নাগরিকদের বাস্তুচ্যুত ও গৃহহীন করা হয়েছে। তাদের গন্তব্য যেন বিস্মৃতির বাঁকে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পুরো বিশ্ব ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে ফিলিস্তিন ইস্যুর কথা। বরং পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, স্বয়ং ফিলিস্তিনী জনগণও নিজেদের সমস্যার কথা ভুলতে বসেছে। আমার তো

Scanned with CamScanner

আশঙ্কা হচ্ছে, বিতাড়িত ফিলিস্তিনীরা তেমন করেই নিজেদের সমস্যা ও ইস্যু পুরোপুরি ভুলে যাবে, যেভাবে নিজেদের সমস্যার কথা ভুলে গিয়েছিল সেসব আন্দালুসবাসী, যারা এক বছর, দু' বছর, দশ বছর এমনকি এক শ' বছর পর আন্দালুস ছেড়ে মরক্কো, তিউনিসিয়া কিংবা আলজেরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। আন্দালুস পতনের পর পাঁচ শ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু তাদের কেউ কি ভাবছে কিংবা পরিকল্পনা করছে মাতৃভূমির স্বাধীনতার?!

ঠিক একই পদ্ধতিতে ইহুদিরা অগ্রসর হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্ষিপ্ত ইহুদিদের এনে জড়ো করছে ফিলিস্তিনে; লক্ষ্য একটাই– ফিলিস্তিন ভূমিতে ফিলিস্তিনী নাগরিকদের পরিবর্তে ইহুদি নাগরিকদের বসতি স্থাপন।

সুতরাং আন্দালুসের ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান ফিলিস্তিন ইস্যুর যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। ভেবে দেখুন, কেন অন্য সময় বাদ দিয়ে ১৯৯২ খৃস্টাব্দেই ফিলিস্তিনী ও ইহুদিদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল? কেন পৃথিবীর এত দেশ ও নগরী থাকতে এ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বেছে নেওয়া হল আন্দালুসেরই একটি প্রাচীন নগরী মাদ্রিদকে?

আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শান্তি-আলোচনা চলছিল নরওয়ের অসলোতে। কিন্তু শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল অসলোতেও নয়, আমেরিকা বা রাশিয়ার কোন নগরীতেও নয়; বরং প্রেক্ষাপটের সম্পূর্ণ বাইরে থাকা মাদ্রিদে। এতে যদি কোন বিস্ময়বোধক চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা দূর করার জন্য কেবল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সালটি লক্ষ করুন। হ্যাঁ, ১৯৯২ খৃস্টাব্দ; আন্দালুস পতনের পাঁচ শতাব্দী পূর্তির বছর!

মুসলিম আন্দালুসের পতনের পাঁচ শ' বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সময় মাদ্রিদ ছিল উৎসবের নগরী। পাঁচ শ' বছর পূর্বে এ ভূমিতে মুসলমানদের পরাজয় ও ক্রুশেড বাহিনীর বিজয়কে স্মরণ করে পালিত হচ্ছিল নানা উৎসব-অনুষ্ঠান। মাদ্রিদে শান্তিচুক্তি আয়োজন করে অমুসলিম বিশ্ব মুসলিম বিশ্বকে একটি বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিল, যার সারাংশ হচ্ছে– এই যে দেখ, ইতিহাস এভাবেই বারবার ফিরে আসে। দেখ, আন্দালুসের ঘটনাপ্রবাহ নতুন করে মঞ্চায়িত হচ্ছে ফিলিস্তিনের ভূমিতে। ইতঃপূর্বে গ্রানাডায় যেমন মুসা বিন আবু গাসসানের আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল, ফিলিস্তিনের স্বাধিকার আন্দোলনকেও তেমন করেই দমন করা হবে। দেখ, এভাবেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই বিতর্ক ও এত এত আলোচনার; তোমাদের পরিণতি তা-ই হবে, যা ইতঃপূর্বে ঘটেছিল আন্দালুসের ভাগ্যে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

❁

শেষকথা

মুসলমানদের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের দীর্ঘ পরিক্রমার শেষে এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়নের পর আমরা সেই চিরন্তন সত্যটিকেই নতুন করে লিখতে চাই–

বিশেষত আন্দালুসের ইতিহাসসহ কোন ইতিহাসই কক্ষনো হাত ফসকে পড়ে যাওয়া দুধের জন্য মায়াকান্না করার জন্য নয়! ইতিহাসগ্রন্থ কেবল অতীতের পৃষ্ঠাসমূহে বিচরণের জন্য নয়; ইতিহাসের প্রতিটি পাতা অর্জনের ও উপদেশের, শিক্ষার ও সমীক্ষার।

আর শুরুতেই বলে এসেছি–

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

সুতরাং তুমি (তাদেরকে) এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা চিন্তা করে। [সূরা আ'রাফ : ১৭৬]

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপাদান আছে। [সূরা ইউসুফ : ১১১]

পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য সচেষ্ট হবে সবাইকে। হতাশ-হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

Scanned with CamScanner

اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাবস্ত হবে। [সূরা নূর : ৫৫]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

আর আমাদের সর্বশেষ দাবি

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লার জন

Scanned with CamScanner

❁

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ আন্দালুসের পতনে প্রতীচ্যের কবি
আবুল বাক্বা রুন্দী রহ. রচিত শোকগাথা

পরিশিষ্ট ২ আন্দালুস নিয়ে প্রাচ্যের কবি
আল্লামা ইকবাল রহ. রচিত কবিতা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট[৪৪৬] : ১
আন্দালুসের পতনে প্রতীচ্যের কবি আবুল বাক্বা রুন্দী রহ.[৪৪৭] রচিত শোকগাথা

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يَغُرَّ بِطِيْبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ
هِيَ الْأُمُوْرُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُوَلٌ مَنْ سَرَّه زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ

পূর্ণতার পরেই আসে ক্ষয়িষ্ণুতার পালা– এই তো বস্তুর ধর্ম; যাপিত জীবনের প্রশান্তিতে তাই প্রতারিত না হওয়াই কাম্য।

পূর্ণতা-ক্ষয়িষ্ণুতার এই অনিবার্য বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছে কত নগরী, কত দেশ! কালের আনুকূল্যে যে-ই মুগ্ধ হয়েছে, কালান্তরের যাতনায় হয়েছে নিঃশেষ!

وَهٰذِهِ الدَّارُ لَا تَبْقٰى عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَدُوْمُ عَلٰى حَالٍ لَهَا شَانُ
يُمَزِّقُ الدَّهْرُ حَتْمًا كُلَّ سَابِغَةٍ إِذَا نَبَتْ مَشْرَفِيَّاتٌ وَخِرْصَانُ
وَيَنْتَضِيْ كُلَّ سَيْفٍ لِلْفَنَاءِ وَلَوْ كَانَ ابْنَ ذِيْ يَزَنٍ والغِمْدُ غمْدَانُ

এ পৃথিবী কারও তরে নয় চিরদিন; জগত-প্রকৃতি নয় চিরস্থায়ী-অমলিন। কালের ঝঞ্ঝায় তনুত্রাণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়; বর্শা-কৃপাণ যখন ধার-শক্তি সব হারায়। তরবারির কোষ-মুক্তি মানে তার অস্তিত্বেরই অবসান! হোক না তরবারি যু-

---

[৪৪৬] লেখক কর্তৃক সংযোজিত।

[৪৪৭] আন্দালুসের কবি আবুল বাক্বা-এর জন্ম ৬০১ হিজরীতে (১২০৪ খৃস্টাব্দে)। তিনি আন্দালুসের জাযিরাতুল খাযরার নিকটবর্তী রুন্দা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসের ফিতনা ও অস্থির-যুগের ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী এবং খৃস্টানদের হাতে আন্দালুসের বিভিন্ন দুর্গ ও নগরীর পতনের সমসাময়িক। আবুল বাক্বা যদিও একজন হাদীসবিশারদ ও প্রাজ্ঞ ফকীহ ছিলেন; কিন্তু আন্দালুসের বিভিন্ন নগরীর পতন-দুর্যোগকে কেন্দ্র করে তার রচিত এই কাব্যগাথা তার সাহিত্য পরিচয়কে সমুন্নত করে দিয়েছে। গ্রানাডার প্রথম সুলতান মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইবনুল আহমার যখন নিজের সিংহাসন রক্ষা ও খৃস্টানশক্তির মনোতুষ্টির লক্ষ্যে অনেকগুলো দুর্গের নিয়ন্ত্রণভার খৃস্টান শাসকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আবুল বাক্বা তখন এই কাব্যপঙ্‌ক্তিসমূহ রচনা করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে আফ্রিকার বনু মারীন সাম্রাজ্যের বীর যোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে আন্দালুসে আগমনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কবি আবুল বাক্বা রুন্দী ৬৮৪ হিজরীতে (১২৮৫ খৃস্টাব্দে) সিউটায় ইন্তেকাল করেন। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

ইয়াযানের[৪৪৮] আর অসিকোষ যু-গুমদান[৪৪৯] ।

أَيْنَ الْمُلُوْكُ ذَوُو التِّيْجَانِ مِنْ يَمَنٍ وَأَيْنَ مِنْهُمْ أَكَالِيْلُ وَتِيْجَانُ؟
وَأَيْنَ مَا شَادَه شَدَّادُ فِيْ إِرَمٍ وَأَيْنَ مَا سَاسَه فِي الْفُرْسِ سَاسَانُ؟
وَأَيْنَ مَا حَازَه قَارُوْنُ مِنْ ذَهَبٍ وَأَيْنَ عَادٌ وَشَدَّادٌ وَقَحْطَانُ؟

কোথায় আজ ইয়ামেনের মুকুটধারীদের রাজ-শাসন? কোথায় তাদের চোখধাঁধানো কণ্ঠহার ও শিরোভূষণ?

কোথায় সেই (অহঙ্কারী) শাদ্দাদের ইরাম-স্বর্গোদ্যান? কোথায় আজ পারসিক রাজপরিবার 'সাসান'?

কোথায় কারূন? কোথায় তার পুঞ্জীভূত স্বর্ণ-সামান? কোথায় আজ প্রতাপশালী আদ, শাদ্দাদ ও কাহতান?

أَتَى عَلَى الْكُلِّ أَمْرٌ لَا مَرَدَّ لَه حَتَّى قَضَوْا فَكَأَنَّ الْكُلَّ مَا كَانُوْا
وَصَارَ مَا كَانَ مِنْ مُلْكٍ وَمِنْ مَلِكٍ كَمَا حَكَى عَنْ خَيَالِ الطَّيْفِ وَسْنَانُ

প্রত্যেকের জীবনেই এসেছে অমোঘ-অলঙ্ঘনীয় পরিণতি; হারিয়ে গেছে সবাই, যেন ছিলই না তাদের উপস্থিতি!

রাজা-রাজত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব সবই যেন নিছক কল্পনা! সবই যেন তন্দ্রাচ্ছলে কারও অলীক কাহিনী বর্ণনা!

فَجَائِعُ الدَّهْرِ أَنْوَاعٌ مُنَوَّعَةٌ وَلِلزَّمَانِ مَسَرَّاتٌ وَأَحْزَانُ
دَارَ الزَّمَانُ عَلَى «دَارَا» وَقَاتِلِه وَأَمَّ كِسْرَى فَمَا آوَاهُ إِيْوَانُ

কালের ক্ষুধা বড় বিচিত্র ও বর্ণিল! কালেরও আছে হাসি ও কান্না, আছে আনন্দ অনাবিল ।

কালের দুর্বিপাক যখন 'দারা' ও তার ঘাতকের ওপর নেমে এসেছে, কিসরা বা কোন রাজ-প্রাসাদ কি তাকে আশ্রয় দিতে পেরেছে?

كَأَنَّمَا الصَّعْبُ لَمْ يَسْهُلْ لَه سَبَبٌ يَوْمًا وَلَا مَلَكَ الدُّنْيَا سُلَيْمَانُ
وَلِلْحَوَادِثِ سُلْوَانٌ يُسَهِّلُهَا وَمَا لِمَا حَلَّ بِالْإِسْلَامِ سُلْوَانُ

---

৪৪৮ 'যু-ইয়াযান' ইয়ামেনের হিময়ার বংশীয় জনৈক বাদশাহর নাম । (অনুবাদক)

৪৪৯ ইয়ামেনের সানআ' নগরীতে অবস্থিত একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নাম 'গুমদান' । (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

এই যে বিপাক, এই দুর্বিপাক, নেই যেন এর সহজ সমাধান! সুলাইমানের (আ.) জগত-জোড়া শাসন, তাও যেন আজ মিছে দাস্তান!

দুর্যোগ-দুর্বিপাকেরও তো প্রবোধ আছে, আছে লাঘব-যন্ত্রণা; ইসলামের ওপর যে বিপদ এসেছে, নেই যে তাতে কোন সান্ত্বনা!

دَهَى الْجَزِيرَةَ أَمْرٌ لَا عَزَاءَ لَهُ هَوَى لَهُ أُحُدٌ وَانْهَدَّ ثَهْلَانُ
أَصَابَهَا الْعَيْنُ فِي الْإِسْلَامِ فَارْتَزَأَتْ حَتَّى خَلَتْ مِنْهُ أَقْطَارٌ وَبُلْدَانُ

উপদ্বীপে নেমে এল এ কী নরক-দুর্যোগ, নেই কোন আশ্বাস, নেই অনুযোগ; যেন ভেঙে পড়েছে উহুদ পাহাড়, ধসে পড়েছে ছাহলান পর্বত!

(আন্দালুসের) ইসলাম বুঝি আজ আক্রান্ত বদ-নযরে! বিরান হচ্ছে ইসলাম, বিলীন মুসলিম নগরে-প্রান্তরে ।

فَاسْأَلْ «بَلَنْسِيَةَ» مَا شَأْنُ «مُرْسِيَةَ» وَأَيْنَ «شَاطِبَةَ» أَمْ أَيْنَ «جَيَّانُ»؟!
وَأَيْنَ «قُرْطُبَةَ» دَارُ الْعُلُومِ فَكَمْ مِنْ عَالِمٍ قَدَ سَمَا فِيهَا لَهُ شَانُ؟!
وَأَيْنَ «حِمْصُ» وَمَا تَحْوِيهِ مِنْ نُزَهٍ وَنَهْرُهَا الْعَذْبُ فَيَّاضٌ وَمَلْآنُ

জিজ্ঞেস কর ভ্যালেন্সিয়াকে মুরসিয়ার আজ কী অবস্থান? জিজ্ঞেস কর কোথা আজ (সেই) শাতিবা ও (ইসলামী) জাইয়ান?

কোথায় কর্ডোভা, ইলমের নগরী? কোথায় ইলমের চর্চা-অবদান? কোথায় জ্ঞানীদের পদচারণা আর কোথায় ইলমের সমুন্নত অবস্থান?

কোথা আজ হিমস্, কোথায় হিমসের মনমাতানো প্রমোদ-উদ্যান? কোথায় উচ্ছল উপচে পড়া সুমিষ্ট তরঙ্গিণী প্রবহমান?

وَأَيْنَ «غَرْنَاطَةَ» دَارُ الْجِهَادِ وَكَمْ أَسَدٍ بِهَا وَهُمْ فِي الْحَرْبِ عُقْبَانُ؟!
وَأَيْنَ جَامِعُهَا الْمَشْهُورُ كَمْ تُلِيَتْ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ بِهِ آيٌ وَفُرْقَانُ؟!
وَعَالِمٍ كَانَ فِيهِ لِلْجَهُولِ هُدًى مُدَرِّسٍ وَلَهُ فِي الْعِلْمِ تِبْيَانُ
وَعَابِدٍ خَاضِعٍ لِلّٰهِ مُبْتَهِلٍ وَالدَّمْعُ مِنْهُ عَلَى الْخَدَّيْنِ طُوفَانُ

কোথায় গ্রানাডা, কোথায় লড়াই, কোথায় সংগ্রামের পুণ্যভূমি? কোথায় হাজারো সিংহপুরুষ, যুদ্ধ-বাজদের হুঙ্কার-ধ্বনি?

কোথায় আজ গ্রানাডার সুবিখ্যাত মসজিদ? হাজারো মুসল্লির তেলাওয়াত-

Scanned with CamScanner

গুঞ্জরন?!

কত আলিম! কত শিক্ষক-মুদাররিস! কোথায় সেসব আঁধার-চেরাগ, কোথায় তাদের জ্ঞান-বিতরণ?

কত আবিদ! কত আল্লাহ-প্রেমিক! কত রোনাজারি আর কত ক্রন্দন! কোথায় হারাল আল্লাহ-প্রেমে গণ্ডদেশে অশ্রু-তুফান!

قَوَاعِدُ كُنَّ أَرْكَانَ الْبِلَادِ فَمَا عَسَى الْبَقَاءُ إِذَا لَمْ تَبْقَ أَرْكَانُ

এসব নগরী-ই ছিল মুসলিম আন্দালুসের মূল ঘাঁটি, ঘাঁটিই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, বল, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বাকি থাকে কী?

تَبْكِي الْحَنِيفِيَّةُ الْبَيْضَاءُ مِنْ أَسَفٍ كَمَا بَكَى لِفِرَاقِ الْإِلْفِ هَيْمَان

عَلَى دِيَارٍ مِنَ الْإِسْلَامِ خَالِيَةٍ قَدْ أَقْفَرَتْ وَلَهَا بِالْكُفْرِ عُمْرَان

শুভ্র ধর্ম ইসলাম আজ কাঁদছে দেখ ক্ষোভে ও দুঃখে, কাঁদছে যেন প্রেমাসক্ত প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ শোকে।

ইসলামের কান্না আজ ইসলামশূন্য আন্দালুসের জন্য; (মুসলমানের) আন্দালুস আজ কুফর আবাদে বসতি-পূর্ণ।

حَيْثُ الْمَسَاجِدُ قَدْ أَمْسَتْ كَنَائِسَ مَا فِيهِنَّ إِلَّا نَوَاقِيسُ وَصُلْبَان

حَتَّى الْمَحَارِيب تَبْكِي وَهِيَ جَامِدَةٌ حَتَّى الْمَنَابِرُ تَرْثِي وَهِيَ عِيْدَانُ

মসজিদগুলো পরিণত হয়েছে গির্জাশালায়, দেয়ালে ক্রুশপ্রতীক আর প্রলম্বিত ঘণ্টা-দণ্ড!

কাঁদছে নিষ্প্রাণ মেহরাব-ও! কাঁদছে খতীবদের সেই মিম্বরগুলো; অথচ ওরা বাকহীন, অথচ ওরা নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড!

يَا غَافِلًا وَلَه فِي الدَّهْرِ مَوْعِظَةٌ إِنْ كُنْتَ فِي سِنَةٍ فَالدَّهْرُ يَقْظَانُ

وَمَاشِيًا مَرِحًا يُلْهِيهِ مَوْطِنُه أَ بَعْدَ «حِمْصٍ» تَغُرُّ الْمَرْءَ أَوْطَانُ؟!

تِلْكَ الْمُصِيْبَةُ أَنْسَتْ مَا تَقَدَّمَهَا وَمَالَهَا مَعَ طَوِيْلِ الدَّهْرِ نِسْيَانُ

ওহে গাফেল! কান পেতে শোন, শুনতে কি পাও কালের ডাক? তুমি যদিও তন্দ্রাচ্ছন্ন, কাল নির্ঘুম; নয় নির্বাক।

Scanned with CamScanner

ওহে পথচারী! নির্বিকার তুমি! ডুবে আছ বুঝি স্বদেশ-অনুরাগে! (আরে) হিমসের পরও মাতৃভূমি তোমায় প্রবঞ্চিত করে নির্জলা আবেগে?

এ দুর্যোগ (আমায়) ভুলিয়ে দিয়েছে পূর্বের সব সুখস্মৃতি, কালের দীর্ঘ পরিভ্রমণেও ভোলা যাবে না এই বেদনা-ব্যক্তি।

يَا رَاكِبِيْنَ عِتَاقَ الْخَيْلِ ضَامِرَةً كَأَنَّهَا فِيْ مَجَالِ السَّبْقِ عُقْبَان
وَحَامِلِيْنَ سُيُوْفَ الْهِنْدِ مُرْهَفَةً كَأَنَّهَا فِيْ ظَلَامِ النَّقْعِ نِيْرَان
أَعِنْدَكُمْ نَبَأٌ مِنْ أَمْرِ أَنْدَلُسٍ فَقَدْ سَرٰى بِحَدِيْثِ الْقَوْمِ رُكْبَان

ওহে (ভিনদেশী) অশ্বারোহীগণ! তোমাদের বাহন তো অতি দ্রুতগামী; যেন ঘোড়দৌড়ে সবাই অগ্রগামী!

ওহে হিন্দী কৃপাণধারীগণ! তোমাদের অস্ত্র তো অতি শাণিত; রণাঙ্গনের ধুলো-আঁধারেও তরবারি যেন উজ্জ্বল প্রদীপ্ত!

তোমাদের কাছে আছে কিনা বল আন্দালুসের খবরাখবর? জাতির অশ্বারোহীরা তো জাতীয় সংবাদ নিয়ে চলে গেছে দূর-বহু দূর!

كَمْ يَسْتَغِيْثُ صَنَادِيْدُ الرِّجَالِ وَهُمْ أَسْرٰى وَقَتْلٰى فَلَا يَهْتَزُّ إِنْسَانٌ
مَاذَا التَّقَاطُعُ فِي الْإِسْلَامِ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ يَا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانٌ

জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা অবরুদ্ধ; কত নিবেদন, কত আবেদন! বন্দীশালার বোবা কান্নায় তবু কারও হৃদয়ে নেই সামান্য আন্দোলন।

ওহে ইবাদাল্লাহ! ওহে মুসলমান! কিসের বিভেদ, কিসের ব্যবধান? তোমরা তো সকলে ভাই-ভাই, সহোদর; তোমরা তো সকলে এক-দেহ, এক-প্রাণ?!

يَا مَنْ لِذِلَّةِ قَوْمٍ بَعْدَ عِزَّتِهِمْ أَحَالَ حَالَهُمْ جَوْرٌ وَطُغْيَانُ
بِالْأَمْسِ كَانُوْا مُلُوْكًا فِيْ مَنَازِلِهِمْ وَالْيَوْمَ هُمْ فِيْ بِلَادِ الْكُفْرِ عُبْدَانُ
فَلَوْ تَرَاهُمْ حَيَارٰى لَا دَلِيْلَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ ثِيَابِ الذُّلِّ أَلْوَانُ

শোন হে যুবক! গৌরব ও মর্যাদার পর জাতির ভাগ্যে এসেছে দুর্ভোগ; স্বেচ্ছাচারিতা আর অনাচারই এই পরিবর্তনের মূল অনুঘটক।

গতকালও যারা ছিল নিজ ভূখণ্ডের শাসক-প্রশাসক, তারাই দেখ আজ কুফর-প্রাসাদের ক্রীতদাস কিংবা হীন সেবক!

দেখ তারা আজ দিশেহারা-পেরেশান, নেই রাহবার, নেই সম্মান; পরনে

Scanned with CamScanner

তাদের লাঞ্ছনা-পোশাক, দেহ জুড়ে দেখ বর্ণিল-অপমান!

يَارُبَّ أُمٍّ وَطِفْلٍ حِيْلَ بَيْنَهُمَا كَمَا تُفَرَّقُ أَرْوَاحٌ وَأَبْدَانُ

وَطِفْلَةٍ مِثْلِ حُسْنِ الشَّمْسِ إِذْ طَلَعَتْ كَأَنَّمَا هِيَ يَاقُوْتٌ وَمَرْجَانُ

يَقُوْدُهَا الْعِلْجُ لِلْمَكْرُوْهِ مُكْرَهَةً وَالْعَيْنُ بَاكِيَةٌ وَالْقَلْبُ حَيْرَانُ

لِمِثْلِ هٰذَا يَذُوْبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيْمَانُ

হায়! কত মা হারিয়েছে তার নয়ন-পুতলি, আদরের ধন! এত কাছে তবু কত দূরে, এ যেন দেহ-আত্মার বিচ্ছেদ বন্ধন!

হারিয়ে গেছে কত নিষ্পাপ কিশোরী; হারিয়েছে পদ্মরাগ, উদিত রবি! হারিয়েছে প্রবাল, ইয়াকুত-মারজান; হারিয়েছে হৃদয়ের স্নেহের ছবি!

চক্ষুযুগল অশ্রুসজল, হৃদয় ব্যাকুল সম্ভ্রমবোধে; বিজাতি কাপুরুষ নির্দয়ভাবে টেনে নিয়ে যায় অশ্লীল ক্রোধে!

হৃদয়ে যদি থাকে ইসলাম, থাকে যদি মনে ঈমান-জাগরিত, এরপরও হবে না বিষণ্ন-হৃদয়? এরপরও মন হবে না বিগলিত?!

هَلْ لِلْجِهَادِ بِهَا مِنْ طَالِبٍ فَلَقَدْ تَزَخْرَفَتْ جَنَّةُ الْمَأْوٰى لَهَا شَانُ

وَأَشْرَفَ الْحُوْرُ وَالْوِلْدَانُ مِنْ غُرَفٍ فَازَتْ وَرَبِّ بِهٰذَا الْخَيْرِ شُجْعَانُ

ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرٍ مَاهَبَّ رِيْحُ الصَّبَا وَاهْتَزَّ أَغْصَانُ

আছ কোন সংগ্রামী বীর সেনানী লড়াই করবে ভগ্নির তরে? জান্নাতুল মা'ওয়া তোমারই জন্য সেজেছে দেখ আজ কেমন করে!

রবের শপথ! তুমি-ই কামিয়াব, তুমিই ধন্য বীরের বেশে; তোমার প্রতীক্ষায় হুর-গিলমান, কল্যাণ-ধারা তোমার পাশে ।

দুরূদ ও সালাম 'মুযার' হতে নির্বাচিত নবীজীর শানে, যতদিন বহে ভোরের হাওয়া, যতদিন পুষ্প-শাখা দোলে তানে তানে!

Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট[৪৫০] : ২
আন্দালুস নিয়ে প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল রহ.[৪৫১] রচিত কবিতা

ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امیں ہے
مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں
پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں
خاموش اذانیں ہیں تری باد سحر میں

স্পেনভূমি!
খুনে মুসলিমের তুমি বিশ্বস্ত ধারক,
আমার চোখে তুমি 'হারাম' পুণ্যভূমি!
কত সিজদা-চিহ্ন অঙ্কিত তোমার যমীনে,
ভোরের হাওয়ায় নীরব আযানের প্রতিধ্বনি!

روشن تھیں ستاروں کی طرح ان کی سنائیں

---

[৪৫০] অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

451 আল্লামা ইকবালের জন্ম ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ৯ নভেম্বর বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের শিয়ালকোটে। তদানীন্তন পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল ছিলেন একজন বিরল কাব্যপ্রতিভা, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। তার রচিত কবিতাসমূহকে উর্দু-ফার্সি সাহিত্যের অমর সম্পদরূপে গণ্য করা হয়। আল্লামা ইকবালের *শিকওয়া*, *জওয়াব-ই শিকওয়া*, *আসরার-ই খুদী*, *পয়াম-ই মাশরিক*, *আরমোগানে হেজায*, *যরবে কালীম*, *বাল-ই জিবরীল* প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যজগতের অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হয়। তার লিখনীতে ছিল ইসলামী রেনেসাঁর স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কথা। কাব্যসাহিত্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জাতিগঠন ও জাতির পুনর্জাগরণের হাতিয়াররূপে। তিনি মুসলিম বিশ্বকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন লালন করতেন, লালন করতেন মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির স্বপ্ন। আর তাই তিনি আপন কবিতার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।
আল্লামা ইকবাল ১৯৩২ খৃস্টাব্দে স্পেন সফর করেন এবং জামে কর্ডোভাসহ স্পেনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন। ১২৩৬ খৃস্টাব্দে কর্ডোভা-পতনের সুদীর্ঘ সাত শতাব্দী পর সম্ভবত তিনি-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি জামে কর্ডোভায় সিজদা-সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময় তিনি মর্মস্পর্শী ও ভাবসমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন, যা তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ '*বাল-ই জিবরীল*'-এ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য কবিতাটি সেখান থেকেই নেওয়া। মহান এই কবি ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

خیمے تھے کبھی جن کے ترے کوہ و کمر میں
پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی؟
باقی ہے ابھی رنگ مرے خون جگر میں!

জান!
তোমার পাহাড়ে-পর্বতে ছিল তাদের তাঁবু-ছাউনি
ছিল অত্যুজ্জ্বল তারকা-দীপ্তি তাদের কৃপাণ-ডগার,
এখনও আছে রক্তিম বর্ণ আমার কলজে-খুনে!
তবু তোমার আছে দরকার বল মেহেদি-শোভার?!

کیونکر خس و خاشاک سے دب جائے مسلماں
مانا ، وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں
غرناطہ بھی دیکھا مری آنکھوں نے و لیکن
تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں

জানি!
আজ নেই সেই তড়প-উত্তাপ অস্থি-মজ্জা, শিরা-উপশিরায়;
তবু মুসলমান কীভাবে চাপা পড়ে খড়-কুটায়, আবর্জনায়?!
নয়নযুগল করেছে দর্শন গ্রানাডাভূমিরও; কিন্তু কোথায়,
মুসাফিরের সান্ত্বনা কোথায়? না প্রবাসে, না দোরগোড়ায় ।

دیکھا بھی دکھایا بھی، سنایا بھی سنا بھی
ہے دل کی تسلی نہ نظر میں، نہ خبر میں!

হায়!
দেখেছি, দেখিয়েছি; শুনিয়েছি, শুনেছি; (খুঁজে ফিরেছি এথায়-সেথায়)
কোথাও পাইনি হৃদয়-প্রশান্তি; না দৃষ্টিতে, না কালের বার্তায়!

Scanned with CamScanner

❁

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারীম

২. তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থাবলি

- তাফসীরে ইবনে কাসীর/ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (تفسير القرآن العظيم), হাফিয আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.)।
- মাআ'লিমুত তানযীল (معالم التنزيل), আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বাগাবী রহ. (৫১৬ হি.)।
- ফী যিলালিল কুরআন (في ظلال القرآن), সাইয়িদ কুতুব রহ. (১৩৮৬ হি.)।
- তাফসীরে তাবারী/ জামিউল বায়ান ফী তাবীলি আ-য়িল কুরআন (جامع البيان في تأويل آي القرآن), মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী রহ. (২২৪-৩১০ হি.)।
- তাফসীরে কুরতুবী/ আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন(الجامع لأحكام القرآن) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.)।

৩. হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

- যাদুল মাআ'দ ফী হাদয়ি খাইরিল ই'বাদ (زاد المعاد في هدي خير العباد), ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যা রহ. (৬৯১-৭৫১ হি.)।
- ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (فتح الباري شرح صحيح البخاري), হাফিয ইবনে হাজার আ'সক্বালানী রহ. (৭৭৩-৮৫২ হি.)।
- সুনানে আবু দাউদ (سنن أبي داود), সুলাইমান বিন আশআস আবু দাউদ সিজিস্তানী রহ. (২০২-২৭৫ হি.)।
- মুসনাদে ইমাম আহমাদ (المسند), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (১৬৪-২৪১ হি.)।
- সহীহ বুখারী/ আল জামি'উস সহীহুল মুখতাসার (الجامع الصحيح المختصر), মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)।

Scanned with CamScanner

- মুসনাদে বাযযার/ আলবাহ্রুয যাখখার (البحر الزخار المسمى بمسند البزار), আবু বকর আহমাদ বিন আমর বাযযার রহ. (২৯২ হি.)।
- আসসুনানুল কুবরা (السنن الكبرى), আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বায়হাকী রহ. (৩৮৪-৪৫৮ হি.)।
- শুআ'বুল ঈমান (شعب الإيمان), আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বায়হাকী রহ. (৩৮৪-৪৫৮ হি.)।
- সুনানে তিরমিযী/ আলজামি'উস সহীহ (الجامع الصحيح), আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা তিরমিযী রহ. (২০৯-২৭৯ হি.)।
- আলমুসতাদ্রাক আ'লাস সহীহাইন (المستدرك على الصحيحين), আবু আবদুল্লাহ হাকিম রহ. (৪০৫ হি.)।
- আলমু'জামুল কাবীর (المعجم الكبير), সুলাইমান বিন আহমাদ তাবারানী রহ. (২৬০-৩৬০ হি.)।
- সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم), মুসলিম বিন হাজ্জাজ রহ. (২৬১ হি.)।
- সুনানে নাসায়ী (سنن النسائي الكبرى), আহমাদ বিন শুআইব নাসায়ী রহ. (৩০৩ হি.)।
- আসসিলসিলাতুস সহীহা (السلسلة الصحيحة), নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.)।
- সহীহ ও যায়ীফুল জামিইস সাগীর ও যিয়াদাতিহী (صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته), নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.)।

৪. সীরাত, ইতিহাস ও তাবাকাত বিষয়ক গ্রন্থাবলি

- উয়ূনুল আমবা ফী তাবাক্বাতিল আতিব্বা (عيون الأنباء في طبقات الأطباء), ইবনে আবি উসাইবিআ' রহ. (৬০০-৬৬৮ হি.)।
- আযযাখীরাতুস সানিয়্যা ফী তারীখিদ দাওলাতিল মারীনিয়্যাহ (الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية), ইবনে আবি যারা' রহ. (৭২৬ হি.)।
- রাওযুল কিরতাস ফী আখবারি মুলূকিল মাগরিব ওয়া তারীখি মাদীনাতি ফাস (روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس), ইবনে আবি যারা' রহ. (৭২৬ হি.)।
- আলহুল্লাতুস সাইয়ারা (الحلة السيراء), ইবনুল আবার রহ. (৬৫৮ হি.)।
- আলকামিল ফিত তারীখ (الكامل في التاريخ), আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ জাযারী ইবনুল আছীর রহ. (৫৫৫-৬৩০ হি.)।

Scanned with CamScanner

- আ'মালুল আ'লাম ফী মান বূই'য়া ক্বলাল ইহতিলাম মিন মুলূকিল ইসলাম/ তারীখু ইসবানিয়া আলইসলামিয়া (أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام), লিসানুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল খতীব রহ. (৭১৩-৭৭৬ হি.) ।
- আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা (الإحاطة في أخبار غرناطة), লিসানুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল খতীব রহ. (৭১৩-৭৭৬ হি.) ।
- আললামহাতুল বাদারিয়্যা ফিদ দাওলাতিন নাসরানিয়্যা (اللمحة البدرية في الدولة النصرانية), লিসানুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল খতীব রহ. (৭১৩-৭৭৬ হি.) ।
- রক্বমুল হুলাল ফী নায্‌মিদ দুয়াল (رقم الحلل في نظم الدول), লিসানুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল খতীব রহ. (৭১৩-৭৭৬ হি.) ।
- শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব (شذرات الذهب في أخبار من ذهب), আবদুল হাই ইবনুল ই'মাদ হাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) ।
- তারীখু উলামাইল আন্দালুস (تاريخ علماء الأندلس), ইবনুল ফারাযী রহ. (৪০৩ হি.) ।
- নায্‌মুল জুমান লি-তারতীবি মা সালাফা মিন আখবারিয যামান (نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان), ইবনুল কাত্তান মার্‌রাকিশী রহ. (৫৬২-৬২৮ হি.) ।
- খরীদাতুল আ'জাইব ওয়া ফারীদাতুল গারাইব (خريدة العجائب وفريدة الغرائب), ইবনুল ওয়ারদী রহ. (৬৯১-৭৪৯ হি.) ।
- আযযাখীরা ফী মাহাসিনি আহলিল জাযীরাহ (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة), আলী ইবনে বাসসাম রহ. (৪৫০-৫৪২ হি.) ।
- আসসিলাহ (الصلة), খাল্‌ফ বিন আবদুল মালিক ইবনে বাশকুয়াল রহ. (৫৭৮ হি.) ।
- রিহলাতু ইবনি বতুতা (رحلة ابن بطوطة), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনে বতুতা রহ. (৭০৩-৭৭৯ হি.) ।
- আলইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা (الإصابة في تمييز الصحابة), হাফিয ইবনে হাজার আ'সক্বালানী রহ. (৭৭৩-৮৫২ হি.) ।
- ফাযাইলুল আন্দালুস ওয়া আহলিহা (فضائل الأندلس وأهلها), ইবনে হায্‌ম যাহেরী রহ. (৩৮৪-৪৫৬ হি.), ইবনে সাঈদ মাগরিবী রহ. (৬১০-৬৮৫ হি.) ও আবুল ওয়ালিদ শাকুন্দী রহ. (৬২৯ হি.) ।
- রাসাইলু ইবনি হায্‌ম (رسائل ابن حزم), ইবনে হায্‌ম যাহেরী রহ. (৩৮৪-৪৫৬ হি.) ।

Scanned with CamScanner

- আলমুক্বতাবাস মিন আমবাই আহলিল আন্দালুস (المقتبس من أنباء أهل الأندلس), ইবনে হাইয়ান রহ. (৩৭৭-৪৬৯ হি.) ।
- ক্বালাইদুল ইক্বয়ান ওয়া মাহাসিনুল আ'ইয়ান (قلائد العقيان ومحاسن الأعيان), ইবনে খাক্বান রহ. (৪৮০-৫২৮ হি.) ।
- মাতমাহুল আনফুস ওয়া মাসরাহুত তাআন্নুস ফী মুলাহি আহলিল আন্দালুস (مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس), ইবনে খাক্বান রহ. (৪৮০-৫২৮ হি.) ।
- তারীখে ইবনে খালদূন (تاريخ ابن خلدون), ইবনে খালদূন রহ. (৭৩২-৮০৮ হি.) ।
- ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আমবাউ আবনাইয যামান (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان), আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনে খাল্লিকান রহ. (৬০৮-৬৮১ হি.) ।
- আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব (المغرب في حلى المغرب), ইবনে সাঈদ মাগরিবী রহ. (৬১০-৬৮৫ হি.) ।
- আদদুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযি ওয়াস সিয়ার (الدرر في اختصار المغازي والسير), ইবনে আবদিল বার কুরতুবী রহ. (৩৬৮-৪৬৩ হি.) ।
- ফুতূহু মিসর ওয়া আখবারুহা (فتوح مصر وأخبارها), ইবনে আবদিল হাকাম রহ. (১৮৭-২৫৭ হি.) ।
- আলবায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب), ইবনে আ'যারী রহ. (৬৯৫ হি.) ।
- আলবায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব, কিসমুল মুওয়াহহিদীন (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-قسم الموحدين), ইবনে আ'যারী রহ. (৬৯৫ হি.) ।
- আদদীবাজুল মুযাহ্হাব ফী আ'ইয়ানি উলামাইল মাযহাবিল মালিকী (الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب المالكي), আলী বিন মুহাম্মাদ ইবনে ফারহূন রহ. (৭৯৯ হি.) ।
- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া (البداية والنهاية), হাফিয আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) ।
- আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা (السيرة النبوية), হাফিয আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) ।

Scanned with CamScanner

- আলইকমাল ফী রাফ'ইল ইরতিয়াব আনিল মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب), আলী বিন হিবাতুল্লাহ ইবনে মাকূলা রহ. (৪২২-৪৭৫ হি.) ।
- আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা (السيرة النبوية), ইবনে হিশাম রহ. (২১৮ হি.) ।
- কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক (كتاب المسالك والممالك), আবু ওবায়দ আলবাকরী রহ. (৪৮৭ হি.) ।
- নুযহাতুল মুশতাক্ব ফী ইখতিরাকিল আফাক্ব (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق), মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইদরীসী রহ. (৪৯৩-৫৫৯ হি.) ।
- আলই'তিবার (الاعتبار), উসামা বিন মুনকিয রহ. (৪৮৮-৫৮৪ হি.) ।
- ক্বিয়ামু দাওলাতিল মুরাবিতীন (قيام دولة المرابطين), হাসান আহমাদ মাহমূদ ।
- ফাজরুল আন্দালুস (فجر الأندلس), হুসাইন মু'নিস রহ. (১৪১৬ হি.) ।
- মাআ'লিমু তারীখিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস (معالم تاريخ المغرب والأندلس), হুসাইন মু'নিস রহ. (১৪১৬ হি.) ।
- জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস ফী তারীখি উলামাইল আন্দালুস (جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس), আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবি নাস্‌র হুমাইদী রহ. (৪২০-৪৮৮ হি.) ।
- আররাওযুল মি'তার ফী খবারিল আক্বতার (الروض المعطار في خبر الأقطار), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুনইম হিময়ারী রহ. (৯০০ হি.) ।
- সিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস (صفة جزيرة الأندلس), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুনইম হিময়ারী রহ. (৯০০ হি.) ।
- তারীখে বাগদাদ (تاريخ بغداد), আবুবকর মুহাম্মাদ খতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি.) ।
- আলই'বার ফী খবারি মান গাবার (العبر في خبر من غبر), হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৬৭৩-৭৪৮ হি.) ।
- তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাইয়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আ'লাম (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام), হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৬৭৩-৭৪৮ হি.) ।
- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير أعلام النبلاء), হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. (৬৭৩-৭৪৮ হি.) ।
- মাওসুআ'তুল আ'লাম (موسوعة الأعلام), খাইরুদ্দীন যিরিক্‌লী রহ. (১৩১০-১৩৯৬ হি.) ।
- তাবাক্বাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা (طبقات الشافعية الكبرى), তাজুদ্দীন সুবকী রহ. (৭২৭-৭৭১ হি.) ।

Scanned with CamScanner

- দাওলাতুল মুরাবিতীন ফিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস (دولة المرابطين في المغرب والأندلس), সা'দূন আব্বাস নাসরুল্লাহ ।
- আলইসতিক্বসা লি-আখবারি দুয়ালিল মাগরিবিল আক্বসা (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى), আবুল আব্বাস আহমাদ বিন খালিদ আননাসিরী রহ. (১৮৩৫-১৮৯৭ ঈ.) ।
- আররাওযুল উনুফ ফী শরহি সীরাতি ইবনি হিশাম (الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام), আবদুর রহমান সুহাইলী রহ. (৫০৮-৫৮১ হি.) ।
- গাযাওয়াতুল আরব ফী ফারানসা ওয়া সুওয়াইসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাযাইরিল বাহরিল মুতাওয়াস্‌সিত (غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطالية وجزائر البحر المتوسط), শাকীব আরসালান রহ. (১২৮৬-১৩৬৬ হি.) ।
- আলআরিক (الأرك), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- আযযাল্লাকা (الزلاقة), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- আলই'কাব (العقاب), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- বালাতুশ শুহাদা (بلاط الشهداء), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- ফাতহুল আন্দালুস (فتح الأندلس), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- মাসরাউ গারনাতা (مصرع غرناطة), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- আলওয়াফি বিল ওয়াফাইয়াত (الوافي بالوفيات), খলীল বিন আইবেক সাফাদী রহ. (৬৯৬-৭৬৪ হি.) ।
- আলআন্দালুস আততারীখুল মুসাওওয়ার (الأندلس التاريخ المصور), তারিক সুওয়াইদান ।
- তারীখুল ফাতহিল আরাবী ফী লীবিয়া (تاريخ الفتح العربي في ليبيا), তাহির আহমাদ যাবী রহ. (১৮৯০-১৯৮৬ ঈ.) ।
- তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক (تاريخ الأمم والملوك), মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারী রহ. (২২৪-৩১০ হি.) ।
- আততারীখুল আন্দালুসী (التاريخ الأندلسي), আবদুর রহমান আলহাজ্জী ।
- আলমু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব (المعجب في تلخيص أخبار المغرب), আবদুল ওয়াহিদ মার্‌রাকিশী রহ. (৫৮১-৬৪৭ হি.) ।
- দাওলাতুল মুরাবিতীন (دولة المرابطين), আলী সাল্লাবী ।
- দাওলাতুল মুওয়াহহিদীন (دولة الموحدين), আলী সাল্লাবী ।
- মাহাকিমুত তাফতীশ ফী ইসবানিয়া ওয়াল বুরতুগাল ওয়া গাইরিহা (محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرها), ড. আলী মুযহির ।

Scanned with CamScanner

- তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাক্বরীবুল মাসালিক (ترتيب المدارك وتقريب المسالك), কাযী ইয়ায রহ. (৪৭৬-৫৪৪ হি.)।
- মাজমূউ রাসাইলা মুওয়াহহিদিয়্যাহ মিন ইনশাই কিতাবিদ দাওলাতিল মু'মিনিয়্যা (مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية), সংকলিত।
- আখবারুন মাজমূআ'হ ফী ফাতহিল আন্দালুস ওয়া যিকরি উমারাইহা ওয়াল হুরূবিল ওয়াকিআ'হ বিহা বাইনাহুম (أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بها بينهم), লেখক অজ্ঞাত।
- আলহুলালুল মুওয়াশশিয়া ফী যিকরিল আখবারিল মার্‌রাকিশিয়্যা (الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية), লেখক অজ্ঞাত।
- নুবযাতুল আছর ফী আখবারি মুলূকি বনী নাস্‌র (نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر), লেখক অজ্ঞাত।
- তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস (تاريخ المسلمين في الأندلس), মুহাম্মাদ সুহাইল তাকূশ।
- দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস (دولة الإسلام في الأندلس), মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান রহ. (১৮৯৬-১৯৮৬ ঈ.)।
- আযহারুর রিয়ায ফী আখবারিল কাযী ইয়ায (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ তিলিম্‌সানী মাক্কারী রহ. (৯৮৬-১০৪১ হি.)।
- নাফহুত তীব মিন গুছনিল আন্দালুসির রাতীব (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ তিলিমসানী মাক্কারী রহ. (৯৮৬-১০৪১ হি.)।
- তারীখু কুযাতিল আন্দালুস/ আলমারক্বাবাতুল উলইয়া ফী মান ইয়াসতাহিক্কুল ক্বাযা ওয়াল ফুত্‌ইয়া (تاريخ قضاة الأندلس- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا), আবুল হাসান বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান নুবাহী রহ. (৭১৩-৭৯২ হি.)।
- নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব (نهاية الأرب في فنون الأدب), শিহাবুদ্দীন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরী (৬৬৭-৭৩৩ হি.)।
- মু'জামুল বুলদান (معجم البلدان), ইয়াকুত হামাবী রহ. (৫৭৪-৬২২ হি.)।
- তারীখুল আন্দালুস ফী আ'হদিল মুরাবিতীন ওয়াল মুওয়াহহিদীন (تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين), জোসেফ আশবাচ (Joseph Aschbach) (১৮০১-১৮৮২ ঈ.)।

Scanned with CamScanner

৫. সাহিত্য ও ভাষাবিষয়ক গ্রন্থাবলি

- আলমু'জামুল ওয়াসিত (المعجم الوسيط), ইবরাহীম মুসতাফা ও অন্যান্য ।
- আলমুতরিব মিন আশআ'রি আহলিল মাগরিব (المطرب من أشعار أهل المغرب), ইবনে দাহইয়া কালবী রহ. (৫৪৪-৬৩৩ হি.) ।
- লিসানুল আরব (لسان العرب), ইবনে মানযূর রহ. (৬৩০-৭১১ হি.) ।
- আসসিহাহ (الصحاح), আবু নাসর ইসমাঈল জাওহারী রহ. (৩৯৩ হি.) ।
- তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস (تاج العروس من جواهر القاموس), আবুল ফায়য যুবাইদী রহ. (১১৪৫-১২০৫ হি.) ।
- শি'রু আমর বিন মা'দীকারিব যুবাইদী (شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي), আমর বিন মা'দীকারিব যুবাইদী (২১ হি.) ।
- সুবহুল আ'শা ফী সিনাআ'তিল ইনশা (صبح الأعشى في صناعة الإنشا), আহমাদ বিন আলী ক্বালক্বাশান্দী রহ. (৭৫৬-৮২১ হি.) ।
- মাজমা'উল আমছাল (مجمع الأمثال), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মাইদানী রহ. (৫১৮ হি.) ।

৬. অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাবলি

- মাজমু'উল ফাতাওয়া (مجموع الفتاوى), আহমাদ বিন আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৬৬১-৭২৮ হি.) ।
- মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা (منهاج السنة النبوية) আহমাদ বিন আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৬৬১-৭২৮ হি.) ।
- ইবরাযুল মাআ'নি মিন হিরযিল আমানী (إبراز المعاني من حرز الأماني), শিহাবুদ্দীন আবুল কাসেম আবু শামা রহ. (৫৯৬-৬৬৫ হি.) ।
- আলআহকামুস সুলতানিয়্যা (الأحكام السلطانية), মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আবু ইয়া'লা আলফাররা রহ. (৪৫১-৫২৬ হি.) ।
- ইকতিফাউল কুনূ' বি-মা হুওয়া মাতবূ' (اكتفاء القنوع بما هو مطبوع), এডওয়ার্ড ভ্যানডিক (Edward Cornelius Van Dyck) (১২৩৩-১৩১৩ হি./১৮১৮-১৮৯৫ ঈ.) ।
- হাযা-রাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত তারাক্কিল আ'লামী (حضارة الإسلام وأثرها في الرقي العالمي), জালাল মুযহির ।
- হাযা-রাতুল আরব (حضارة العرب), গোস্তাভ লি বোন (১৮৪১-১৯৩১ ঈ.) ।

Scanned with CamScanner

- মাওসূআ'তু আ'বাকিরাতিল ইসলাম (موسوعة عباقرة الإسلام), রিহাব আকাবী ও মুহাম্মাদ আমীন ফারশূখ ।
- আলমাওসূআ'তুল জিনাইয়্যাতিল ইসলামিয়া আলমুক্বারানা বিল আনযিমাতিল মা'মুলি বিহা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাতিস সাঊদিয়্যা (الموسوعة الجنائية الإسلامية، المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية), সাঊদ বিন আবদুল আলী বারূদী উতাইবী ।
- আলহাযা-রাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়া ওয়া মু'জাযুন আনিল হাযা-রাতিস সাবিক্বা (الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- উলামাউল আন্দালুস ইবদাআ'তুহুমুল মুতামাইয়্যিযা ওয়া আছারুহা ফিন নাহযাতিল উরুব্বিয়্যা (علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية), শাওকী আবু খলীল রহ. (১৪৩১ হি.) ।
- মুশকিলুল আ-ছার (مشكل الآثار), ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ. (৩২১ হি.) ।
- ফী তারীখিত তিব্বি ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া (في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية), ড. আমীর নাজ্জার ।
- ফিহরিসুল ফাহারিস(فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات) , আবদুল হাই বিন আবদুল কাবীর কাত্তানী রহ. (১৩০২-১৩৮২ হি.) ।
- রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযা-রাতিল ইসলামিয়া (رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية), ড. আলী বিন আবদুল্লাহ আদদাফা' ।
- আলইক্বতিসাদ ফিল ই'তিক্বাদ (الاقتصاد في الاعتقاد), আবু হামিদ গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) ।
- আলহাযা-রাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়া ফিল আন্দালুস (الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس), সংকলিত ।
- তুরাসুল ইসলাম (تراث الإسلام), সংকলিত ।
- আলমু'জায ফী তারীখিত তিব্বি ওয়াস সাইদালাহ ইনদাল আরব (الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب), মুহাম্মাদ কামিল হুসাইন রহ. (১৯০১-১৯৭৭ ঈ.) ।
- তারীখু ফালাসিফাতিল ইসলাম ফিল মাশরিক ওয়াল মাগরিব (تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب), মুহাম্মাদ লুতফী জুমআ' রহ. (১৩০৪-১৩৭৩ হি.) ।
- আলমাকতাবাতু ফিল ইসলাম (المكتبات في الإسلام), মুহাম্মাদ মাহির হামাদাহ ।
- আততিব্ব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমীন তারীখুন ওয়া মুসামাহাতুন

Scanned with CamScanner

(الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات), ড. মাহমূদ আলহাজ্জ কাসিম।

- মু'জামুল মুসতালাহাত ওয়াল আলক্বাবিত তারীখিয়্যা (معجم المصطلحات والألقاب التاريخية), মুসতাফা আবদুল কারীম আলখতীব।
- ফাইযুল ক্বাদীর শরহুল জামিইস সাগীর (فيض القدير شرح الجامع الصغير), মুহাম্মাদ আবদুল রউফ বিন আলী মুনাভী রহ. (১০৩১ হি.)।
- ফিকহুল জিহাদ (فقه الجهاد), ড. ইউসুফ কারযাবী।

৭. পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, বিশ্বকোষ ও ওয়েবসাইট

- আলআহরাম (الأهرام) পত্রিকা, মিশর।
- আলমা'হাদুল মিসরী লিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া (المعهد المصري للدراسات الإسلامية) ম্যাগাজিন, মাদ্রিদ।
- আলমিহানুত তিব্বিয়্যা (المهن الطبية) ম্যাগাজিন।
- আলমাওরিদ (المورد) আধুনিক জ্ঞানকোষ (সংস্করণ : ১৯৯৫ খৃ.)।
- উইকিপিডিয়া (http://ar.wikipedia.org)

❁

এই গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের বঙ্গানুবাদ তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (মাকতাবাতুল আশরাফ) থেকে নেওয়া হয়েছে। –অনুবাদক

❁

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

কেন পড়বেন 'ইতিহাস'?

মুসলিম উম্মাহ বিস্মৃত হবে আপন ইতিহাস;
এও কি মেনে নেওয়া যায়?!
আল্লাহ-ই তো ইরশাদ করেছেন–
'এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা চিন্তা করে।'

মুসলিম উম্মাহ পথ চলবে হাজারো সমস্যাকে সঙ্গী করে;
এও কি মেনে নেওয়া যায়?!
অতীত-ইতিহাসেই তো আছে এসব সমস্যার সমাধান।
ইতিহাসের পাতাই যে মুসলিম জাতির চিরন্তন পাঠশালা!

ইতিহাস হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়–
কীভাবে একটি জাতি জেগে ওঠে কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে
কীভাবে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে কিংবা ধসে পড়ে
কীভাবে একটি সভ্যতা নির্মিত হয় কিংবা ভেঙে পড়ে
কীভাবে একটি বিপ্লব পূর্ণতায় পৌঁছয় কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে।

ইতিহাস একটি জাতির শিকড়ের ন্যায়;
ইতিহাস-বিমুখতা তাই শিকড়চ্যুত হওয়ার নামান্তর।
আজকের পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর যে অবক্ষয় ও অধঃপতন,
নিজেদের অতীত-বিস্মৃতি তার অন্যতম কারণ।

আর তাই ইতিহাসঅধ্যয়নই পারে–
আপনাকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করতে
সুমজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের নিশ্চয়তা দিতে
অতীত-অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীর গন্তব্য নির্ধারণ করতে।

B0001
ISBN
9 789849 353300

মাকতাবাতুল হাসান

Scanned with CamScanner